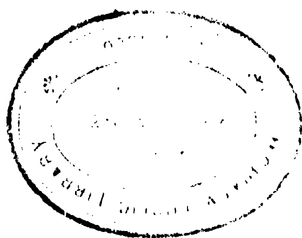
স্বামী ব্রহ্মানন্দ







উদ্বোধন কার্য্যালয়

বাগবাজার, কলিকাতা

মূল্য দুই টাকা   টাকা

প্রকাশক—
স্বামী আত্মবোধানন্দ
উদ্বোধন কার্য্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

ফাল্গুন, ১৩৪৮

প্রিণ্টার—
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
এক্সপ্রেস প্রিণ্টার্স
২০-এ, গৌর লাহা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ স্বামীর প্রকৃত জীবনী লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার জীবনের সাধনা, দৈনন্দিন সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার ইতিবৃত্ত জানিবার উপায় নাই। শ্রুত, দৃষ্ট ও কতিপয় লিপিবদ্ধ ঘটনা গ্রথিত করিয়া এই পুস্তক প্রকাশিত হইল। জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তিসমন্বিত আদর্শ অধ্যাত্মজীবন যে প্রেমধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র ইহাতে পাওয়া যাইতে পারে। পুণ্য কাহিনীর আলোচনা সর্ব্বতঃ কল্যাণপ্রদ। অনুরাগ ও ব্যাকুলতা সহায়ে মানব জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়—ইহা তিনি অপার প্রেমে, আকুল অনুনয়ে ও প্রদীপ্ত তেজপূর্ণস্বরে আজীবন ঘোষণা করিয়াছেন। পাঠকবর্গ এই অনুরাগ ও ব্যাকুলতা আশ্রয়ে ইহজীবনে শান্তি ও আনন্দ লাভ করুন ইহাই প্রার্থনা। ইতি—

ফাল্গুন, ১৩৪৮
শুক্লাদ্বিতীয়া

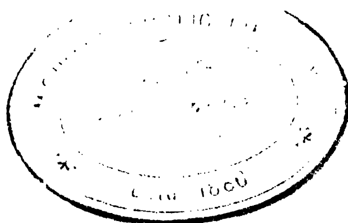
প্রকাশক

সূচীপত্র



স্বামী ব্রহ্মানন্দ

বেনারসে গৃহীত ফটো



প্রথম পরিচ্ছেদ

বাল্য জীবন

যাঁহার আজন্ম বিশুদ্ধ পবিত্র জীবন, অনন্যসাধারণ কৃচ্ছ্র সাধনা, অলৌকিক ত্যাগ, মহান্ কর্ম্মশক্তি এবং বিরাট আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ বর্ত্তমান জগতের গৌরবস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, যুগাবতার ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র, লীলাসহচর এবং প্রিয়তম অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে লোককল্যাণার্থে মহাশক্তির আহ্বানে যাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল, যাঁহার প্রদীপ্ত ব্রহ্মদীপ্তিতে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হইত, যাঁহার স্নিগ্ধ গম্ভীর প্রশান্ত অপূর্ব্ব বালসুলভ মৃদুহাস্য ও করুণাদৃষ্টিতে শত শত নরনারীর হৃদয় শান্তির সুষমায় ভরিয়া উঠিত, যাঁহার শ্রীচরণ তলে বসিয়া শত শত ত্যাগী সাধু ভক্ত ও ত্রিতাপক্লিষ্ট জীব সমভাবে আনন্দময় অমৃতলোকের সন্ধান পাইত, তাঁহার পুণ্য কাহিনী আলোচনা করিয়া মানুষ যে কৃতার্থ ও ধন্য হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আদর্শ আচার্য্য, আদর্শ গুরু ও আদর্শ নেতারূপে যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের শীর্ষস্থানে অবস্থিত থাকিয়া "শ্রীশ্রীমহারাজ" আখ্যায় ভূষিত ছিলেন, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণকর্ত্তৃক "রাখালরাজ" ও শ্রীবিবেকানন্দ প্রমুখ গুরুভ্রাতাগণের দ্বারা "রাজা" সংজ্ঞায় অভিহিত হইতেন, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতিরূপে "ব্রহ্মানন্দ স্বামী"নামে জনসাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন,—তিনি যে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সমন্বিত অভূতপূর্ব্ব ত্যাগোজ্জ্বল মহিমা-মণ্ডিত জীবন যাপন

করিয়া গিয়াছেন সেই অসামান্য ভাব-রত্ন-মাণিক্য-খচিত সনাতন আদর্শই ভাবী জগতের অতুল বিভব ও অমূল্য সম্পদ।

জগতে দুই শ্রেণীর মানুষ আছে। এক গতানুগতিক অপর পারমার্থিক। যিনি পারমার্থিক তিনিই নরোত্তম ও লোকপূজ্য মহাপুরুষ। যিনি পারমার্থিক তিনি অন্তরলোকে বাস করেন—অন্তরলোকে মন লইয়া তাঁহার কারবার—সেইখানে তাঁহার সাধনা ও বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র। সাধারণ লোক বহির্জগতের বিষয়-ব্যাপারে ব্যস্ত,—স্বার্থ, দ্বেষ, আসক্তি, প্রতিষ্ঠা, যশঃ ও কর্ম্ম-চঞ্চলতায় তাহার সুখ-দুঃখের অনুভূতি। পরমার্থ তাহার নিকট একটা দুষ্প্রাপ্য আদর্শ। কিন্তু যিনি প্রকৃত পারমার্থিক তাঁহার মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় ত্যাগের অমৃতময় পথে। সত্য, বিবেক, বৈরাগ্য, পবিত্রতা, নিঃস্বার্থতা, প্রেম ও অনাসক্তি তাঁহার আশ্রয় এবং তাঁহার চরম লক্ষ্য ব্রহ্মানুভূতি বা ব্রহ্মানন্দ। অন্তরে ভূমাকে স্বীকার করিলেও তাহা জীবনে উপলব্ধি করিবার জন্য গতানুগতিক লোকের সেরূপ ব্যাকুলতা বা দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা নাই কিম্বা সাধনার প্রবল প্রবৃত্তি থাকে না। তাহারা জানে—ইহলোকে বাহ্য-জগতের ভোগলিপ্সা, স্বার্থসুখ এবং আসক্তির উদ্দাম অনুরাগ। স্বীয় জীবনে ভূমাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে, কঠোর সাধনার উন্মত্ত আবেগে ও কর্ম্মের কুশলতায় তাঁহাকে একান্তভাবে পাওয়া এবং তাঁহাকে লাভ করিয়া প্রতি নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে নিবিড় আনন্দরসে নিমগ্ন হওয়া পারমার্থিক মানুষের লক্ষ্য।

বাস্তবিক পারমার্থিক মানুষই ইহ জগতের শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত বীর। এই জগতে তিনিই যথার্থ বীর যিনি ক্ষণিক তুচ্ছ ব্যাপারের

অন্তরালে অধিকাংশ লোকচক্ষুর অগোচরে অবস্থিত শাশ্বত সত্য, দিব্য ও অনন্তকে অবলম্বন করিয়া বিষয়-বস্তুর অন্তররাজ্যে বাস করেন; সেই অন্তরলোকই তাঁহার সত্তা, কর্ম্মে বা বাক্যে যেরূপেই হউক, বাহিরে নিজ সত্তার বিকাশে তিনি সেই অন্তরলোককেই বহির্জগতে প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই অন্তরলোকে ব্রহ্মানন্দ ছিলেন নিঃসঙ্গতার এককমূর্ত্তি—শান্ত, সমাহিত, স্তব্ধ ও আনন্দঘন। এই সত্যের আলোকে তাঁহাকে দেখিলে এবং তাঁহার পূতজীবন-কাহিনী আলোচনা করিলে তাঁহার স্বরূপের আভাস কতকটা উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।

জেলা ২৪ পরগণার অধীন বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত শিকরা একটি প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। প্রবাদ আছে যে, আদিশূর আনীত মকরন্দ ঘোষের বংশধরেরা বর্দ্ধমান জেলায় আকৃসা গ্রামে বাস করিতেন। এই আকৃসার ঘোষ-বংশের সদানন্দ ঘোষ শিকরায় আসিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। বহু কুলীন কায়স্থের বসতি থাকায় লোকে গ্রামের এই অংশকে শিকরা কুলীনপাড়া বলিত। কালে লোকমুখে ইহার স্থায়ী নামকরণ হয় শিকরা কুলীনগ্রাম। সদানন্দের অধস্তন তৃতীয় পুরুষ মনোহর ঘোষের পুত্র ছিলেন কালীপ্রসাদ ঘোষ। তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সুবৃহৎ ঠাকুর দালান ও চক-মিলান অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। কালীপ্রসাদের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রেরা আর একান্নভুক্ত থাকিলেন না। কালীপ্রসাদের পাঁচ পুত্রের অংশানুসারে বাড়ীটিও বিভক্ত হইল। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠানুসারে প্রতিবেশীরা বাড়ীর নির্দ্দেশ করিত। কালীপ্রসাদের মধ্যম পুত্র হরিশ্চন্দ্র যে অংশে বাস করিতেন

তাহা মেজবাড়ী বলিয়া পরিচিত ছিল। হরিশ্চন্দ্রের তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ প্যারীমোহন, মধ্যম আনন্দমোহন এবং কনিষ্ঠ শ্রীমোহন। বসিরহাটের সন্নিকট ট্যাটরা গ্রামের ভবানীচরণ গায়েনের কন্যা কৈলাসকামিনীর সহিত আনন্দমোহনের প্রথম পরিণয় হইয়াছিল। কৈলাসকামিনী সামান্য লেখাপড়া জানিতেন। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক গ্রন্থাদি তিনি ভক্তির সহিত একাগ্রমনে পাঠ করিতেন। পুত্রলাভের পূর্ব্বে তিনি তপস্বিনীর মত কৃষ্ণারাধনায় সর্ব্বদা নিরত থাকিতেন। নাম, জপ ও পূজা পাঠে তিনি অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন।

বাংলা সন ১২৬৯ সালে (ইংরাজী ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ ২১শে জানুয়ারী) ৮ই মাঘ মঙ্গলবার শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে কৈলাসকামিনী একটী পুত্র-সন্তান প্রসব করেন। গৃহে আনন্দোৎসবের ধুম পড়িয়া গেল। মাতা একান্ত কৃষ্ণানুরাগিণী ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় পুত্রের নাম রাখিলেন রাখালচন্দ্র। এই রাখালচন্দ্রই উত্তরকালে ব্রহ্মানন্দ স্বামী নামে জগতে পরিচিত হন।

রাখালচন্দ্রের পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার স্নেহময়ী জননী ইহলোক ত্যাগ করেন। এককালীন চারিটি সন্তান প্রসব করিয়া কৈলাসকামিনী মূর্চ্ছাপন্না হইয়া পড়েন। ইহার অত্যল্প পরেই নবজাত চারিটি শিশুর মৃত্যু হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রসূতিরও প্রাণবিয়োগ ঘটে।

আনন্দমোহন আবার দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী হেমাঙ্গিনীর উপর রাখালের প্রতিপালনের ভার ন্যস্ত হইল। আনন্দমোহন নিশ্চিন্ত মনে বিষয়কার্য্যে মনোযোগী হইলেন।

বাল্য জীবন

বাল্যকালে রাখালের মূর্ত্তি অতীব কমনীয় ছিল। তাঁহার সেই সৌম্য সুন্দর কোমল মাধুর্য্যপূর্ণ আকৃতি দেখিলে লোকে আকৃষ্ট হইত। বয়স হিসাবে তাঁহার শরীরে বেশ সামর্থ্য ছিল। শারীরিক বলে সঙ্গী বালকেরা কেহই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিত না। সমবয়স্ক যে কোন বালককে রাখাল এমনি কৌশল ও তৎপরতার সহিত বেষ্টন করিয়া ঘুরাইয়া মাথার উপর তুলিয়া ধরিতেন যে লোকে দেখিয়া অবাক হইত। টুকপাটি ও নাদন প্রভৃতি গ্রাম্য খেলায় তাঁহার বিশেষ প্রীতি ছিল। সাধারণ বালকদের মত রাখাল কেবল খেলাধূলায় মত্ত থাকিতেন না। শক্তি-উপাসক ঘোষেদের সুবৃহৎ অট্টালিকার প্রবেশ পথে পুষ্করিণীর তীরে একটি মৃন্ময়ী কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই কালী-মন্দিরের নিকটেই বোধনতলা। বাল্যকালে এই স্থান তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। দিবাভাগে অধিকাংশ সময় রাখাল এইখানেই অতিবাহিত করিতেন। কখনও কখনও বালক সঙ্গীদিগকে লইয়া কালীপূজা-খেলায় মত্ত থাকিতেন। মৃত্তিকা লইয়া বালক রাখাল স্বহস্তে শ্যামার সুন্দর মূর্ত্তি গড়িতেন। আবার সেই মূর্ত্তির সম্মুখে পুরোহিতবেশে তন্ময়ভাবে তিনি পূজায় বসিতেন। ক্রীড়াসঙ্গীদের কেহ কেহ তাঁহার উপদেশ মত কলার বা কচুর ডাঁটা লইয়া বলি দিত। কখনও কখনও সঙ্গীদের মধ্যে কাহাকেও পুরোহিতের আসনে বসাইয়া পূজা করিতে বলিতেন এবং নিজে কামার সাজিয়া "জয় মা" বলিয়া প্রতিমার সম্মুখে বলি দিতেন। দেবদেবীর প্রতি বালক-বয়সেই রাখালের অসাধারণ ভক্তি ও অনুরাগ ছিল। বাড়ীতে দুর্গাপূজার সময় মণ্ডপমধ্যে পুরোহিতের ঠিক পশ্চাতেই

বালক রাখাল একটি আসন সংগ্রহ করিয়া স্থিরভাবে বসিতেন এবং পূজা দেখিতে দেখিতে একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িতেন। তৎকালে তাঁহাকে দেখিলে স্বতঃই মনে হইত যেন একটি ধ্যানমগ্ন বালযোগী বসিয়া রহিয়াছেন। আবার সন্ধ্যায় দেবীর যখন আরতি হইত বালক রাখাল তখন ভক্তিরসাপ্লুতচিত্তে অপলক দৃষ্টিতে তন্ময় হইয়া তাহা দর্শন করিতেন।

পুত্রের পাঠের সুবিধার জন্য আনন্দমোহন তাঁহার বসতবাটীর সন্নিকটে একটি অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপন করেন। ইহাতে গ্রামের অনেক দরিদ্র অনাথ বালক বিনা বেতনে সেই পাঠশালায় শিক্ষা লাভের সুযোগ পাইল। প্রসন্ন সরকার নামক জনৈক শিক্ষকের উপর এই পাঠশালার পরিচালনার ভার অর্পিত হয়। রাখাল এই পাঠশালার শিক্ষকদের বিশেষ প্রিয় ছাত্র ছিলেন। প্রিয়দর্শন বালকটির কোমল অন্তঃকরণে আঘাত করিতে কোন শিক্ষকের ইচ্ছা হইত না। সে যুগে ছাত্রশাসনের জন্য পাঠশালার শিক্ষকগণ প্রধানতঃ বেত্রদণ্ড ব্যবহার করিতেন। শিক্ষকেরা লক্ষ্য করিলেন যে, কোন সহপাঠী বালককে আঘাত করিলেই রাখালের চক্ষু অশ্রুসিক্ত এবং মুখমণ্ডল ব্যথায় ম্লান হইত। এই প্রিয় ছাত্রের ঈদৃশ ভাব দেখিয়া অগত্যা তাঁহারা বেত্রদণ্ড ত্যাগ করিলেন। বাল্যকালে পড়াশুনায় রাখালের বেশ অনুরাগ দেখা যাইত।

ফল-ফুলের বাগানের প্রতি আনন্দমোহনের বিশেষ সখ ও যত্ন ছিল। পিতার দেখাদেখি রাখালও গাছপালার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে শিখিলেন। কোন্ বৃক্ষ বা লতাকে কি

ভাবে যত্ন করিতে হইবে তাহা বাল্যকালেই রাখাল শিখিয়াছিলেন। গ্রামের বড় বড় পুকুরে মাছ ধরিবার জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ ছিল। পুকুরের পারে ছিপ্ হাতে করিয়া তিনি একাগ্র চিত্তে বসিয়া থাকিতেন। এই দুইটি সখ তাঁহার প্রায় আজীবন ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বাল্যকাল হইতেই রাখালের সঙ্গীতের প্রতি একটা প্রবল অনুরাগ ছিল। বৈষ্ণব ভিখারী কৃষ্ণলীলা গান করিলে তিনি আবিষ্টভাবে তাহা শুনিতেন। কেহ শ্যামাসঙ্গীত বা রামপ্রসাদের "মালসী" গাহিলে তিনি উৎকর্ণ হইয়া তন্ময়ভাবে তাহা শুনিয়া শিখিয়া লইতে চেষ্টা করিতেন। শ্যামাসঙ্গীতের প্রতি বাল্যকালেই তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। গ্রামের দক্ষিণে দিগ্‌দিগন্তবিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তরে পীরের একটি দরগা ছিল। এইস্থান চারিপাশের জমি হইতে কতকটা উঁচু, এবং ইহার চারিদিকে তাল, কাঁটাল, খেজুর, বট ও আম্র বৃক্ষের সারি ছিল। বাল্যসঙ্গীদের লইয়া রাখাল প্রায়ই এইস্থানে আসিতেন এবং সকলে মিলিতকণ্ঠে শ্যামাসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে ভাবে তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন এমন কি কখন কখন তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞাও থাকিত না। তাঁহাকে তৎকালে দেখিলে মনে হইত তাঁহার মন যেন কোন অতীন্দ্রিয় ভাব সৌন্দর্য্যে ও অপার্থিব বিমল আনন্দে মগ্ন হইয়া গিয়াছে। বাল্যকালেও বালক রাখাল সাধারণ বালকের মত ছিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৈশোর

দেখিতে দেখিতে রাখাল দ্বাদশবর্ষে উপনীত হইলেন। পাঠশালার বিদ্যা সমাপ্ত হইলে আনন্দমোহন বুঝিলেন যে পুত্রকে উপযুক্তরূপে বিদ্যাশিক্ষা দিতে হইলে গ্রামে রাখিলে আর চলিবে না। তখনকার যুগে কলিকাতাই ইংরাজী শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। কলিকাতা সহর শিকরা কুলীনগ্রামের নিকটবর্ত্তী, সুতরাং যাতায়াতেরও বিশেষ কোন অসুবিধা নাই। তাঁহার আত্মীয়স্বজন অনেকেই জীবিকার জন্য কলিকাতায় বাস করিতেন। কার্য্যব্যপদেশে বসিরহাটের এবং উক্ত গ্রামের অনেকেই কলিকাতায় প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। ইহা ব্যতীত আনন্দমোহনের দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুর-গৃহ কলিকাতার বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটে অবস্থিত ছিল। এক্ষেত্রে কলিকাতায় পুত্রকে রাখিলে সর্ব্বদা তাহার সংবাদ পাইতে কোন অসুবিধা বা উদ্বেগের সম্ভাবনা নাই। এই সকল সুযোগ-সুবিধা চিন্তা করিয়া আনন্দমোহন শুভদিনে পুত্রসহ কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।

আনন্দমোহনের দ্বিতীয়া পত্নী হেমাঙ্গিনীর একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, রাখাল তাঁহার পিতৃগৃহে থাকিয়া অধ্যয়ন করে। কারণ তাঁহার পিতা শ্যামলাল সেন মহাশয় একজন সম্পন্ন গৃহস্থ এবং দেব-দ্বিজে ভক্তিমান ছিলেন। তাঁহার নিকটে থাকিলে বালক-রাখালের কোন অসুবিধা হইবে না, বরং সে স্নেহ যত্নের আবেষ্টনেই প্রতিপালিত

হইবে এবং তাহার স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ে তাঁহারা নিরুদ্বেগে ও নিশ্চিন্ত মনে থাকিতে পারিবেন। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে বার বৎসর পর্য্যন্ত যে বালককে তিনি স্বীয় পুত্রের ন্যায় স্বহস্তে লালনপালন করিয়াছেন, বিবাহের পরে স্বামিগৃহে আসিয়াই তিনি যে মাতৃহীন বালকের জননীস্বরূপা হইয়াছিলেন, প্রসূতি না হইয়াও যে বালককে আশ্রয় করিয়া তাঁহার মাতৃহৃদয়ের সকল মাধুর্য্য বিকাশ পাইয়াছিল সেই স্নেহের নিধিকে অপর কোথাও রাখিতে তাঁহার মন চাহিল না। এই বিষয়ে আনন্দমোহনেরও ভিন্ন মত ছিল না। সুতরাং শ্বশুর-গৃহের সন্নিকট ট্রেনিং একাডেমিতে পুত্রকে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আনন্দমোহন স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন।

কলিকাতার বিদ্যালয়ে সমবয়স্ক সঙ্গীর অভাব নাই কিন্তু রাখাল কেমন যেন তাহাদের সহিত মন খুলিয়া মিশিতে পারিতেন না। ট্রেণিং একাডেমির সংলগ্ন ব্যায়ামাগার দেখিয়া রাখালের ব্যায়াম করিবার বিশেষ ইচ্ছা হইল। এইস্থানে পল্লীর যুবকেরা ও স্কুলের ছাত্রেরা সমবেত হইয়া উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে ব্যায়াম অভ্যাস করিত। কাঁসারীপাড়া ও শিমলা প্রায় এক পল্লী বলিলেই হয়; এই সব পল্লীর ছেলেদের নেতা ছিলেন কিশোর বালক নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রনাথ ও রাখালচন্দ্র প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন; বয়ঃক্রম হিসাবে উভয়ের মধ্যে মাত্র একমাসের ব্যবধান। বিদ্যালয়ে রাখাল নরেন্দ্রনাথ অপেক্ষা তিন চারি শ্রেণী নীচে পড়িতেন। নরেন্দ্রনাথ ছিলেন দীপ্ত-পাবক স্ফুলিঙ্গ। তাঁহার উজ্জ্বল বিশাল নেত্র, সুগঠিত দেহ, পৌরুষব্যঞ্জক ভাব, তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি, ক্ষুরধার-তুল্য বুদ্ধি, সুমধুর কণ্ঠস্বর ও অসামান্য লাবণ্য সকলকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিত। সহপাঠী

বা সমবয়স্ক বালকেরা তাঁহার নেতৃত্বে ও ইচ্ছাধীনে পরিচালিত হইত। স্বভাব কোমল, সরল বালক রাখালচন্দ্র নরেন্দ্রনাথের সঙ্গ ও বন্ধুত্ব লাভের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের পরিচয় এই কিশোর বয়সেই ঘটে। পল্লীর সমবয়স্ক বালক বলিয়াই হউক অথবা কোন অজ্ঞাত আত্মীয়তাসূত্রেই হউক, নরেন্দ্রনাথের সহিত রাখালচন্দ্রের এই সময়েই মিলন হয়। উত্তরকালে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণতলে বসিয়া উভয়ে আজীবন বিমল বন্ধুত্বের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হন। বাস্তবিকই এই দুই জনের মনেই বালক-বয়স হইতে আধ্যাত্মিকতার প্রবল বহ্নি দীপ্যমান ছিল। দুই জনেই সঙ্গীতানুরাগী ও ধ্যানপরায়ণ; শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় বলিতে গেলে দুই জনেই ঈশ্বর-কোটী নিত্যসিদ্ধ ও বিশেষ অন্তরঙ্গ। একজন সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি সাক্ষাৎ নরনারায়ণ—অপর ব্রজমণ্ডলের ক্রীড়া-সঙ্গী কৃষ্ণ-সখা।

ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ধর্ম্ম, সমাজ, আচার ব্যবহার এবং বেশভূষার বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম মোহ-মাদকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার ঘোর কাটিয়া গেলে ধ্বংস ও গঠনমূলক সংস্কারকের দল বাংলার ধর্ম্ম ও সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। রাজা রামমোহন "বেদান্ত-প্রতিপাদিত সত্য ধর্ম্ম" প্রচারের উদ্দেশ্যে যে ব্রহ্মসভা স্থাপন করিয়াছিলেন মহর্ষি আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথের উদ্যম ও সাধনায় তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজে পরিণত হইল। বাংলার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মনীষী ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিরা ইঁহার পতাকাতলে দাঁড়াইয়া পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আলোকে নবভাবে নবযুগ প্রবর্ত্তন করিতে প্রয়াসী হইলেন। এই আন্দোলনের প্রচণ্ড তরঙ্গ তুলিলেন আচার্য্য শ্রীকেশব

চন্দ্র। তাঁহারই নেতৃত্বে ভারতে, বিশেষতঃ বাংলায় সাকার-উপাসনা ও প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন ব্রাহ্মসমাজ। রামপ্রসাদের "মালসী", কমলাকান্তের শ্যামাসঙ্গীত, বৈষ্ণব পদাবলী ও কীর্ত্তন গানের পরিবর্ত্তে "ব্রহ্মসঙ্গীত" রচিত, গীত ও প্রচারিত হইল। নিরাকার উপাসনার জন্য উপনিষদ্ হইতে বাছিয়া বাছিয়া মন্ত্র আবৃত্তি হইতে লাগিল এবং খৃষ্ট-উপাসনার ধারায় প্রার্থনা ও উপাসনা ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনায় বিশেষ স্থান অধিকার করিল। নীতি, পবিত্রতা, সত্যনিষ্ঠা ও পরোপকারের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কেশবের অপূর্ব্ব বাগ্মিতায় ও ধর্ম্মজীবনে মুগ্ধ হইয়া তরুণ যুবকগণ দলে দলে ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত হইতে লাগিল।

কিশোর বয়সেই নরেন্দ্রনাথ ও রাখাল এই তরঙ্গে আন্দোলিত হইলেন। তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে নিয়মিত ভাবে যোগদান করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথের উন্নত সঙ্গ ও উপদেশে এবং তাঁহার অপূর্ব্ব প্রভাবে রাখালও তদ্ভাবে অনুরঞ্জিত হইলেন। নরেন্দ্র তখন তাঁহার বয়স্যবর্গের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য তাঁহাদিগকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে সহরের নানাস্থানে প্রার্থনা ও আলোচনা সমিতি গঠন করিতেছিলেন। এই কালেই একদিন নরেন্দ্রনাথ নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্ হইয়া কেবলমাত্র তাঁহারই উপাসনা ও ধ্যান-ধারণা করিবেন এই মর্ম্মে সহসা ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে লিখিত আছে যে—"শ্রীযুত রাখাল এই কালের পূর্ব্ব হইতেই নরেন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত ছিলেন এবং অনেক সময় তাঁহার সহিত অতিবাহিত করিতেন। শিশুর ন্যায় কোমল প্রকৃতি-

সম্পন্ন নির্ভরশীল রাখালচন্দ্র যে নরেন্দ্রনাথের সপ্রেম ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সর্ব্ববিষয়ে নিয়ন্ত্রিত হইবেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সুতরাং নরেন্দ্রনাথের পরামর্শে তিনিও ঐ সময়ে পূর্ব্বোক্তপ্রকার অঙ্গীকার-পত্রে সহি করেন।" এই সময়ে নরেন্দ্রনাথ ধর্ম্মভাবের তীব্র প্রেরণায় অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালনে ও কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলেন। লীলাপ্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে যে—"তিনি নিরামিষভোজী হইয়া ভূমি অথবা কম্বলশয্যায় রাত্রি যাপন করিতে ছিলেন।" রাখাল নরেন্দ্রনাথের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতেন। দুইজনে ব্রহ্মচর্য্য পালনোদ্দেশ্যে ও শারীরিক বল সঞ্চয় করিতে সচেষ্ট হইয়া মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীটে অম্বিকাচরণ গুহ মহাশয়ের কুস্তির আখড়ায় নিয়মিতভাবে ব্যায়াম শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। এইরূপে কি ধর্ম্মে, কি কর্ম্মে, কি আধ্যাত্মিক ভাববিকাশে যাহাতে একরূপে গঠিত হইতে পারেন তজ্জন্য ইঁহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ছাত্রজীবনে রাখাল ভগবদ্‌ধ্যানে ও ধর্ম্মচিন্তায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। বিদ্যালয়ে বিদ্যার্জ্জনে তাঁহার আর তাদৃশ আগ্রহ বা যত্ন ছিল না। জন্মগত সংস্কারবশেই হউক বা সরল পবিত্র বিশুদ্ধ চরিত্র বশতঃই হউক কিশোর রাখাল ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্যই ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার মনে স্বাভাবিক ভাবেই উদয় হইত যে একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যাই বিদ্যা। যে বিদ্যায় মানবজীবনে ব্রহ্মবস্তু লাভ হয়, যে বিদ্যায় হৃদয় নির্ম্মল হইয়া শরীর ও মন সতেজ ও পবিত্র হয়, যে বিদ্যায় মানুষ অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত প্রেমের অধিকারী হইতে পারে—সেই বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ। সেই বিদ্যার্জ্জনেই রাখালের এখন

ব্যাকুলতা। বাস্তবিকই তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধাশক্তি, তন্ময়তা ও একাগ্রচিত্ততা সমবয়স্ক কোন বালকের অপেক্ষা বিশেষ কম ছিল না। গতানুগতিক ভাবে সাধারণ মানুষের মত তাঁহার মনের গঠন না থাকাতেই তিনি অপরাবিদ্যার আলোচনায় মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। ঈশ্বর লাভ করাই তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য ছিল এবং কিশোর বয়স হইতেই তাঁহার জীবনের গতি সেই দিকেই ধাবিত হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথের প্রতি সহজেই তাঁহার আকর্ষণ ছিল—কারণ তাঁহার অপূর্ব্ব পবিত্রতা, জ্বলন্ত উৎসাহ, তেজোগর্ভ বাণী, প্রেমপূর্ণ হৃদয় এবং ঈশ্বরানুরাগ রাখালকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিত। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে নরেন্দ্রনাথ তাঁহার পিতার সহিত রায়পুরে গমন করেন। তথায় দুই বৎসর থাকিয়া পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এই দুই বৎসর রাখাল নরেন্দ্রের সাহচর্য্য ও সঙ্গলাভ করিতে পারেন নাই। এই নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাখাল নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস, বিদ্যালয়ের পাঠ ও ঈশ্বর চিন্তা করিতেন। তাঁহার মনের সহজ গতি ছিল ঈশ্বরাভিমুখী। ব্রাহ্মসমাজে যে সব ভগবদ্‌প্রসঙ্গ শুনিতেন তাহা তিনি নির্জ্জনে একাকী চিন্তা করিতেন। রাখাল ব্রাহ্মসমাজে শুনিয়াছেন যে ব্রহ্ম—অখণ্ড, অনন্ত, নিরাকার ও জ্যোতিঃস্বরূপ। তিনিই একমাত্র জীব জগতের প্রাণ—তিনি সকলের ত্রাতা ও পিতা। "ওঁ পিতা নোহসি"—ইহাই বেদমন্ত্র তিনি আমাদের পিতা—আমরা তাঁহার পুত্র। তাই নির্জ্জনে বসিয়া তাঁহার মনে হইত যে পরমেশ্বরই সকলের প্রকৃত পিতা, সকল জীবের পালয়িতা ও পরিত্রাতা—পরম কারুণিক ও পরম প্রেমিক! সেই

পিতার দর্শন কি মানুষ পাইতে পারে না? "ওঁ পিতা নোঽসি" তিনি আমাদের পিতা! তাঁহাকে কি সত্য সত্যই আমাদের এই পার্থিব পিতার ন্যায় প্রকৃতভাবে দেখা যায়? তাঁহার বাণী কর্ণে শুনা যায়? তাঁহার অপার স্নেহবারিধির পীযূষধারায় স্নাত হওয়া যায়? তাঁহার করুণার অমৃতবারি পান করা যায়? রাখাল নির্জ্জনে বসিয়া একান্ত ব্যাকুলচিত্তে ভাবিতেন, হায়! এই রহস্য কে তাঁহাকে বলিয়া দিবে? তিনি বাহিরে কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেন না,—নিভৃতে এই চিন্তায় বিভোর থাকিতেন। ছাত্র জীবনেও তাঁহার গম্ভীর প্রকৃতি মহাসাগরের মতই শান্ত ছিল কিন্তু যে উদ্বেল তরঙ্গ তাঁহার অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হইত বাহিরে তাহার প্রকাশ ছিল না। পারমার্থিক রাখাল পরমার্থ-লাভের আশায় ব্যাকুল ছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরিণয়

কিশোর বয়স উত্তীর্ণ হইয়া রাখাল এখন সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। যে সময়ে মানুষের মনে ভোগ-লালসার প্রবল তৃষ্ণা জাগিয়া উঠে, যে সময়ে ইন্দ্রিয়গ্রাম দুর্ব্বার ও অসংযত হইতে প্রয়াস পায়, যে সময়ে চক্ষুতে বহুভাব ও বর্ণের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, সেই সময়ে এই অদ্ভুত যুবকের চিত্ত নিবৃত্তির পথে ধাবিত হয়,—সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য সহায়ে উদ্দাম ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহকে সংযত রাখিতে প্রযত্ন করে; চক্ষু জগতের অসীম সৌন্দর্য্য দেখিয়া ঈশ্বরের সৃষ্টিচাতুর্য্য স্মরণ করিয়া বিমুগ্ধ হয়, এবং তাঁহার মন শুধু চিরসুন্দর, চিরমঙ্গলময় এবং নিত্যবস্তু ভগবল্লাভের আকাঙ্ক্ষায় নিমগ্ন থাকে। এই অদ্ভুত বালক যৌবনে পদার্পণ করিয়াও ক্ষুদ্র বালকের মত সরল লাবণ্যপূর্ণ। বালকের মতই তাঁহার নির্ম্মল শুভ্র হাসি, বালকের মতই তাঁহার কোমল অন্তর।

অভিভাবক শ্যামলাল সেন মহাশয় রাখালের সুন্দর বিনয়-নম্র ব্যবহার, ধর্ম্মপ্রাণতা এবং নানাবিধ সদ্‌গুণরাশিতে মুগ্ধ হইলেও তাঁহার অধ্যয়নে উদাসীনতা দেখিয়া বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, রাখাল বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে গেলেও বার্ষিক পরীক্ষায় তেমন কৃতী ছাত্ররূপে পরিগণিত হইতে পারিতেছেন না এবং পড়াশুনা অপেক্ষা ব্রাহ্মসমাজে, ধর্ম্মালোচনায় ও ব্যায়াম অভ্যাসে

অধিকাংশ সময় যাপন করিতেছেন তখন তিনি অগত্যা তাঁহার জামাতা আনন্দমোহনকে রাখালের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ জানাইলেন। আনন্দমোহন পুত্রের পাঠে ঔদাসীন্য ও প্রবল ধর্ম্মানুরাগের কথা ইতিপূর্ব্বেই লোকপরম্পরায় শুনিয়াছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে পুত্রকে দেখিতেও আসিতেন। কিন্তু পুত্রের নির্ম্মল আদর্শ চরিত্র, সদ্‌বুদ্ধি, ধর্ম্মপ্রাণতা ও সরলতা দেখিয়া মনে মনে বিশেষ আনন্দবোধ করিতেন। পুত্রকে সাদরে নিকটে আহ্বান করিয়া সুমিষ্ট বচনে নানা সদুপদেশ প্রদান করিতেন এবং তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতেন যে ছাত্রজীবনে অধ্যয়নই একমাত্র ধর্ম্ম। পুত্রের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান কিম্বা নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে নানাস্থানে ধর্ম্মালোচনার জন্য গমনাগমনে আনন্দমোহন কোনরূপ অন্তরায় হইতেন না। এই সব আন্দোলনে অধিক সময় নষ্ট না করিয়া যাহাতে রাখাল পড়াশুনায় মনোনিবেশ করেন, তৎপ্রতি তিনি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। পিতার উপদেশ শ্রবণ করিয়াও তিনি একাগ্র মনে পাঠে মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না। ধর্ম্মানুভূতির প্রবল আগ্রহে ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্য বুদ্ধি যেন কোথায় ভাসিয়া যাইত। জ্ঞানার্জ্জনের জন্য অধ্যয়ন করা যে প্রয়োজন এবং বিদ্যালয়ে কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিলে যে যশ, সুখ্যাতি ও আত্মতৃপ্তি আছে তাহা অন্তরে বুঝিতে পারিলেও রাখালের মনের স্বাভাবিক উচ্চ ভাবভূমিতে তাহা যেন স্থান পাইত না। পরমার্থলাভের ধ্যানই রাখালের নিকট শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় স্বাভাবিক ভাবে প্রবাহিত হইত। ছাত্রজীবনে জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা বা অন্য কোন বুদ্ধি ও আকাঙ্ক্ষা সেই স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করিতে পারে নাই।

রাখাল ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনায় নিয়মিতভাবে যোগদান করিতেন। র্য্যের মুখে ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান ও প্রার্থনা শুনিয়া তিনি ভক্তিপূর্ণ য়ে গৃহে প্রত্যাগত হইতেন। কিন্তু যখন রাখাল নির্জ্জনে একাকী প্রার্থনা ও উপাসনা করিতে বসিতেন তখন তাঁহার মনে হইত যে, এই বিশ্বের স্রষ্টা যেমন আদি-অন্তহীন তাঁহার ধ্যান ও চিন্তা তেমনি আদি-অন্তহীন। গভীর কল্পনায় কখন কখন তাঁহার মনে সংশয়ের প্রবল ঝঞ্ঝা বহিত, ক্ষণে ক্ষণে নিরাশার ঘোরান্ধকার দেখা দিত, কখন আশার বিজলী খেলিয়া যাইত আবার কখন তাঁহার চিত্তপটে কত সৌন্দর্য্য-সমুদ্রের তরঙ্গ, অনন্ত জ্ঞানের অভ্রভেদী শৃঙ্গ, কত মাধুর্য্য ও বিবস্বান জ্যোতিঃ ভাসিয়া উঠিত। মনের এই বিচিত্র চঞ্চল রূপ নিরীক্ষণ করিয়া রাখাল অত্যন্ত বিস্মিত হইতেন। সংশয়াচ্ছন্ন চিত্তে তিনি ভাবিতেন, এই তো মন! এই মনে কি তাঁহাকে পাওয়া যায়? সেই সত্য জ্ঞান অনন্তস্বরূপ অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মকে কি এই মন ধারণা করিতে পারে? কে আছে, যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার এই সকল সংশয় তিরোহিত হয়? এইরূপ চিন্তাসঙ্কুল মনে রাখাল সর্ব্বদা অন্যমনস্ক থাকিতেন। পাঠে তাঁহার মন কিছুতেই রীতিমতভাবে নিবিষ্ট হইত না।

আনন্দমোহন দেখিতে পাইলেন যে রাখাল পাঠে অমনোযোগী। তিনি মাঝে মাঝে পুত্রকে ভর্ৎসনা ও শাসনের ভয় দেখাইতেন। গুরুজনেরা ও আত্মীয়-স্বজনেরাও রাখালকে পড়াশুনায় মনোনিবেশ করিতে কত সদুপদেশ দিতেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। আনন্দমোহন চিন্তিত হইলেন। একমাত্র পাঠে অবহেলা ছাড়া তাঁহার বিরুদ্ধে আর কিছু অভিযোগ করিবার

ছিল না। রাখাল এখন ষোড়শবর্ষ অতিক্রম করিয়া সপ্তদশবর্ষে উপনীত হইয়াছেন। ক্ষুদ্র বালক হইলে তাঁহাকে শাসন করা যাইত—কিন্তু এ যে যুবক। এদিকে আনন্দমোহনের শ্বশুর শ্যামলাল প্রমুখ আত্মীয়-স্বজনেরা রাখালের ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগ ও পাঠে নিয়ত অবহেলা দেখিয়া অবিলম্বে পুত্রের বিবাহ দিতে তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন। গতানুগতিক লোকেরা সাধারণতঃ যেরূপ মনে করিয়া থাকে তাঁহারাও রাখালকে সেইরূপ ভাবে বুঝিলেন। আধ্যাত্মিকতার গভীরতা ও তীব্রতা তাঁহারা কেহই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। ঘটনাক্রমে এই সময়ে একটি মনোমত পাত্রীর সহিত বিবাহের প্রস্তাবও উত্থাপিত হইল। কাঁসারীপাড়ার সন্নিকটস্থ পল্লীতেই তখন শ্রীযুক্ত মনোমোহন মিত্র কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিতেন। তিনি গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটারীএট-এ কাজ করিতেন। বিশ্বেশ্বরী নামে মনোমোহনের একটি অবিবাহিতা ভগ্নী ছিল। বালিকার বয়স তখন প্রায় একাদশবর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে সুতরাং তাঁহার অভিভাবকেরা তাঁহাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিতে চারিদিকে পাত্রের সন্ধান করিতেছিলেন। রাখালের মত নির্ম্মল-চরিত্র সম্ভ্রান্ত যুবকের সহিত সেই ভগ্নীর যাহাতে বিবাহ হয় তদ্বিষয়ে মনোমোহনের বিশেষ চেষ্টা ছিল। মনোমোহনের ধর্ম্মশীলা মাতা রাখালের মত ধার্ম্মিক জামাতা পাইবার আশায় পুত্রকে এই বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইতে আদেশ করিলেন। যখন মনোমোহন শুনিতে পাইলেন যে রাখালের অভিভাবকেরা একটি মনোমত বয়স্কা সুন্দরী পাত্রীর সন্ধান করিতেছেন, তখন তিনি সে সুযোগ ত্যাগ করিলেন না। পূর্ব্ব হইতেই শ্যামলালের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। শ্যামলাল জানিতেন যে মনোমোহন সরকারী কাজ করেন এবং

মধ্যে অমায়িক, সজ্জন ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার
কলের নিকটে বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার পিতা
ভুবনমোহন ডাক্তারী ব্যবসায় করিতেন। ইঁহারা কোন্নগরের
বংশ—কায়স্থসমাজে সম্ভ্রান্ত কুলীন বলিয়া খ্যাত। পল্লীর মধ্যে
াখালের বালসুলভ কমনীয় মূর্ত্তি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।
সৌষ্ঠবমণ্ডিত দৃঢ় মাংসপেশী-সমন্বিত অবয়ব ও স্বাস্থ্যপূর্ণ
প্রতি অনেকেই চাহিয়া থাকিত। বিশেষতঃ রাখালের পবিত্র
ও সদ্‌গুণরাশীর কথা পল্লীর কাহারও অপরিজ্ঞাত ছিল না।
ইরূপ সম্ভ্রান্ত কুল-সম্ভূত নবীন যুবককে জামাতৃপদে বরণ করিতে
অনেকেই লালায়িত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু
্যামলাল মনোমোহনের ভগ্নীর সহিত সম্বন্ধের প্রস্তাব অনুমোদন
করিয়া আনন্দমোহনের নিকট উহা উত্থাপিত করিলেন। আনন্দমোহনও
নোমত পাত্রী এবং সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা পাইয়া শ্বশুরের উক্ত
বে সানন্দে স্বীকৃত হইলেন। তিনি ভাবিলেন যে পুত্রের
বিবাহ দিলে তাঁহার মনের ঔদাসীন্য কাটিয়া যাইবে। বিষয়-বুদ্ধি-
আনন্দমোহন পুত্রের বিষয়ানুরক্তির আশায় তাঁহাকে
দাম্পত্য-বন্ধনে আবদ্ধ করাই যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলেন।
নি দেখিলেন যে তাঁহার পুত্র কি বুদ্ধিমত্তায়, কি নৈতিক চরিত্রে,
ধীরতায় কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহেন। কৃতী ছাত্র বলিয়া
বিদ্যালয়ে যশস্বী না হইলেও ক্লাশের পরীক্ষায় কোন দিন অকৃত-
কার্য্য হন নাই, সুতরাং বিবাহ দিলে রাখালের পাঠেও হয়ত অনুরাগ
পাইতে পারে।

রাখালের মন এই সময়ে দ্বন্দ্ব-সঙ্কুল ছিল। পার্থিব সুখ-

সম্ভোগে তাঁহার স্পৃহা ছিল না। তাঁহার দৃষ্টি তখন দিকে। কৈশোর হইতেই ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসিয়া রাখাল বৈরাগ্যের উপদেশ কখনও পান নাই; পরিণয় বন্ধন যে তাঁহার অভীষ্ট লাভের অন্তরায় হইতে পারে, ভগবানকে লাভ করিতে হইলে যে তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে, রাখালের ঈশ্বর-লুব্ধচিত্তে ঈদৃশ জটিল প্রশ্ন আদৌ উদিত হয় নাই। বালকের মত সরল রাখাল সাধারণ কর্ত্তব্য বুদ্ধিতেই বুঝিলেন যে সংসারে সকলেই বিবাহ করিয়া থাকে, তাঁহাকেও করিতে হইবে; তাঁহার পিতা ও অন্যান্য গুরুজনদের ইচ্ছা পূর্ণ করাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু রাখালের বৈরাগ্য প্রকৃতি-সিদ্ধ। তাঁহার লক্ষ্য পরম পিতার প্রেম, তাঁহার মন ব্রহ্ম চিন্তায় মগ্ন, তাঁহার প্রকৃতি সতত ধ্যান-পরায়ণ, তাঁহার বৈরাগ্য অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় সর্ব্বদাই প্রবাহিত হইত, বহিঃপ্রকাশ না থাকিলেও তাহা অন্তরে আজন্ম বিদ্যমান ছিল।

শুভদিনে শুভলগ্নে শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরীর সহিত রাখালের পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হইল। কিন্তু তখন কে জানিত যে, এই বিবাহবন্ধনই তাঁহার সকল প্রকার জাগতিক বন্ধনের মুক্তির কারণস্বরূপ হইবে। কে জানিত যে, মহামায়া কোন অপরিজ্ঞাত কৌশলে তাঁহার প্রকৃতিসুলভ বৈরাগ্য-মূর্ত্তিকে অধ্যাত্ম-দীপ্তিতে সমধিক উজ্জ্বল করিয়া দিবেন? কে জানিত এই বিবাহের ফলে রাখাল দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদমূলে উপনীত হইয়া তাঁহার চির-ঈপ্সিত, অনন্তমাধুর্য্যপূর্ণ স্নেহরসের পীযূষধারা পান করিয়া সন্তানভাবে বিহ্বল ও আত্মহারা হইবেন?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বাংলার যুবকবৃন্দ ভারতের প্রাচীন আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা হারাইতে লাগিল। তাহারা নবাগত পাশ্চাত্য জাতির আদর্শে নূতন ভাবে জাতীয় জীবন সংগঠনে ব্রতী হইল। ইংরাজী বিদ্যা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ইয়ং-বেঙ্গলের উদ্ভব; যুবকবৃন্দ স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন যুক্তিবাদের নামে উচ্ছৃঙ্খলতার মাদকতায় মাতিয়া উঠিল। ধীর, মনস্বী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় ঘটাইতে গিয়া পুরাতনকে একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন আকারে গঠন করিতে প্রয়াসী হইলেন। রাজা রামমোহনের নব আলোক-সম্পাতে মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শিক্ষা-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মে শাস্ত্রাদি অপেক্ষা 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধোজ্জ্বল' সিদ্ধান্তকে উচ্চতর স্থান দিয়া যুবক সম্প্রদায়কে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই যুবক কেশবচন্দ্র তাঁহার অগ্নিগর্ভ বিদ্রোহের বাণীতে যুবকবৃন্দকে প্রাচীনতার বিরুদ্ধে বিপ্লবের অভিযানে নিয়োজিত করিলেন। মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনের মমতা-বন্ধন উপেক্ষা করিয়া সত্যান্বেষী ও দেশের মঙ্গলকামী যুবকের দল ব্রাহ্মসমাজের পতাকার তলে সমবেত হইয়া কেশবচন্দ্রের প্রচারিত জ্বলন্ত আদর্শে তাহাদের স্ব স্ব জীবন আহুতি প্রদানে

প্রবৃত্ত হইল। যখন সমগ্র বাংলায় এইরূপ সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিপ্লব চলিতেছিল, তখন কলিকাতার অদূরে গঙ্গাকূলে দক্ষিণেশ্বরস্থ রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরে এক নিরক্ষর, দীনহীন পূজক ব্রাহ্মণ জগতে যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ও মহাশক্তির উদ্বোধন করিবার জন্ম অলৌকিক কঠোর সাধনায় মগ্ন ছিলেন।

যুগে যুগে যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, যখন শাশ্বত সত্যের বিরাট মূর্ত্তি মিথ্যাচার ও আবর্জ্জনার জীর্ণ-স্তূপে আচ্ছাদিত হয়, যখন সমগ্র মনুষ্যজাতি দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের মত আকুল আগ্রহে সত্য পথের জন্ম চঞ্চল উৎকণ্ঠায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন অপার করুণায় শান্তির অমৃতপাত্র হস্তে লইয়া যুগপ্রবর্ত্তক সনাতন বেদমূর্ত্তি মহাপুরুষ জীবজগতের কল্যাণার্থে আবির্ভূত হন। ইহাই ধর্ম্মক্ষেত্র পুণ্যভূমি ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তির ইতিহাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ কঠোর সাধনার ফলে ভাবময় চক্ষে যে অখিল রসামৃত-সিন্ধুর দর্শন পাইয়াছিলেন তাহার সন্ধান দিতে ও জীবের মুক্তির জন্ম যে মহারত্ন আহরণ করিয়াছিলেন তাহাই জগতে বিতরণ করিতে ব্যাকুল হইলেন। শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহাকে বলিলেন—"তুই আর আমি এক। তুই ভক্তি নিয়ে থাক—জীবের মঙ্গলের জন্ম। ভক্তেরা সকলে আস্‌বে। তোর তখন কেবল বিষয়ীদের দেখতে হবে না; অনেক শুদ্ধ ও কামনাশূন্ম ভক্ত আছে—তারা আসবে।" অতঃপর মন্দিরে আরতির সময় কাঁসর-ঘণ্টা যখন বাজিয়া উঠিত, তখন ভাববিহ্বল শ্রীরামকৃষ্ণ কুঠির উপর হইতে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেন, "ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস

।গগির আয়।" তাঁহার সেই ব্যাকুল আহ্বান বায়ুস্তরে মিশিয়া বক্ষে স্পন্দন উৎপাদন করিত কি না—কে জানে! কে গানে তাহা অলক্ষ্যে ভক্তহৃদয়ে আঘাত করিয়া ভক্তকে তাঁহার নিকট আকর্ষণ করিত কি না!

কেশবচন্দ্রের আগমনের পর হইতেই কলিকাতা ও বিভিন্ন স্থান হইতে দলে দলে লোক আধ্যাত্মিক পিপাসা শান্তির জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসিতে লাগিল। ভাগীরথী তীরে পঞ্চবটী-মূলে শ্রীরামকৃষ্ণ এখন নির্ব্বিকল্প সমাধিতে লীন নহেন। সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া এখন তিনি মাঝে মাঝে পিপাসু ভক্তগণে পরিবৃত হইয়া পঞ্চবটীতলে বসিয়া থাকেন। কথনও তাঁহার বসিবার ও শয়নের ঘরে, কথনও তৎসংলগ্ন বারান্দায় লোকে লোকারণ্য হয়। তিনি তাঁহাদের সম্মুখে বসিয়া কথনও ঈশ্বরপ্রসঙ্গে বিভোর, কথনও সমাধিস্থ, কথনও স্বাভাবিক ঊর্দ্ধগামী মনের গতিকে লোক-কল্যাণের জন্য সংযত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, আবার কথনও বা এই আনন্দময় পুরুষ রঙ্গহাস্যে ও সরসবাক্যে আনন্দের তরঙ্গ বহাইয়া দিতেছেন। যাঁহারা আসিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী সাধনার ইঙ্গিত পাইতেছেন, আবার কেহ কেহ সংশয়-তিমির হইতে উদ্ধার পাইয়া সত্যের উজ্জ্বল আলোক দর্শনে কৃতার্থ হইতেছেন। কেহই রিক্তহস্তে প্রত্যাখ্যাত হইতেম না। পাপী তাপী, সাধু পুণ্যবান, পতিত ও উন্নত—তাঁহার নিকটে সকলেই সমভাবে সমাদৃত। প্রাতঃকাল হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত লোকসমাগমের অন্ত নাই এবং তাঁহাদের কল্যাণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণেরও বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নাই। সকলেরই অবারিত দ্বার। অহর্নিশি ঈশ্বর-

কথাপ্রসঙ্গে ও দিব্যভাবে তাঁহার মনের সমুদয় জটিল প্রশ্ন সমাধান করিয়া দেন। তদবধি তিনি সুযোগ মত প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন। পুত্রের নিকট তাঁহার মাতা শ্রীরামকৃষ্ণের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, "ইনি ত সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে লীলা করিতেছেন।" তাঁহার মাতাও প্রায়ই তাঁহাকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। মনোমোহনও শ্রীরামকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র জ্ঞানে ভক্তি করিতেন। সুতরাং বলিতে গেলে মনোমোহনের সমগ্র পরিবার শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। দৈবযোগে এই ভক্তপরিবারের সহিত রাখাল পরিণয়সূত্রে মিলিত হইলেন। রাখাল যখন বিবাহের পর প্রথম শ্বশুরালয়ে গেলেন, তখন ভক্ত মনোমোহন কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে নূতন জামাতা রাখালচন্দ্রকে শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদ-লাভ ও তাঁহার সঙ্গে পরিচয় করাইবার জন্য সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করিয়াই রাখালের হৃদয়ে বিদ্যুৎচমকের মত একটা অভূতপূর্ব্ব নিবিড় আকর্ষণের দীপ্তিলেখা খেলিয়া গেল। রাখাল ও মনোমোহন উভয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত হইলেন। মনোমোহন ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট রাখালের পরিচয় দিলেন।

রাখালকে প্রথমে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ স্থিরভাবে কেবল চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। যদিও তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালকে শ্রীশ্রীজগদম্বার দান বলিয়া চিনিতে পারিলেন, যদিও তাঁহাকে তাঁহারই প্রার্থিত নিত্যসঙ্গী এবং শ্রীশ্রীজগজ্জননীর প্রদত্ত শুদ্ধসত্ত্ব-মানসপুত্র বলিয়া জানিতে পারিলেন কিন্তু বাহিরে

মনোমোহনের সমক্ষে তাহা কিছুমাত্র প্রকাশ করিলেন না কিম্বা কোনরূপ আবেগ উচ্ছ্বাসও দেখাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ গম্ভীর ভাবে রাখালের দিকে তাকাইয়া থাকিবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ মনোমোহনকে সহাস্যে বলিলেন, "সুন্দর আধার!" অনন্তর তিনি রাখালের সঙ্গে এমন ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন যেন তিনি তাঁহার কত দিনের পরিচিত। রাখাল শ্রীরামকৃষ্ণের এইরূপ সস্নেহ ব্যবহার দেখিয়া মনে মনে বিস্মিত হইতে লাগিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে এইরূপ সরল স্নেহসম্ভাষণ এবং মধুর ব্যবহার জীবনে কখনও উপলব্ধি করেন নাই।

অনন্তর শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নামটি কি?" নবাগত উত্তর করিলেন —"শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ।" "রাখাল" শব্দ শুনিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ভাবাবিষ্ট হইয়া গদগদকণ্ঠে আপন মনে অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন, "সেই নাম! রাখাল—ব্রজের রাখাল!" ভাবাবেশ প্রশমিত হইলে তিনি সস্নেহে মধুরকণ্ঠে তাঁহাকে বলিলেন—"এখানে আবার এসো।" এদিকে আত্মবিস্মৃত রাখাল মৌনভাবে বসিয়া বিভোর হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব দিব্যমাধুরী অনিমেষ লোচনে দেখিতেছিলেন। বোধ হয় মনে মনে তিনি ভাবিতেছিলেন—"ইনি কে? এই সৌম্য মহাপুরুষ কে? ইনি কি পরম পিতার কথা বলিয়া দিতে পারেন?" শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া রাখালের হৃদয়ে সহসা জাগিয়া উঠিল বিশ্বস্রষ্টার পিতৃত্ব। কলিকাতায় ফিরিবার পথে তাঁহার মনে কেবল এই প্রশ্ন উদিত হইতে লাগিল—"সেই পরম পিতা কি সত্য সত্যই প্রত্যক্ষীভূত হন? এই মহাপুরুষ কি তাঁহাকে সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছেন?" পথে যাইতে যাইতে তাঁহার

কর্ণে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই প্রেমপূর্ণ বাণী সুমধুর কোমলস্বরে পুনঃপুনঃ ধ্বনিত হইতে লাগিল—"এখানে আবার এসো।"

ব্রাহ্মসমাজে আধ্যাত্মিক সাধনায় রাখাল নিরাকার ব্রহ্মকে পরম-পিতারূপে পিতৃভাবের উপাসনা করিতে শুনিয়াছেন এবং কিশোর বয়স হইতে উক্তভাবে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া স্বীয় জীবনে তাহা উপলব্ধি করিবার প্রয়াস করিতেছিলেন। তাঁহার বিশুদ্ধ সত্তায় যে সন্তান-ভাব বীজাকারে অন্তর্নিহিত ছিল বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন অন্তরে অন্তরে তাহা পুষ্ট হইলেও উপযুক্ত সুযোগ-অভাবে তাহা অঙ্কুরিত হইতে পারে নাই। সংসারে সেই শুদ্ধ সুনির্ম্মল আশ্রয় দুর্লভ। শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াই যেন তাঁহার সেই অনুদ্গত সন্তানভাব সহসা বিকাশ পাইতে চাহিল। তাই মনোমোহনের সঙ্গে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও তাঁহার মন পড়িয়া থাকিল দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব স্নেহময় মাধুর্য্যমণ্ডিত মূর্ত্তি তাঁহার স্মৃতিপথে যেন স্বতঃই পুনঃপুনঃ উদিত হইতে লাগিল। তাঁহার পুণ্যসঙ্গ লাভ করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল—আবার কখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সমীপবর্ত্তী হইবেন, কখন তাঁহার অপার্থিব স্নেহের পীযূষধারা পান করিয়া তাঁহার অতৃপ্ত পিপাসা মিটাইবেন, আবার কখন তাঁহার সান্নিধ্যলাভে হৃদয়ের সমগ্র উদ্বেলতরঙ্গ শান্ত হইবে? কে এই মহাপুরুষ—যাঁহাকে দেখিলে মনে হয় যেন তিনি আপনার হইতেও আপনার, অনন্ত স্নেহের আধার! কে এই অদ্ভুত পুরুষ—যাঁহাকে দেখিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়, যাঁহার নিকট মনের সকল কথা অকপটে খুলিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, যাঁহাকে স্পর্শ করিলে শরীর মন যেন স্নিগ্ধ ও পবিত্র হইয়া উঠে!

কে এই সৌম্য পুরুষ যাঁহাকে দেখিতে দেখিতে চক্ষু মুগ্ধ হয়, যাঁহার কথা শুনিলে অন্তরের অন্তর্বীণায় মধুর ঝঙ্কার তুলিয়া দেয়, যাঁহার ভাববিহ্বল মূর্তি দেখিলে সকল পার্থিব স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া যায়। রাখাল মনে মনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন।

এইরূপ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াই রাখাল একদিন বিদ্যালয়ের ছুটির পর একাকী দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তিনি সস্নেহে বলিলেন, "তোর এখানে আসতে এত দেরী হল কেন?" রাখাল এই প্রশ্নের আর কি উত্তর দিবেন? তিনি মৌনভাবে অবাক হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি যেন কোন অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে চলিয়া গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য স্নেহস্পর্শে আত্মবিস্মৃত রাখাল গভীর ভাবে মগ্ন। ভাবের গভীরতা প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় শান্ত; কিন্তু যখন প্রবল বায়ুর তাড়নে তরঙ্গ উত্থিত হয় তখন সে প্রবল জলোচ্ছ্বাস ও ভীষণ তরঙ্গভঙ্গ কে রোধ করিতে পারে? এক্ষেত্রে তাহাই ঘটিল।

দুইজন দুইজনকে দেখিয়া ভাবে উন্মত্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিতেছেন, রাখাল আকারে বলিষ্ঠ যুবার ন্যায় হইলেও ভাবে যেন তিন চারি বৎসরের বালক। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-প্রসঙ্গে সারদানন্দ স্বামিজী লিখিয়াছেন, "শ্রীযুত রাখালের সম্বন্ধে অন্য এক সময়ে ঠাকুর আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'তখন তখন রাখালের এমন ভাব ছিল—ঠিক যেন তিন চারি বৎসরের ছেলে! আমাকে ঠিক মাতার ন্যায় দেখিত। থাকিত থাকিত, সহসা দৌড়িয়া আসিয়া ক্রোড়ে বসিয়া

পড়িত এবং মনের আনন্দে নিঃসঙ্কোচে স্তনপান করিত। বাড়ী ত দূরের কথা, এখান হইতে কোথাও এক পা নড়িতে চাহিত না'।

আজন্ম ভাবঘনমূর্ত্তি রাখাল অনন্ত ভাবসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসিলেই তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ অন্তর্নিহিত বালসত্তা ফুটিয়া উঠিত। আবার রাখালকে দেখিয়া নর ও নারী প্রকৃতির অপূর্ব্ব সম্মিলিত মূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়ে বাৎসল্যরসের তরঙ্গ উথলিয়া পড়িত। শুদ্ধ, পবিত্র রসমাধুর্য্যের ইহা এক অপূর্ব্ব ছবি! শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও রাখালকে ক্রোড়ে বসাইয়া স্তনপান করাইতেছেন, কখনও "গোপাল," "গোপাল" বলিয়া আদরে সস্নেহে তাঁহার অঙ্গে হাত বুলাইতেছেন, কখনও আনন্দে তাঁহাকে স্কন্ধে বসাইয়া নৃত্য করিতেছেন, আবার কখনও রাখালের অদর্শনে বৎসহারা গাভীর মত "রাখাল", "রাখাল" বলিয়া আকুলি বিকুলি করিতেছেন। রাখাল যেন তাঁহার নয়নের মণি, তাঁহার অঞ্চলের নিধি। রাখালও শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন এবং তাঁহার সন্নিধানে আসিলে মনে করিতেন যেন তিনিই তাঁহার ঈপ্সিত বস্তু,—চির-আকাঙ্ক্ষার ধন। রাখাল যখন দক্ষিণেশ্বরে যান তখন তাঁহার অন্য সব চিন্তা, সকল সাংসারিক স্মৃতি মুছিয়া যায়, তাঁহার নাম, ধাম, গৃহ, পরিজন সব ভুল হইয়া যায়; শুধু জাগিয়া উঠে তাঁহার সেই নিত্য বালসত্তা—শ্রীরামকৃষ্ণ যেন তাঁহার চির স্নেহময় পিতা। সন্তানভাবের আরও ঘনীভূত অবস্থায় রাখাল স্নেহময়ী জননী-জ্ঞানে তাঁহার স্তন্যপীযূষধারা আস্বাদনে উন্মুখ হইয়া উঠিতেন। কখনও কখনও রাখালের মনে হইত তিনি যেন শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যসহচর, শ্রীরামকৃষ্ণ যেন তাঁহার প্রাণের একমাত্র সুহৃদ ও সখা। আবার কখনও তাঁহার মনে উদয় হইত শ্রীরামকৃষ্ণ যেন তাঁহার নিত্য-

তিনি তাঁহার নিত্যদাস, নিত্যসেবক! রাখাল আবার কখন বিতেন, তিনি যেন অপার করুণাময়, তরঙ্গসঙ্কুল সংসারবারিধির কমাত্র কর্ণধার, বিমল ব্রহ্মানন্দে মাতোয়ারা সাক্ষাৎ জগদ্গুরু শ্রীগুরু।

শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও মা-যশোদার মত রাখালকে দেখিয়া "গোপাল," গোপাল" বলিয়া স্নেহভরে তাঁহার শিরে, চিবুকে, বক্ষে ও পৃষ্ঠে াত বুলাইতেন, আবার কখনও পিতার মত বালকের সঙ্গে ক্রীড়ায় ত হইতেন। বাস্তবিক তাঁহাদের উভয়ের এই সম্বন্ধ দেখিয়া ন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার অমর মধুর কাহিনীই স্মৃতিপথে উদিত য়। শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলীধ্বনিতে যমুনা উজান বহিত, উর্দ্ধমুখে বলী-শ্যামলী গাভীর দল হাম্বা হাম্বা রবে ডাকিয়া উঠিত, গোপগোপী ন্মাদের মত "কৃষ্ণ", "কৃষ্ণ" বলিয়া ছুটিয়া আসিত, ভাববিহ্বল ষ্ণ-সখা সুবল সুদাম উচ্ছিষ্ট ফল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অধরে তুলিয়া তে, শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দে তাহা খাইতেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে যশোদা পথপানে চাহিয়া থাকিতেন, ভাবিতেন বুঝি তাঁহার গোপাল" আসিতেছে। রাখালের ও শ্রীরামকৃষ্ণের পরস্পরের আকর্ষণও ব্রজলীলার এই বংশীধ্বনির মতই মধুর! উদ্ভিন্ন-যৌবন, বলিষ্ঠ, ব্যায়ামবীর রাখাল কোন্ মাধুর্য্যের রস আস্বাদনে তিন চারি বৎসরের বালকের মত হইয়া যাইতেন? কোন্ অমৃতধারা আস্বাদনের তৃষ্ণায় তিনি শিশুর মত শ্রীরামকৃষ্ণকে জননীজ্ঞানে তাঁহার স্তনপান করিতেন? কোন্ মাধুর্য্যঘন ভাব-বিহ্বলতায় অদ্বৈতভাবভূমিতে অবস্থিত মুহুর্মুহুঃ সমাধিমগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণ নির্বিকল্প সমাধিলাভের পরে আনন্দমাধুর্য্যে মগ্ন হইয়া বালভাবাপন্ন বককে সন্তানজ্ঞানে মাতার ন্যায় স্তনপান করাইতেন, আবার

তাঁহাকে স্কন্ধে লইয়া নৃত্য করিতেন? কেবলমাত্র পবিত্র তপস্যাপূত চিত্তই এই অপূর্ব্ব রসমাধুর্য্যের লীলা সম্যক্ ধারণা করিতে সক্ষম। একদিকে উদ্ভিন্ন-যৌবন সদ্যঃপরিণীত বলিষ্ঠকায় রাখালের আত্মহারা শিশুভাব—অপর দিকে অহর্নিশি সমাধিমগ্ন, দেহভাববিস্মৃত অতিক্রান্ত-প্রৌঢ় শ্রীরামকৃষ্ণের রাখালকে দেখিয়া নন্দরাণী যশোদার ভাবে বাৎসল্যরসের স্ফূরণ—অপূর্ব্ব রসপ্রবাহ! জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে ইহা সম্পূর্ণ নূতন এক অমৃতময় আলেখ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাৎসল্যভাবে সাধনার কথা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ইংরাজী ১৮৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দে রাখাল ও নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদেরা জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই বৎসরেই শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে মথুরামোহন দক্ষিণেশ্বরে সাধুসেবার বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। সর্ব্বসম্প্রদায়ের সাধকাগ্রণিগণ দলে দলে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে আগমন করিতে লাগিলেন। এইরূপ সমাগত সাধুদিগের মধ্যে "জটাধারী" নামক জনৈক রামাইৎ সাধুর নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ রামমন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং বাৎসল্যভাবে তাঁহার রামলালা বিগ্রহের সেবা করিতেন। জটাধারীর সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ সমগ্র তন্ত্রোক্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া আপনাকে শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিত্যসঙ্গিনীজ্ঞানে অনেক সময়ে স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া থাকিতেন। কখনও তিনি ফুলের মালা গাঁথিয়া নানাবিধ ফুলের অলঙ্কারে মা-ভবতারিণীর বিগ্রহকে সাজাইতেন, কখনও সখীভাবে চামর ব্যজন করিতেন, কখনও মথুরের সাহায্যে নূতন নূতন ভূষণে মাকে ভূষিত করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেন; আবার কখনও ভাবোন্মত্ততায় আনন্দময়ী শ্রীজগদম্বার সম্মুখে নৃত্যগীত

করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেন। প্রকৃতিভাবের সাধনায় নারীসুলভ কোমল বৃত্তিগুলি তাঁহার চরিত্রে বিকাশ পাইতে লাগিল। এই সময়ে রামলালা বিগ্রহ পাইয়া তাঁহার অপূর্ব্ব বাৎসল্যরসের সঞ্চার হয়। রামলালা যাঁহার নিকট শুধু জড়পিত্তলের মূর্ত্তি নয়—সত্য সত্য প্রত্যক্ষ জীবন্ত বাল-রামচন্দ্র। মা-কৌশল্যার ভাবে বিভোর হইয়া তিনি দেখিতেন, বালক কখন তাঁহার অগ্রে কখন পশ্চাতে নাচিতে নাচিতে চলিতেছে। কখনও দৌড়াদৌড়ি করিতেছে কখন কোলে উঠিতেছে। স্নান করাইবার সময় সে গঙ্গায় ঝাপাইতেছে, কোন কথা শোনে না। রামলালার দুরন্তপনা দেখিয়া রামকৃষ্ণ মাতার ন্যায় কখন তিরস্কার বা শাসন করিতেছেন।

প্রকৃতিভাবের পরিপূর্ণতা মাতৃত্বে। শ্রীরামকৃষ্ণেরও প্রকৃতিভাবের সাধনায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল এই মাতৃভাব। সন্তানভাবে তিনি বিশ্বজননী মহাশক্তির যে বিরাট মাতৃমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া অন্তরে অনন্ত বাৎসল্যরসের মাধুর্য্য আস্বাদ করিতেন, যে মাতৃমূর্ত্তি মাতা কৌশল্যায় বা মা-যশোদায় প্রতিফলিত—সেই মাতৃমূর্ত্তিই শ্রীরাম-কৃষ্ণের অন্তর সাধনার চিত্তপটে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল রামলালা বিগ্রহের সেবায় এবং তাঁহার মানসপুত্র রাখালের দর্শনে। তাই মাতা কৌশল্যার আদর্শে শ্রীরামকৃষ্ণের যে বাৎসল্যভাব অঙ্কুরিত হইয়াছিল অষ্টধাতুনির্ম্মিত রামলালা বিগ্রহে—তাহারই পূর্ণ পরিণতি -মা-যশোদার ভাবস্ফূর্ত্তি হইয়াছিল জীবন্ত মানুষ-রাখালের সংস্পর্শে। শ্রীশ্রীজগদম্বার এই চিহ্নিত সন্তান নিত্যবালক রামকৃষ্ণ আবার স্বয়ং জননীস্বরূপে সন্তানবাৎসল্যের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন—অনন্তভারসমুদ্রের ইহা এক অপূর্ব্ব তরঙ্গ!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে রাখাল

শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করিয়া রাখাল মনে মনে এরূপ প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতেন যে সুযোগ বা সুবিধা পাইলেই তিনি একাকী দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া যাইতেন। কখনও কখনও তিনি একাদিক্রমে কয়েক দিন তথায় অবস্থান করিতেন। উত্তর-কালে এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরঙ্গগণের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও বলিয়াছিলেন,—"আমাকে পাইলে আত্মহারা হইয়া রাখালের ভিতর যে কিরূপ বালকভাবের আবেশ হইত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। তখন যে-ই তাহাকে ঐরূপ দেখিত সে-ই অবাক হইয়া যাইত। আমিও ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহাকে ক্ষীর, ননী খাওয়াইতাম, খেলা দিতাম। কত সময়ে কাঁধেও উঠাইয়াছি! তাহাতেও তাহার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচের ভাব আসিত না!" শ্রীরাম-কৃষ্ণের সহিত রাখালের এই বালকবৎ ব্যবহারে মনে হইত যে মাতৃহারা সন্তান যেন আবার তাহার স্নেহময়ী জননীর দর্শন পাইয়াছে। নিরুদ্ধ প্রেমনির্ঝর যেন সহসা উৎসারিত হইয়া প্রবল বেগে ধাবিত হইল অনন্ত সমুদ্রের দিকে। অন্য কোনদিকে তাঁহার আর দৃষ্টি ছিল না। কখনও বিদ্যালয় হইতে, কখনও বা কলিকাতার বাসগৃহ হইতে ব্যাকুলচিত্তে রাখাল দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া যাইতেন। তিনি যে বিবাহিত ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন যুবক,

তিনি যে বিদ্যালয়ের ছাত্র ও সম্ভ্রান্ত জমিদার-বংশের সন্তান, শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি মনে উদিত হইলে তাঁহার ঐ সমুদায় স্মৃতি বিলুপ্ত হইত এবং ভাবে আবিষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার দিব্য শিশু-সত্তায় মগ্ন হইতেন। এই দিব্য বালক দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অনন্তস্নেহরূপিণী জননী, অনন্ত পীযূষধারায় তাঁহাকে সিক্ত করিতেছেন। মাতা ও পুত্র—এই সত্তাই যেন একমাত্র সত্য, জগতে আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই, এই ভাবাবেশেই দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে রাখালের আর কোথাও যাইবার সামর্থ্য ছিল না। এমন কি তাঁহার মনে অন্য কোন স্মৃতিরও উদয় হইত না।

এইরূপে তিনি আবিষ্ট হইয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রায়ই বাস করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার কলিকাতার অভিভাবক শ্যামলাল সেন মহাশয় বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া রাখালের প্রায়ই বিদ্যালয়ে ও গৃহে অনুপস্থিতি এবং দক্ষিণেশ্বরে ধারাবাহিকভাবে অবস্থিতির কথা আনন্দমোহনকে সবিস্তারে জানাইয়া দিলেন। সেই সংবাদ পাইয়া রাখালের পিতা ত্বরায় কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। তিনি আসিয়া রাখালকে অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন বটে কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। রাখালের এখন অন্য সঙ্গী বা আত্মীয়-পরিজন ভাল লাগিত না। গৃহে সাংসারিক আবহাওয়ায় তাঁহার প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত। শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর মূর্তি, তাঁহার অপার্থিব অসীম স্নেহ, তাঁহার অলৌকিক দিব্য ভাবরাশি রাখালের হৃদয় জুড়িয়া থাকিত। রাখালের অন্তরের সকল পিপাসা, সকল ক্ষুধা এবং সকল আকাঙ্ক্ষাই পরিতৃপ্ত হয় শ্রীরামকৃষ্ণের শান্তিময় অভয় ক্রোড়ে ও আশ্রয়ে। সেইভাবেই আবিষ্ট হইয়া তিনি পূর্ব্ববৎ

দক্ষিণেশ্বরে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। পিতার ক্রোধ ও আরক্তচক্ষু বা কঠোর শাসনবাক্য তাঁহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না।

আনন্দমোহন রাখালের ঈদৃশ আচরণে বিশেষ ক্ষুব্ধ ও উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহার আত্মীয়-বান্ধবেরা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন যে রাখাল পড়াশুনায় একেবারে অমনোযোগী—বিদ্যালয়ে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে এবং অভিভাবক বা গুরুজনদিগকে অণুমাত্র সমীহা করে না। ইহার শাসন আবশ্যক। আনন্দমোহন এইসব শুনিয়াও মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"তাই ত, রাখালের একি বিসদৃশ ব্যবহার! আমার আদেশ পালন করা দূরে থাক্—আমার নিষেধ ও শাসনবাক্য সে অনায়াসে উপেক্ষা করিতে সাহসী হয়! একি অস্বাভাবিক ব্যাপার! সদ্যোবিবাহিত যুবক কোথায় শ্বশুর বাড়ীতে গিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিবে, নিজের সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর প্রতি প্রবল আকর্ষণ থাকিবে—ইহাই ত সচরাচর সংসারে ঘটিয়া থাকে। আমার অদৃষ্টে একি জঞ্জাল উপস্থিত হইল? কোনদিকে লক্ষ্য নাই—আমি আসিয়াছি আমাকেও গ্রাহ্য নাই—শুধু দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ে নিরক্ষর একজন পরমহংসের কাছে পড়িয়া থাকে! রাখালের বুদ্ধিশুদ্ধি কি একেবারে লোপ পাইল? যদি এখন ইহার প্রতিরোধ না করা যায় তবে ছেলেটা একেবারে উচ্ছন্ন যাইবে। লেখাপড়া ত শিখিতেই পারিবে না, হয়ত বিবাগী হইয়া অবশেষে সারাজীবন দুঃখকষ্টে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে। এই দুর্ম্মতির দমন একান্ত আবশ্যক।" আবার তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"এদিকে ত দেখিতেছি রাখাল চরিত্রবান শান্ত ও নিরীহ। কথাবার্ত্তায় আদৌ

উদ্ধত বা দুর্ব্বিনীত নয়। পোষাক-পরিচ্ছদে কোনরূপ বিলাসিতা নাই এবং যতদূর সন্ধান করিয়াছি—তাহাতে সে কোন কুসঙ্গে মেলামেশা করে না। 'ধর্ম্ম' 'ধর্ম্ম' করিয়াই তাহার এই সাময়িক উন্মাদনা বা বিভ্রম হইয়াছে। কিছুদিন তাহাকে দক্ষিণেশ্বরে বা অন্য কোথাও যাইতে না দিলেই আবার তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধি ফিরিয়া আসিবে।" তাই আনন্দমোহন স্থির করিলেন যে পুত্রকে কয়েক দিন গৃহে আবদ্ধ রাখিবেন এবং সদুপদেশ দ্বারা তাহার এই দুর্ম্মতির পরিবর্ত্তন করাইবেন। রাখাল দক্ষিণেশ্বর হইতে ফিরিয়া আসিলে আনন্দমোহন কর্কশবাক্যে তাহাকে কঠোর শাসন করিয়া অবিলম্বে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিলেন।

পিতার রুদ্ধকক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা স্মরণ হইলেই রাখাল বিষণ্ণ ও বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিত এবং মনে মনে একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিরুপায়! এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহার স্নেহের গোপালকে না দেখিয়া বৎসহারা গাভীর ন্যায় ব্যাকুল হইলেন। অবশেষে একদিন তিনি অশ্রুপূর্ণনেত্রে ভবতারিণীর মন্দিরে গিয়া কাঁদিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মা, রাখালকে না দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। মা, আমার রাখালকে এনে দাও।" জগন্মাতা আত্মভোলা দুলালের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

একদিন আনন্দমোহন স্বীয় কক্ষে বসিয়া বিষয়সংক্রান্ত মকদ্দমার কাগজপত্র মনোনিবেশ করিয়া দেখিতেছেন, সম্মুখে রাখালকে বন্দীর মত বসাইয়া রাখিয়াছেন। আবদ্ধ রাখাল হঠাৎ পিতার দিকে তাকাইয়া দেখিলেন যে তাঁহার পিতা কাগজপত্র দেখিতে দেখিতে

একেবারে নিবিষ্ট, আর কোন দিকে লক্ষ্য নাই। রাখাল বুঝিলেন যে পলাইবার এই উত্তম সুযোগ। তিনি অতি ধীরে মৃদুপদসঞ্চারে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আনন্দমোহন পুত্রের বহির্গমনের কথা জানিতে পারিলেন না। রাখালও আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া একেবারে দক্ষিণেশ্বরের দিকে ধাবিত হইলেন। তথায় গিয়া রাখাল দেখিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যাকুলভাবে উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। হর্ষ-বিহ্বলচিত্তে মিলিত হইয়া উভয়ের অন্তরের রুদ্ধভাবস্রোত প্রবাহিত হইল।

আনন্দমোহন মকদ্দমায় বিশেষ ব্যস্ত থাকায় অবিলম্বে পুত্রের সন্ধান লইতে পারিলেন না। যে মকদ্দমা লইয়া তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন তাহাতে জয়লাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু দৈবক্রমে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার জয় হইল। তখন তাঁহার খেয়াল হইল যে রাখালকে দক্ষিণেশ্বর হইতে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। তিনি পথে যাইতে যাইতে ভাবিলেন—হয়ত পুত্রের সাধুসঙ্গের ফলে তাঁহার মকদ্দমায় জয়লাভ হইয়াছে। পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলে পিতা কি তাহার ফলভাগী হয় না? রাখালের সৌম্যমধুর মূর্ত্তি পিতৃহৃদয়ে ক্ষণে ক্ষণে উদিত হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন যে, "আহা! রাখাল যে জন্ম হইতেই কত স্নেহে, কত আদর যত্নে ও ভোগবিলাসে বর্দ্ধিত হইয়াছে! সে যে তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর জীবন্ত স্মৃতি। না জানি রাসমণির দেবালয়ে সাধুর নিকটে সে কত কষ্টে পড়িয়া আছে। সেখানে কে তাহার যত্ন করিবে? তাহার ভবিষ্যজ্জীবনের উন্নতির অন্তরায়—তাহার ভাবী সংসারের প্রতিবন্ধক—এই ধর্ম্মোন্মত্ততা! তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া যে প্রকারেই হউক তাহার মনের গতি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।"

দূর হইতে আনন্দমোহনকে দেখিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন যে আগন্তুক রাখালের পিতা। তিনি রাখালকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে রাখাল, ঐ তোর বাপ আসছে বুঝি—দেখ দেখি।" রাখাল সম্মুখে দৃষ্টি-পাত করিয়া দেখিলেন যে সত্যই তাঁহার পিতা এতদিন পরে আসিতে-ছেন। তিনি ভীত ও আতঙ্কিত হইলেন পাছে তাঁহাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে হয়। রাখাল কোথাও লুকাইয়া থাকিতে চাহিলেন। রাখালের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, "ভয় কি ? বাপ মা প্রত্যক্ষ দেবতা। তোর বাপ এলে তুই বেশ ভক্তি করে প্রণাম করবি। মার ইচ্ছা হলে কি না হতে পারে ?" এই কথা বলিতে না বলিতে আনন্দমোহন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও পরম সমাদরে তাঁহাকে নিকটে বসাইলেন। ঠাকুরের নির্দ্দেশমত রাখালও শ্রদ্ধাসহকারে পিতার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। পুত্রের বিনীতভাব দেখিয়া আনন্দমোহনের পিতৃহৃদয় বিগলিত হইল। তিনি পরম স্নেহপূর্ণ নয়নে পুত্রকে দেখিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার নিকট রাখালের অজস্র প্রশংসা করিলেন। আনন্দমোহন মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার কথামৃত পান করিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িলেন এবং রাখালের প্রতি শ্রীরাম-কৃষ্ণের অগাধ স্নেহ ভালবাসা ও আদর যত্ন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এই অদ্ভুত মহাপুরুষের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক পুত্রকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে তাঁহার সাহস হইল না। রাখালের উৎফুল্ল মুখ, প্রীতিপূর্ণ হাসি, এবং বিনয়নম্র ব্যবহার দেখিয়া তিনি বুঝিলেন রাখাল পুত্রাধিক আদর যত্নে এখানে রহিয়াছে। শুধু প্রত্যাগমন কালে আনন্দমোহন শ্রীরাম-কৃষ্ণকে মিনতিপূর্ব্বক প্রার্থনা জানাইলেন যে রাখালকে যেন তাঁহার নিজ

ইচ্ছানুযায়ী বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। বিষয়ী ও সংসারী আনন্দমোহন ভাবিলেন যে এইরূপ অলৌকিক শক্তিশালী সাধুর আশীর্ব্বাদে তাঁহার পুত্রের ও বংশের সম্যক্ কল্যাণ হইবে। বিশেষতঃ তাঁহার ধারণা হইল যে এই মহাপুরুষের কৃপাতেই সম্প্রতি তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে মকদ্দমা জিতিয়াছেন। ঈদৃশ মহাত্মার বিরাগভাজন হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নয়। তিনি নিশ্চিন্তভাবে ও প্রশান্তহৃদয়ে কলিকাতায় একাকী ফিরিয়া আসিলেন। পিতা চলিয়া গেলে রাখাল বিস্ময়-বিহ্বলচিত্তে আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইলেন। রাখালের দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে শ্রীরাম-কৃষ্ণ তাঁহাকে মাঝে মাঝে গৃহে পাঠাইয়া দিতেন। রাখাল সেই সময়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তিনি পিতার ভুক্তাবশেষপাত্রে বা পিতার উচ্ছিষ্ট কি খাইতে পারেন? শ্রীরামকৃষ্ণ অমনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"সে কি রে? তোর কি হয়েছে যে তোর বাবার পাতে খাবিনা? মা-বাপ কি কম জিনিষ! তাঁরা প্রসন্ন না হলে ধর্ম্মটর্ম্ম কিছুই হয় না। চৈতন্যদেব ত প্রেমে উন্মত্ত; তবু সন্ন্যাসের আগে কতদিন ধরে মাকে বোঝান। বল্লেন—মা, আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখা দিব।"

শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে রাখাল মাঝে মাঝে বাড়ীতে গেলে আনন্দ-মোহন তাঁহাকে কৌশলে সংসারে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া রাখাল দিন-রাত্রি দক্ষিণেশ্বরে থাকিবে, ইহা আনন্দমোহনের আদৌ মনঃপূত নহে। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "রাখালের বাপ পাছে এখানে না আসিতে দেয়, সেজন্য কত বলিয়া বুঝাইয়া রাখালকে এক একবার বাড়ীতে পাঠাইতাম। বাপ জমিদার—অগাধ পয়সা, কিন্তু বড় কৃপণ ছিল;

প্রথম প্রথম নানারূপ চেষ্টা করিয়াছিল যাহাতে ছেলে এখানে আর না আসে; পরে যখন দেখিল, এখানে ধনী, বিদ্বান্ লোক সব আসে, তখন আর ছেলের আসায় আপত্তি করিত না। ছেলের জন্য কখন কখন এখানে আসিয়াও উপস্থিত হইয়াছিল। তখন রাখালের জন্য তাহাকে বিশেষ আদর-যত্ন করিয়া সন্তুষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম।"

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে রাখালের শ্বশুরবাড়ী ঠাকুরের ভক্ত পরিবার। মনোমোহন, তাঁহার মাতা, স্ত্রী ও ভগ্নীরা মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন। রাখাল ঠাকুরের নিকট দিনরাত্রি যাপন করিতেন শুনিয়া তাঁহারা কোন আপত্তি করিতেন না। কিন্তু কয়েকদিন পরে মনোমোহনের মাতা রাখালের বালিকা-বধূকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। রাখালকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার কোন গোপন অভিপ্রায় ছিল কিনা তাহা কে বলিবে? কিন্তু সেদিন ঠাকুরের মনে সহসা এক প্রশ্ন উদয় হইল—"বধূর সংস্পর্শে আমার রাখালের ঈশ্বরভক্তির হানি হইবে না ত?" এই সংশয়ের নিরসনকল্পে তিনি সেই বালিকাবধূকে নিজের কাছে আনাইয়া আপাদমস্তক কেশরাশি ও শারীরিক গঠনভঙ্গী তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। ঠাকুর সকল লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, "ভয়ের কোন কারণ নাই—দেবীশক্তি। স্বামীর ধর্ম্মপথের অন্তরায় কখনও হইবে না।" তখন হৃষ্টচিত্তে ঠাকুর নহবতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে বলিয়া পাঠাইলেন, "টাকা দিয়া যেন পুত্রবধূর মুখ দেখে।"

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে রাখালের প্রধান কাজ ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা। তিনি কখনও তাঁহার পদসেবা করিতেন, কখনও স্নানার্থে

তৈলমর্দ্দন করিয়া দিতেন, পরিধেয় বস্ত্রাদি গুছাইয়া রাখিতেন এবং তাঁহার সমাধিমগ্নাবস্থায় সযত্নে তাঁহার দেহ রক্ষা করিতেন। আবার শ্রীরামকৃষ্ণের প্রমত্তভাবে বিচরণকালে তাঁহার অঙ্গধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া দিতেন, "ঐখানে সিঁড়ি" "এইখানে উঁচু" "ঐখানটায় নীচু" এবং ঠাকুরও তাঁহার নির্দ্দেশমত পদক্ষেপ করিয়া গম্যস্থানে চলিয়া যাইতেন। ভাবনিধি ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে যাহাতে কোন আঘাত না লাগে তাহার প্রতি রাখালকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইত। তাঁহার ত্যাগী অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে রাখালই সর্ব্বপ্রথমে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট থাকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রাখালের দক্ষিণেশ্বরে অনুপস্থিত কালে তাঁহার বাল্যবন্ধু বাবুরাম মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের সেবা করিতেন।

রাখাল যখন শ্যামপুকুরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত "মেট্রো-পলিটান" শাখা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন তখন তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন বাবুরাম ঘোষ (বাবুরাম মহারাজ বা স্বামী প্রেমানন্দ)। ইঁহার সহিত সখ্যসূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় লইয়া রাখাল আলাপ-আলোচনা করিতেন। বাবুরামও ইতিপূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শ্রবণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত বলরাম বসু মহাশয় বাবুরামের ভগ্নীপতি। কিন্তু বলরাম বাবুর গৃহে তিনি সর্ব্বপ্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিবার সুযোগ পান নাই। রাখালই তাঁহাকে একদিন বিদ্যালয়ের ছুটীর পর দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যান এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে পুনঃ আসিতে বলিলেন এবং বাবুরামও প্রেমোন্মত্ত সমাধিমগ্ন মহাপুরুষকে দেখিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন। রাখাল বিদ্যালয় ত্যাগ করিলেও বাবুরাম প্রায়ই

শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন এবং রাখাল ও বাবুরামের বন্ধুত্ব এইরূপে দিন দিন গভীর প্রীতির সম্বন্ধে আবদ্ধ হইল। বয়সে কিছু বড় বলিয়া রাখাল তাঁহাকে বাবুরামদাদা বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট রাখালের প্রায়ই আবেদন নিবেদন থাকিত এবং ঠাকুরের সহিত ইহা লইয়া তাঁহার কলহ ও মান অভিমান চলিত। কিন্তু কোন বিষয়ে কোন আচরণে সামান্য ত্রুটি দেখিলে ঠাকুর রাখালকে শাসন ও ভর্ৎসনা করিতেন। এই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া ঠাকুর পরে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিকট বলিয়াছিলেন যে, "অন্যায় করিলে তাহাকে (রাখালকে) শাসনও করিতাম। একদিন কালীঘর হইতে প্রসাদী মাখন আসিলে সে ক্ষুধিত হইয়া আপনি উহা লইয়া খাইয়াছিল। তাহাতে বলিয়াছিলাম 'তুই তো ভারী লোভী, এখানে আসিয়া কোথায় লোভ ত্যাগে যত্ন করিবি, তাহা না হইয়া আপনি মাখন লইয়া খাইলি?' সে ভয়ে জড়সড় হইয়া গিয়াছিল ও আর কখনও ঐরূপ করে নাই।" এইখানেই রাখালের বিশেষত্ব। বালকের মত ভয়ে জড়সড় হওয়া তাঁহার সরল বালস্বভাবের পরিচায়ক। আবার ঠাকুর যাহা একবার নিষেধ করিতেন অথবা কোন কিছু করিতে আদেশ দিতেন রাখাল যত্নের সহিত প্রাণপণে তাহা পালন করিতে চেষ্টা করিতেন। ইহাতে তাঁহার কোন দ্বিধা বা বিচার আসিত না।

বালভাবাপন্ন রাখাল একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন, "ভারি খিদে পেয়েছে"। সে সময়ে ঘরে খাবার ছিল না এবং তখনি পাইবারও উপায় নাই, কারণ কাছে কোনও দোকান ছিল না। ঠাকুর রাখালের ক্ষুধার কথা শুনিয়া গঙ্গার ধারে বাহির হইলেন এবং

উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "গৌরদাসী এস, আমার রাখালের খিদে পেয়েছে।" ক্ষণকাল-মধ্যেই একখানি নৌকা আসিয়া চাঁদনীঘাটে লাগিল। নৌকা হইতে বলরামবাবুসহ কতিপয় ভক্ত ও গৌরদাসী খাবার হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর ইহা দেখিয়া সানন্দে রাখালকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, "আয়, খাবার খাবি আয়, খাবার এসেছে, তুই-না খিদে পেয়েছে বলছিলি"। রাখাল একটু লজ্জিত ও রাগত ভাবে বলিলেন—"আমার খিদে পেয়েছে, আপনি ঢাক পেটাচ্ছেন।" ঠাকুর বলিলেন, "তাতে কি, তোর খিদে পেয়েছে, তোর খাবার চাই, একথা বললে দোষ কি? তুই এখন খা।"

এই সময়ে একদিন রাখাল বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন যে, রাস্তায় একটি পয়সা পড়িয়া রহিয়াছে। মনে মনে তিনি ভাবিলেন যে বাজে কোন লোক উহা পাইলে অপব্যয় করিবে—তাহাপেক্ষা কোন অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুক বা কানা-খোঁড়াকে দান করিলে পয়সার সদ্ব্যবহার হইবে। এই ভাবিয়া তিনি পয়সাটী কুড়াইয়া লইলেন। ঠাকুরের নিকট রাখাল কোন কথা গোপন রাখিতেন না। বালক যেমন তাহার মাতার নিকট সকল কথা বলিয়া আনন্দ পায় রাখালও তেমনি ঠাকুরকে সরলভাবে সব বলিয়া আনন্দলাভ করিলেন। কিন্তু ঠাকুর শুনিয়া রাখালকে ভৎ´সনার সুরে বলিলেন, "যে মাছ খায় না সে মাছের বাজারেই বা যাবে কেন? তোর যখন নিজের কোন দরকার নেই তখন তুই কেন ঐ পয়সা ছুঁতে গেলি?"

একদিন রাখাল আবদার করিয়া ঠাকুরকে স্নানের জ তেল মাখাইতে মাখাইতে আধ্যাত্মিক অনুভূতির কোন উচ্চতর স্তরের উপলব্ধি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুর উহাতে তখন

সম্মত হন নাই। রাখাল বারংবার তাহা চাহিতে লাগিলেন। অবশেষে ঠাকুর কোন মর্ম্মান্তিক কথা বলিয়া তাঁহার হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করিলেন। রাখাল অভিমানে দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া হস্তস্থিত তেলের বাটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া হন্ হন্ করিয়া ফটক পার হইয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! রাখালের পদদ্বয় যেন অকস্মাৎ অবশ হইয়া পড়িল, তিনি যেন আর একপদও অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। নির্ব্বাক-বিস্ময়ে রাখাল সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। সম্পূর্ণ নিরুপায়, কি করিবেন তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে, অপার করুণাসিন্ধু ঠাকুর রাখালকে ডাকিয়া আনিবার জন্য তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে পাঠাইলেন। রাখাল আর কি করিবেন? অগত্যা তিনি ধীরপদে তাঁহার সম্মুখীন হইলে চিরক্ষমাশীল ঠাকুর হাসিতে হাসিতে কৌতুক করিয়া বলিলেন, "কি, গণ্ডী ছাড়িয়ে যেতে পারলি?" রাখাল ঠাকুরের অচিন্তনীয় শক্তি এবং অপার কৃপা ও ক্ষমার কথা স্মরণ করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। নিজের অক্ষমতা ও অপরাধ তিনি অন্তরে উপলব্ধি করিলেন। সেইদিন অপরাহ্ণে শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ (মাষ্টার মহাশয়) আসিয়া দেখিলেন যে ঠাকুর ছোট তক্তাপোষে ভাবাবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। নিকটে রাখাল নীরবে উপবিষ্ট। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি দেখিলেন ঠাকুর যেন মা জগদম্বার সহিত কথা বলিতেছেন, "মা, ওকে এককলা দিলি কেন?" কিছুক্ষণ পরে আবার তিনি বলিলেন, "মা, বুঝেছি এককলাতেই যথেষ্ট হবে, এককলাতেই তোর কাজ হবে, জীবশিক্ষা হবে।" পুনরায় ভাবাবস্থায় তিনি রাখালকে

সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। তাঁহার এইরূপ আচরণ দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন। রাখাল ফিরিয়া আসিলে নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া তীব্র ভৎ´সনা ও অনুযোগের সহিত ব্রাহ্মসমাজের প্রতিজ্ঞাপত্রে তাঁহার স্বাক্ষরের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। রূঢ়ভাষায় তিনি বলিলেন, "ব্রাহ্ম-সমাজের অঙ্গীকারপত্রে সহি করিয়া আবার মন্দিরে গিয়া দেবদেবীর মূর্ত্তিকে প্রণাম করায় তোমার কপট আচরণ করা হইতেছে।" রাখাল নীরবে দাঁড়াইয়া সব শুনিলেন। তিনি কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যস্পর্শে তাঁহার পূর্ব্ব সংস্কার ও সংশয় তিরোহিত হইয়াছে তাহা তিনি কি করিয়া নরেন্দ্রনাথকে বুঝাইবেন? বুদ্ধিমান বিদ্বান ও তেজস্বী নরেন্দ্রনাথকে কি করিয়া বুঝাইবেন যে এখন শুধু পূর্ব্বের মত একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার সগুণ ব্রহ্মে তিনি বিশ্বাসী নহেন,—শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় এখন তিনি অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন যে নিরাকারও যেমন সত্য সাকারও তেমনি সত্য। সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের কে "ইতি" করিবে?

রাখাল কোমল প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথকে খুবই সমীহ করিতেন। এই ঘটনার পর রাখাল নরেন্দ্রনাথের সম্মুখীন হইতে ভীত ও সঙ্কুচিত হইতেন। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি এড়াইল না। একদিন তিনি নরেন্দ্রনাথকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন নরেন্দ্রনাথও আনুপূর্ব্বিক সমুদায় ব্যাপার ঠাকুরকে জানাইলেন তীব্র অনুযোগের সহিত নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিলেন, "কেন সাধারণ সাকারবাদীদের মত রাখাল মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর বিগ্রহকে গড়

হয়ে প্রণাম করবে? কেন এই মিথ্যা আচরণ?" শান্তভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে সস্নেহে বলিলেন, "দ্যাখ, রাখালকে আর কিছু বলিসনি। সে তোকে দেখলেই ভয়ে জড়সড় হয়। তার এখন সাকারে বিশ্বাস হয়েছে তা কি করবে বল? সকলেই কি একেবারে গোড়া থেকে নিরাকারে বিশ্বাস করতে পারে?" স্বাধীনচিত্ত নরেন্দ্রনাথ কাহারও স্বাধীনভাবে মত পরিবর্ত্তনের কথা শুনিলে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানিতেন। ঠাকুরের কথায় তিনি বুঝিলেন, সত্য সত্যই রাখাল এখন সাকারে বিশ্বাসী এবং তাহাকে মিথ্যাচারী সন্দেহে তিরস্কার করা তাঁহার সমুচিত কার্য্য হয় নাই। অতঃপর রাখালকে দেখিলে তিনি আর কোন অনুযোগ বা দোষারোপ করিতেন না। দুই বন্ধু আবার সহজ প্রীতির-বন্ধনে মিলিত হইলেন।

দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রনাথ ও রাখালের পরস্পর দুইজনের সাক্ষাৎ হইলে মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা চলিত। নরেন্দ্রনাথ স্বভাবতঃ বিনা যুক্তিবিচারে বা বিশেষ পরীক্ষায় কোন বিষয় গ্রহণ করিতে পারিতেন না। স্বাধীন ও তীক্ষ্ণ বিচারশীল মনে কোন নূতন ভাব দেখিলেই বা কোন নূতন তত্ত্ব শুনিলে তাঁহার মতের সহজে পরিবর্ত্তন হইত না। তিনি যতক্ষণ তাহা বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত না হইতেন এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কোন ভাবকে নিজের বোধের সীমায় না আনিতে পারিতেন ততক্ষণ কোন তত্ত্ব বা ভাবকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। এমন কি ঠাকুরকে বারম্বার দর্শন করিয়াও প্রথম প্রথম তাঁহার মন তাঁহার সব মত, সিদ্ধান্ত ও ভাবে সায় দিতে পারে নাই। ঠাকুর বলিতেন,

"রাখালের সাকারের ঘর, নরেন্দ্রনাথের নিরাকারের।" তাই ঠাকুরের অপূর্ব্ব ভাবোন্মত্ততা, প্রবল প্রেমানুরাগে নানা অলৌকিক দর্শনাদি ও ভাবের আস্বাদন রাখালের হৃদয় স্পর্শ করিত। কিন্তু নরেন্দ্র যুক্তি সহায়ে উহাকে ভাব-বিলাসিতার অঙ্গ এবং হৃদয়াবেগের স্তর মাত্র বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। শান্তস্বভাব রাখাল তেজস্বী বিদ্বান নরেন্দ্রনাথের নিকট কোন প্রতিবাদ বা তর্ক করিতে সাহসী হইতেন না। অনেক স্থলে রাখালের কোমল ও সরল মনে তাঁহার সতেজ যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত বা মতগুলির প্রভাব রাখিয়া যাইত। নরেন্দ্রনাথের কথায় রাখালের মনে সংশয়ের উদয় হইল। তিনিও প্রেমোন্মত্ততা এবং ভাবের আবেশ বা প্রকাশকে ভাব-বিলাসিতাই বলিয়া বোধ করিবার প্রয়াস পাইতেন।

এই সময়ে একদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাব দেখিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন। কীর্ত্তনে বৈষ্ণব মহাজনদের রচিত পদাবলী শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবের উত্তাপে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে গায়ের জামা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, মহাভাবে ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিলেন, এবং রাধাভাবে ভাবিত হইয়া তিনি করুণকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "প্রাণনাথ-হৃদয়বল্লভ কৃষ্ণকে তোরা এনে দে, সুহৃদের কাজ তো বটে, হয় এনে দে না হয় আমায় নিয়ে চল—তোদের চিরদাসী হব।" ঠাকুরের এই মহাভাবের অবস্থা রাখাল অনিমিষ লোচনে ও একাগ্রমনে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন। ঠাকুরের সেই বিরহভাবে উদ্দীপ্ত গদগদ কণ্ঠস্বর এবং সেই অশ্রুকম্প সাত্ত্বিকাদি ভাবের স্ফুরণ দেখিয়া রাখালের মন প্রেমে বিগলিত হইল। রাখাল অন্তরে অন্তরে বুঝিলেন—ইহা নরেন্দ্র-কথিত ভাব-বিলাসিতা নয় কিম্বা

মানসিক বা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হইতে ইহার উৎপত্তি নয়—ইহা গভীর প্রেমের বহিঃপ্রকাশ।

দেখিতে দেখিতে এমনি ভাবে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল। রাখাল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে বাস করিতেছেন। শ্বশুরবাড়ী হইতে রাখালের মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ আসিত কিন্তু তিনি উহা রক্ষা করা দূরে থাক আদৌ তাহা কানে তুলিতেন না। শ্রীযুত মনোমোহন ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিতেন কিন্তু রাখাল তাঁহার সহিত কোন আত্মীয়তা বা ঘনিষ্ঠতা দেখাইতে উদাসীন থাকিতেন। পরিণীতা স্ত্রীরও তিনি কোন খোঁজ খবর রাখিতেন না। রাখালের ঈদৃশ আচরণে তাঁহার শাশুড়ী শ্যামা-সুন্দরীর নিকট তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা প্রায়ই আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "তোমার জামাই কি শেষে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে? তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনবার তো তুমি কোনই চেষ্টা করছ না! মেয়ের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ।" তাহাতে তিনি উত্তর দিতেন, "কি আর করব বল? জামাই সাধু হবে—সে তো ভাগ্যের কথা!" শ্যামাসুন্দরী পরমা ভক্তিমতী হইলেও নানা ভাবের আলাপ-আলোচনা শুনিয়া সহসা তাঁহার মনের পরিবর্ত্তন হইল। তিনি জামাতাকে সংসারে ফিরাইয়া আনিবার জন্য একদিন যৌবনোন্মুখী কন্যাকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-গত-প্রাণ রাখাল যে আকর্ষণে তন্ময় ও আত্মহারা, যে আকর্ষণে তিনি জগতের অপর কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে অক্ষম, যে আকর্ষণে তিনি দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে অনিচ্ছুক, সে আকর্ষণের নিকট শ্যামাসুন্দরীর সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখেই তাঁহারা কোন্নগরে তাঁহাদের সঙ্গে রাখালকে যাইতে বারংবার অনুরোধ করিলেও রাখাল তাহা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এই দিনের ঘটনা উল্লেখ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ পরে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিকট বলিয়াছিলেন, "রাখাল এখন ঘরের ছেলের মত আছে, জানি আর ও আসক্ত হবে না, বলে 'সব আলুনি লাগে।' ওর পরিবার এখানে এসেছিল, বয়স চৌদ্দ বৎসর। এখান হয়ে কোন্নগরে গেল, তারা ওকে কোন্নগরে যেতে বল্লে—ও গেল না। বলে, 'আমোদ আহ্লাদ ভাল লাগে না'।"

রাখালের এই অনাসক্ত ভাব সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ সূক্ষ্মদৃষ্টি-সহায়ে জানিতে পারিলেন যে রাখালের ভোগের একটু বাকী আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিকট পরে বলিয়াছেন, "সে যে আমার উপর সব নির্ভর করেছিল বাড়ী ঘর সব ছেড়ে। তার পরিবারের কাছে—তাকে আমিই পাঠিয়ে দিতাম—একটু ভোগ বাকী ছিল।" চরম অনুভূতি লাভ করিতে হইলে ভোগের সম্পূর্ণ ক্ষয় হওয়া প্রয়োজন। তাই ঠাকুর রাখালকে মাঝে মাঝে তাঁহার স্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দিতেন। রাখাল ইহাতে আপত্তি করিলেও ঠাকুরের আদেশে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে গৃহে যাইতে হইত। কিন্তু তাঁহাকে বাড়ীতে পাঠাইয়া হৃতশাবক বিহঙ্গের ন্যায় তিনি ছটফট করিতেন। রাখালও গৃহে যাইয়া তিষ্ঠিতে পারিতেন না। যত শীঘ্র সম্ভব দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিতেন। ঠাকুর তাঁহাকে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া জানিতেন রাখাল গৃহে গিয়া তাঁহার স্ত্রীর সহিত কিরূপ ব্যবহারাদি করিতেন।

রাখাল গৃহে যাইতে প্রথম প্রথম বিশেষ আপত্তি জানাইলেও পরে ঐ বিষয়ে আর কোনরূপ দ্বিরুক্তি করিতেন না। ক্রমে ক্রমে তিনি গৃহে গিয়া দুই চারি দিন থাকিয়া যাইতেন। এইরূপ ভাবে একাদিক্রমে কয়েক দিন গৃহে বাস করায় তাঁহার পিতা ও আত্মীয়-স্বজনেরা আশান্বিত হইয়া রাখালকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া সংসারে আবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইলেন। রাখাল লোকপরম্পরায় তাহা শুনিতে পাইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে সমুদায় নিবেদন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শুনিয়া বলিলেন, "ঈশ্বরের জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছিস্ একথা বরং শুনব, তবু কারুর দাসত্ব করিস, চাকরি করিস এ কথা যেন না শুনি।" গৃহে ফিরিয়া গেলে যখন রাখালের নিকট সত্যসত্যই চাকরি গ্রহণ করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইল তখন তিনি সতেজে বলিয়া উঠিলেন, "হাজার টাকা মাইনে দিলেও কখন চাকরি করব না।" তাঁহার এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-ভাব দেখিয়া তাঁহার পিতা ও আত্মীয়-স্বজনেরা এবিষয়ে আর অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। তাঁহাদের আশঙ্কা হইল যে বেশী পীড়াপীড়ি করিলে রাখাল একেবারে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।

রাখাল গৃহে যাতায়াত করিতে করিতে বিশ্বেশ্বরীর সহিত সহজ ভাবেই মেলামেশা করিতে লাগিলেন। বালকের যেমন স্বভাবতঃ কোন বিষয়ে আঁট বা আসক্তি থাকে না কিন্তু নিকটে যাহা পায় তাহা লইয়াই তাহার একটা ক্ষণিক আকর্ষণ বা আনন্দ, তেমনি এক্ষেত্রে রাখালেরও তাহাই ঘটিল। গৃহে একাদিক্রমে অবস্থিতি ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতে লাগিল।

তখন সুযোগ বুঝিয়া আত্মীয়-স্বজন ও সমবয়স্ক পরিচিত বন্ধু-বান্ধবেরা প্রায়ই তাঁহাকে বলিত—"তুমি নিজে যা ইচ্ছে তা করতে পার কিন্তু স্ত্রীর প্রতি ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ একটা দায়িত্ব আর কর্ত্তব্য আছে তা অস্বীকার করতে পার না।" এই সব কথা রাখাল ঠাকুরকে জানাইয়া সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমার পরিবারের কি হবে?" রাখালের কথা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ নিরুত্তর রহিলেন। রাখাল গৃহে ফিরিয়া ঠাকুরের এই মৌনভাব লইয়া মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, "কৈ, তিনি ত আজ আমার কথায় কোন জবাব দিলেন না! কেন তাঁর এই নীরবতা? তিনি যে আমার একান্ত আশ্রয় ও গতি। তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে আমি চলেছি। এই যে কঠিন সমস্যা, তার তো কোনই সমাধান করলেন না! এখন উপায় কি?" গভীরভাবে বিষণ্ণহৃদয়ে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দুই একদিন কাটিয়া গেলে রাখাল দেখিতে পাইলেন সহসা তাঁহার সম্মুখ হইতে একটী যবনিকা অপসারিত হইয়া যাইতেছে। তিনি মহামায়ার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমোজ্জ্বল মধুর মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়পটে স্পষ্টতররূপে জাগিয়া উঠিল। তিনি প্রাণে এক তীব্র আকর্ষণ অনুভব করিলেন। তিল মাত্র বিলম্ব না করিয়া রাখাল দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া গেলেন। ঠাকুর তাঁহার প্রিয়তম মানসপুত্রকে দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং বুঝিলেন যে রাখালের বাকী 'একটু ভোগ' শেষ হইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দিব্যসঙ্গ

অলৌকিক দিব্যভাবাপন্ন শ্রীরামকৃষ্ণের সন্নিধানে শুদ্ধচিত্ত বালস্বভাব রাখাল স্বাভাবিক ভাবেই আনন্দে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেন। এই হাসিখেলার ভিতরেই আনন্দময় পুরুষের সংস্পর্শে রাখালের আন্তর চরিত্রটী ধীরে ধীরে বিকসিত হইতেছিল। অঙ্কুর উদ্গত হইলে চারিদিকে বেড়া দিয়া তাহা যেমন রক্ষা করা হইয়া থাকে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার এই মানসপুত্রটীকে তেমন ভাবেই পালন করিতেন। তাঁহার স্বভাবের সহজ গতি যাহাতে কোনরূপ ক্ষুণ্ণ বা ব্যতিক্রম না হয় কিম্বা তাহা বিপথে না যায় তিনি সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। এই আত্মভোলা অলৌকিক মহাপুরুষের চালচলন, আচার ব্যবহার ও দৃষ্টিভঙ্গী সবই অদ্ভুত ছিল। যিনি সর্ব্বদা ভাবমুখে অবস্থিত থাকিয়া প্রায়ই বাহ্য সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিতেন, পরিধেয় বস্ত্র যাঁহার অঙ্গ হইতে নিয়ত স্খলিত হইয়া পড়িত, যিনি কখন সাম্বর কখন বা দিগম্বর, তিনি আবার প্রত্যেক বিষয়ের খুঁটিনাটির প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। গৃহ, দ্বার, অশন, বসন, শয্যা, আস্তরণ গৃহদ্রব্য ও আসবাব সমুদয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি থাকিত। এই দিব্যপুরুষের সঙ্গে সতত বাস ও তাঁহার সেবা করিয়া রাখালের চরিত্রেও ইহা পরিস্ফুট হইয়াছিল। উত্তরকালে তিনি উচ্চ ভাব-

ভূমিতে বিচরণ করিয়াও প্রত্যেক বিষয়ের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন।

জগতে দিব্যভাবের লোক অতি দুর্লভ। যখন কোন অবতার বা অবতারকল্প মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের মধ্যেও দুই চারিজন মাত্র দিব্যভাবাপন্ন নিত্যসিদ্ধ পুরুষের আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের দ্বারাই নবযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাই ঈশ্বরকোটী নিত্যসিদ্ধের অতীন্দ্রিয় ভাব ও অনুভূতি সাধনসাধ্য নহে—ইহা তাঁহাদের স্বাভাবিক প্রকৃতিগত। পদ্ম-কোরক প্রস্ফুটিত হইলে যেমন দলে দলে বিকসিত হইয়া সৌরভে দিক আমোদিত করে, তেমনি নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষদের জীবন স্তরে স্তরে উন্মেষিত হইয়া প্রদীপ্ত দিব্যমহিমায় দশদিক আলোকিত করিয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যস্পর্শে হাসি, খেলা ও সেবা আদরের ভিতর দিয়া রাখালের অন্তর অতীন্দ্রিয় অলৌকিক ভাবদ্যুতিতে দীপ্তিময় হইয়া উঠিত।

সমগ্র জীবন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে উচ্চ ভাবভূমিতে আরোহণ করিবার কেহ অধিকারী হয় না। আধিকারিক পুরুষেরা সকলেই সত্যসংকল্প, সত্যনিষ্ঠ এবং সত্যের প্রতীক। শ্রুতিতে আছে "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম," সত্যই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মস্বরূপ যাঁহারা সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকেন তাঁহাদের বাক্য আচরণ ও চিন্তা সব সত্যময়। ঠাকুর তাই বলিতেন, "সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট করে ধ'রে থাকলে ভগবান লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়।" ঠাকুর যখন চরম অনুভূতির পর জ্ঞান, অজ্ঞান, শুচি, অশুচি, পাপ, পুণ্য, ভাল

ও মন্দ মার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সব সমর্পণ করিয়াছিলেন তখন সত্যকে দিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেন, "সব মাকে দিতে পারলুম, 'সত্য' মাকে দিতে পারলুম না।" এই সত্যনিষ্ঠা যাহাতে রাখালের হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে এবং প্রতিদিনের আচরণে তাহা হইতে তিনি বিচ্যুত না হন তৎপ্রতি ঠাকুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ণ। এই সত্যনিষ্ঠার সাধনা কি ভাবে করিতে হয় তাহাও তিনি তাঁহার মানসপুত্র রাখালকে উপলক্ষ করিয়া জগতে দেখাইয়া গিয়াছেন।

একদিন রাখালকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "তোর মুখে কেমন একটা মলিনতার ছায়া দেখছি। তোর দিকে আমি তাকাতে পারছি না কেন? তুই কি কোন অন্যায় কাজ করেছিস্?" রাখাল তাঁহার এই নিদারুণ বাণী শুনিয়া বিস্মিত হইলেন ও চিন্তা করিতে লাগিলেন। বড় বড় অন্যায় কার্য্যের কথা দূরে থাকুক, ছোটখাট ঐরূপ কোন কাজ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে কিছুই উদিত হইল না। তিনি নিরুত্তরে ঠাকুরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঠাকুর আবার গম্ভীর-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনে করে দ্যাখ কি অন্যায় কাজ করেছিস?" রাখাল ধীরে ধীরে বলিলেন, 'কৈ, কিছু ত মনে পড়ছে না।' ঠাকুর অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রাখালের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন মিছে কথা বলেছিস কিনা মনে করে দ্যাখ দেখি।" তখন রাখালের সহসা স্মৃতিপথে উদিত হইল যে, তাঁহার দুইজন বন্ধুর সঙ্গে হাস্যপরিহাসচ্ছলে তিনি দুই একটী মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন। রাখাল ঠাকুরকে তাহা আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন। তিনি রাখালকে সাবধান করিয়া বলিলেন, "অমন কাজ আর করিস নি।

কলিযুগে এই সত্যনিষ্ঠাই শ্রেষ্ঠ তপস্যা।" উত্তরকালে রাখাল তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত অনেক শিষ্য ও ভক্তের নিকট এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "যে মিছে কথা বলে বা মিথ্যাচার করে—তার জপ তপ সব বৃথা। সত্যের প্রতি ঠাকুর আমাদের হৃদয়ে এরূপ ধারণা করে দিয়েছেন যে আমরা বুঝেছি অন্য অপরাধের বরং ক্ষমা আছে কিন্তু মিথ্যাবাদীর ও মিথ্যাচারীর অপরাধের কিছুতেই নিষ্কৃতি নেই।"

রাখাল কোন কোন দিন ঠাকুরের নিকটে বসিয়া আপন মনে গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। একদিন তিনি Smile's Self-help পড়িতেছেন—Lord Erskineএর বিষয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-লেখক শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ ও অপরাপর ভক্তেরা তথায় বসিয়াছিলেন। মহেন্দ্রনাথকে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাখাল যে বই পড়ছে—তাতে কি বলছে?" মহেন্দ্রনাথ তদুত্তরে বলিলেন, "সাহেব ফলাকাঙ্ক্ষা না করে—কর্ত্তব্যকর্ম্ম করতে বলছেন। নিষ্কামকর্ম্ম!" ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "তবে তো বেশ! কিন্তু পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ, একখানা পুস্তকও সঙ্গে থাকবে না। যেমন শুকদেব। তাঁর সব মুখে। বইয়ে, শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশেল আছে। সাধু চিনিটুকু লয়ে বালি ত্যাগ করে, সাধু সার গ্রহণ করে।" গ্রন্থপাঠের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু এবং সাধুজীবনে তাহার কতটুকু উপযোগিতা তাহা উপদেশ ছলে ঠাকুর রাখালকে বুঝাইয়া দিলেন।

ব্রহ্মবিদ্যা ব্যতীত বিষয়ান্তরে রাখালের মন ধাবিত না হয় ঠাকুর তাহা লক্ষ্য রাখিতেন। শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথের অনুরোধে রাখাল একদিন ঠাকুরের ভক্ত সঙ্গে কথাবার্ত্তাকালে গোপনে কাগজ পেন্সিল লইয়া

চাহা টুকিতেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ উহা দেখিতে পাইয়া রাখালকে লেন, "ওকি করছিস্? মাষ্টার বুঝি বলেছে? তোর ও কাজ নয়।" রাখাল আর সে বিষয়ে যত্ন করিলেন না।

নিরভিমান ও অদোষদর্শী না হইলে দিব্যভাবের বিকাশ হয় না। ঠাকুরের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে রাখাল মর্ম্মে মর্ম্মে ইহা অনুভব করিয়াছিলেন। একবার নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে ঠাকুর ভক্তগণসহ আমন্ত্রিত হন। স্তোত্রপাঠ ও উপাসনাদি সাঙ্গ হইলে গৃহস্বামীরা পদস্থ ব্যক্তিদের ও পরিচিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-বন্ধুদের আদর-আপ্যায়ন ও আহারাদি লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, ঠাকুরের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল না। ঠাকুর সঙ্গী ভক্ত-দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কৈরে, কেউ ডাকে না যে রে!" গৃহস্বামীদের এই উদাসীনতা ও অযত্ন দেখিয়া রাখাল মনে মনে পূর্ব্ব হইতেই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইতেছিলেন। ঠাকুরের এই কথা যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত হইল। তিনি সক্রোধে তাঁহাকে বলিলেন, "মহাশয়, চলে আসুন।" ঠাকুর রাখালের অভিমান লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আরে রোস, গাড়ী ভাড়া তিন টাকা দুই আনা কে দেবে? রোক করলেই হয় না। পয়সা নেই আবার ফাঁকা রোক! আর এত রাত্রে খাই কোথা?" রাখাল নীরবে বসিয়া থাকিলেন। পদস্থ-ব্যক্তিদের ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বিদায় দিয়া গৃহস্বামীরা সমাগত নিমন্ত্রিতদের একসঙ্গে জলযোগে বসিবার জন্য আহ্বান করিলেন। নিমন্ত্রিতেরা পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত আসন অধিকৃত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ঠাকুর রাখাল প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া দেখিলেন বসিবার স্থান নাই। অতি কষ্টে একটী অপরিষ্কৃত স্থানে ঠাকুরকে একধারে বসান হইল।

ঠাকুর তথায় কোনপ্রকারে নুন টাক্না দিয়া লুচি খাইলেন, তরকারি প্রভৃতি স্পর্শ করিলেন না। লোককল্যাণকামী ঠাকুরের অদ্ভুত নিরভিমানিতা, অদোষদর্শিতা, উদারতা, ক্ষমা ও করুণা রাখালের চিত্তে স্থায়ী ও গভীর রেখাপাত করিয়া দিল।

এই প্রসঙ্গে ঠাকুর রাখালকে পরে বুঝাইয়াছিলেন যে, "গৃহস্থেরা অনেক সময়ে অজ্ঞানবশতঃ সাধুর সঙ্গে ঠিক মত ব্যবহার করতে জানে না। সাধু তাদের দোষ না দেখে কেবল কল্যাণই কামনা করবে। কিছু না খেয়ে এলে গৃহস্থের অমঙ্গল হবে। সাধুর তা করতে নেই—অন্ততঃ এক গ্লাস জল চেয়ে নিয়ে পান করতে হয়।"

দক্ষিণেশ্বরের আবেষ্টনের মধ্যে একটী জমাটবাঁধা আধ্যাত্মিকতা সর্ব্বদা বিরাজ করিত। সকলেই যেন ধ্যানপরায়ণ, মহাপুরুষের মহাশক্তিপ্রভাবে সকলের মন ঊর্দ্ধমুখী হইয়া থাকিত। লাটু ও হরিশ এখানে দিন রাত থাকিয়া সাধনভজন করিতে লাগিলেন। কোনও কোনও গৃহী ভক্ত দুই চারি দিন দক্ষিণেশ্বরে বাস করিয়া ব্যাকুলভাবে নির্জ্জনে সাধন করিতেন। ইঁহারা কেহই একসঙ্গে বসিয়া সমবেতভাবে সাধনভজন করিতেন না। সকলেই ঠাকুরের নির্দ্দেশমত পৃথকভাবে স্বতন্ত্র স্থানে একাকী গোপনে সাধনায় নিরত থাকিতেন। কেহ পঞ্চবটীমূলে, কেহ বিল্বতলায়, কেহ গঙ্গাতীরে, কেহ নাটমন্দিরের কোণে বসিয়া জপ ধ্যান করিতেন ইঁহারা জপধ্যানে এত তন্ময় হইতেন যে বিষ্ণুঘরের পূজারী সেবক শ্রীযুত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইঁহাদের খুঁজিয়া ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইতেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন ভক্তদের নিকট বলিয়া-

ছিলেন যে, "রাম আছে, তাই আমাদের অত ভাবতে হয় না। হরিশ লাটু এদের ডেকে ডেকে খাওয়ায়। ওরা হয়তো একলা কোথায় ধ্যান করছে—সেখান থেকে ডেকে ডেকে আনে।" রাখাল কিন্তু এই দলের মধ্যে ছিলেন না। তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা। যখন এই সব সাধক অন্তরঙ্গ ভক্তেরা তাঁহাদের অলৌকিক দর্শন বা আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা ঠাকুরকে জানাইতেন তখন প্রায়ই রাখাল সেখানে উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে তিনি সরলভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিতেন, "কৈ, আমার তো ওদের মত কোন দর্শনাদি হয় না?" ঠাকুর বলিতেন, "একটু ধ্যান জপ নিয়মমত করলে ঐ রকম দর্শন হয়।"

তাঁহার কথায় রাখাল সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঠাকুরের নির্দ্দেশে নির্জ্জনে আসনে বসিয়া তিনি ধ্যান জপ করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম ইহাতে কোনও সরসতা বোধ না করিয়া বরং তিনি মরুভূমির মত হৃদয়ে একটা শুষ্কতা অনুভব করিতেন। এই নীরসতাকে দূর করিবার জন্য রাখাল তখন ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল প্রভৃতির সহিত কখন কখন কৌতুক ও রঙ্গরসিকতা করিতেন। হাজরা ইহাতে লোকের নিকট বলিয়া বেড়াইতেন, "রাখাল টাখাল যা সব দেখছো—ওরা জপতপ করতে পারে না—হো হো করে বেড়ায়।" ঠাকুর ইহা শুনিয়া হাজরাকে বলিয়াছিলেন, "আমি জানি যে যদি কেউ পর্ব্বতের গুহায় বাস করে, গায় ছাই মাখে, নানা কঠোর করে কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিষয়ে মন—সে ধিক্। আর যার কামিনী-কাঞ্চনে মন নেই, খায় দায় বেড়ায়, তাকে বলি ধন্য।" ঠাকুর তাহাকে

এই কথা বলিলেন বটে কিন্তু পরে রাখালকে একদিন নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "কিরে তুই যে আর নিয়মমত জপ ধ্যান করতে বসিস না? কেনরে, তোর কি হল?" রাখাল তদুত্তরে বলিলেন, "সকল সময় প্রাণে ভাবের উদ্দীপনা হয় না। কেমন যেন মনটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। তাই নিয়মমত বসি না।" ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "সে কিরে? খুব রোক চাই—তবে সাধনা হয়। ঠিক নিয়মমত তাই বসতে হয়। রোক চাই। যারা খানদানী চাষা তারা ফসল হয়না বলে কি চাষ ছেড়ে দেবে? ছিঃ! অমন করে বেড়াস নি। ঠিক ঠিক নিয়মমত বসবি।"

ঠাকুর প্রত্যহ যেমন শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দির দর্শন করিতে যান সেদিনও তেমনি গেলেন। রাখালও পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়া দেখিলেন যে ঠাকুর গর্ভমন্দিরে মার সম্মুখে বসিলেন। রাখাল ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস না পাইয়া সম্মুখের নাটমন্দিরে জপ করিতে বসিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ জপ করিতে করিতে দেখিলেন যে সহসা গর্ভমন্দিরটী এক অপরূপ আলোকে উদ্ভাসিত হইল। ক্রমশঃ আলোকের তেজ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই তীব্র স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ যেন সমুদিত শতসূর্য্যের রশ্মির মত উজ্জ্বল ও প্রখর হইল—ক্রমে ক্রমে উহা মন্দিরদ্বারের বাহিরে আসিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। রাখাল ভীত ও সন্ত্রস্তভাবে তৎক্ষণাৎ আসন ত্যাগ করিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে ঠাকুরের ঘরে চলিয়া আসিলেন এবং বিস্ময়চিত্তে নীরবে বসিয়া থাকিলেন। পরে ঠাকুর তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে রাখাল স্তব্ধভাবে চুপটী করিয়া বসিয়া আছেন। তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা

করিলেন, "কিরে, তুই এখানে চুপমেরে বসে আছিস। আজ জপ করতে বসেছিলি তো?" রাখাল তখন আনুপূর্ব্বিক বিবরণ ঠাকুরের নিকট নিবেদন করিলেন। গম্ভীরভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ সব শুনিয়া বলিলেন, "তুই না বলিস তোর দর্শন টর্শন কিছু হয় না? আবার কিছু দেখলেও ভয়ে ভয়ে পালিয়ে আসবি। তা হলে কি করবি বল?" রাখাল তখন নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন।

রাখাল শ্রীশ্রীভবতারিণীর নাট মন্দিরে গভীর ধ্যানে একদিন তন্ময় হইয়া বসিয়া আছেন এমন সময়ে ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর তথায় উপনীত হইলেন। তিনি রাখালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এই নে তোর মন্ত্র—আর ঐ দেখ তোর ইষ্ট।" এই বলিয়া ঠাকুর তাঁহাকে তাঁহার ইষ্ট মন্ত্র বলিয়া দিলেন এবং অঙ্গুলী সঙ্কেতে তাঁহার ইষ্ট মূর্ত্তিকে নির্দ্দেশ করিলেন। রাখাল অপ্রত্যাশিতভাবে সহসা এই কৃপা পাইয়া আনন্দোৎফুল্ললোচনে সঙ্কেত স্থানে তাকাইয়া দেখিলেন তাঁহার ইষ্ট মূর্ত্তি দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া সহাস্যবদনে জীবন্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। রাখাল নির্ব্বাক ও স্তব্ধ হইয়া অনিমেষ লোচনে তাঁহার ইষ্ট মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি বিহ্বল চিত্তে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। রাখালের মনে তখন দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাকটাক্ষে মূককে বাচাল করে, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, জীবের ইষ্ট দর্শন ও চরম অনুভূতি অনায়াসলভ্য হয়। তাঁহার মনে হইল যে, এই অলৌকিক দিব্য শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ পরম করুণাপরবশ হইয়া তাঁহার দিব্যচক্ষু উন্মীলন করিতেই তথায় আসিয়াছেন। রাখাল অমনি ভক্তি গদগদ চিত্তে তাঁহার শ্রীচরণকমলে দণ্ডের মত নিপতিত

হইলেন। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে তাঁহার ঘরের অভিমুখে চলিয়া গেলেন। রাখাল পরমানন্দে তাঁহার ইষ্ট ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন।

আর একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীভবতারিণীর নাটমন্দিরে রাখাল আসনে বসিয়া জপধ্যান করিতেছেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চিত্ত স্থির হইতেছে না। বারংবার চেষ্টা করিয়াও তিনি বিফল হইলেন। রাখাল ভাবিলেন—"একি রহস্য! এই দেবস্থান, ঠাকুরের ন্যায় মহাপুরুষের পুণ্য সঙ্গে রয়েছি, তাঁহার কথা দিনরাত শুনছি,—তাঁহার অপার ও অগাধ করুণা আর ভালবাসা পাচ্ছি অথচ একি দুর্দৈব!" তখন নিজেকে শত ধিক্কার দিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলিতে লাগিলেন, "মা, আমি কি অপদার্থ! এই মহাপুরুষের শ্রীমুখে শুনেছি মলয়ের হাওয়ায় যে সব বৃক্ষের সার আছে তা চন্দনবৃক্ষে পরিণত হয়। পাঁকাটির মত অসার পদার্থে লাগলে কিছু হয় না। এই চেতন পুরুষের কৃপাই মলয়ের হাওয়া, স্পর্শে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু আমি অসার—ভিতরে কোনই সার নেই, তাই তাঁর এত প্রেম ও কৃপা লাভ ক'রেও কিছু হল না?" ভাবিতে ভাবিতে রাখালের মনে আগুনের হল্‌কা বহিয়া গেল—যন্ত্রণায় তিনি অমনি আসন ত্যাগ করিয়া বিষণ্নমুখে উঠিয়া পড়িলেন। ঠিক সেই সময়ে শ্রীশ্রীভব-তারিণীকে দর্শন করিতে ঠাকুর তথায় আসিয়াছিলেন। যখন তিনি নাটমন্দিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন তখন রাখালকে আসন ত্যাগ করিতে দেখিয়াই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে, তুই এর মধ্যেই উঠে পড়্‌লি? কি হ'য়েছে, তোর মুখ এত মলিন কেন?" রাখাল সরলচিত্তে অকপটভাবে সব খুলিয়া বলিলেন

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ চিন্তিতভাবে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। পরে তাঁহাকে বলিলেন, "হাঁ কর্।" রাখাল "হাঁ" করিতেই ঠাকুর বিড়্ বিড়্ করিতে করিতে রাখালের জিভ টানিয়া তিনটা রেখা টানিয়া দিলেন। রাখালের সব দুশ্চিন্তা যেন কোথায় উড়িয়া গেল, প্রাণে বিমল শান্তির নির্ঝর বহিল। তখন ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যা, এখন বস্‌গে যা।"

শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে রাখাল কিছুদিন পঞ্চবটীতলে বসিয়া সাধনভজন করিতেন। একদিন রাখাল কিছুতেই মনকে ঊর্দ্ধমুখী করিতে পারিলেন না। বিফল মনোরথ হইয়া হতাশ ও ব্যাকুলভাবে রাখাল ঠাকুরকে জানাইবার উদ্দেশে তাঁহার নিকট গমন করিতে অগ্রসর হইলেন। ঠিক সেই সময় অন্তর্যামী ঠাকুর রাখালের মানসিক বিকার বুঝিতে পারিয়া পঞ্চবটীর দিকে যাইতেছিলেন। মধ্যপথে তাঁহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া ঠাকুর হাত তুলিয়া অভয় দিলেন। পরে নিকটে আসিয়া তিনি বলিলেন, "ওরে আমি দেখতে পাচ্ছি একটা বিঘ্ন এসে তোর মনকে অশান্ত করে তুলেছে।" এই বলিয়া রাখালের মাথায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিলেন। স্পর্শমাত্র রাখালের চিত্ত শান্ত, শুদ্ধ ও সুনির্ম্মল হইল।

দিব্য অনুভূতি লাভের সহায়তার জন্য রাখলকে নানা ভাবের ও নানা সম্প্রদায়ের সাধনভজনের প্রণালী ঠাকুর শিক্ষা দিয়াছিলেন। একদিন শ্রীশ্রীভবতারিণীর সম্মুখে রাখালের কপালে কারণের ফোঁটা দিয়া ঠাকুর তাঁহাকে শাক্ত দীক্ষায় অভিষিক্ত করেন এবং চক্রে চক্রে কিরূপে ধ্যান করিতে হয় তাহাও বলিয়া দেন। যোগ-

মার্গের কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট আসন, মুদ্রা ও ধ্যান-ধারণাদি সম্বন্ধে ঠাকুর তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু রাখালের সাধনভজন চলিত খুব গোপনে। যাহারা সর্ব্বদা নিকটে থাকিত তাহারাও সহজে বুঝিতে পারিত না যে তিনি কি করিতেছেন। তবে সাধনার দীপ্ত মাধুর্য্য ছড়াইয়া পড়িত তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে, তাঁহার মধুর আকৃতিতে ও কণ্ঠস্বরে।

একদিন দোলপূর্ণিমায় বলরামগৃহে শ্রীযুত রাম, মনোমোহন, নৃত্যগোপাল প্রভৃতি ভক্তেরা ভাবোন্মত্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতেছেন, ঠাকুরও, মধুর নৃত্য করিতেছেন। গগনভেদী হরিনাম সংকীর্ত্তন চলিতেছে। সেই সংকীর্ত্তনে রাখাল ভাবাবিষ্ট হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলেন যে তাঁহার আদরের রাখাল ভাবাবিষ্ট হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে। অমনি তিনি রাখালের বুকে শ্রীহস্ত বুলাইয়া বলিতে লাগিলেন, "শান্ত হও, শান্ত হও।" শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে রাখালের বাহ্যসংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল।

রাখাল দিন দিন অন্তর্মুখী হইতে লাগিলেন। তাঁহার এই অন্তর্মুখী ভাবাবস্থা ঠাকুর অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। তিনি বলিতেন, "আহা! আজকাল রাখালের স্বভাবটী কেমন হয়েছে। অন্তরে ঈশ্বরের নাম জপ করে কিনা—তাই ঠোঁট নড়ে।" আবার কাহাকে কাহাকেও তিনি বলিতেন, "রাখাল জপ করতে করতে বিড় বিড় করতো। আমি দেখে আর স্থির থাকতে পারতাম না। একেবারে তাঁর উদ্দীপন হয়ে বিহ্বল হয়ে যেতুম।" বাস্তবিকই রাখালকে দেখিয়া তিনি কখনও কখনও ভাবাবিষ্ট হইয়া

বলিতেন, "আমি অনেক দিন এখানে এসেছি—তুই কবে এলি?" এই অলৌকিক দিব্যবাণীর মর্ম্মরহস্য কে বুঝিবে?

প্রসঙ্গক্রমে একদিন প্রাতে ঠাকুর শব্দব্রহ্মের বিষয়ে কিছু বলিয়াছিলেন। রাখাল সেদিন মধ্যাহ্নে বিজন পঞ্চবটী মূলে উহা হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা করিবার জন্য ধ্যান করিতে বসিলেন। তন্ময় হইয়া ধ্যানাবস্থায় তিনি শুনিতে পাইলেন যে, বৃক্ষশাখায় বসিয়া বিহঙ্গেরা মধুর কাকলীতে বেদ গান করিতেছে।

সাধনভজন করিতে করিতে রাখালের কখন কখন নানারূপ অলৌকিক দর্শন হইত। পুণ্যবতী রাণী রাসমণির দেবালয়ে জনৈক ব্যক্তি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ে। তাহাকে দেখিবার কেহ ছিল না। রাখাল অতি যত্নসহকারে কয়েকদিন তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এক রাত্রে উক্ত পীড়িত ব্যক্তি রোগযন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিল, রাখাল নিকটে বসিয়া সব দেখিতেছিলেন। রোগীর যন্ত্রণার উপশমের তিনি কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে রাখাল অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে রোগীর শিয়রে বসিয়া একান্ত মনে জপ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় দেখিতে পাইলেন যেন একটী দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার অপরূপ দিব্য লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া দেবীজ্ঞানে রাখাল স্বতঃই তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "মা, এই রোগী কি আরোগ্যলাভ করবে?" সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া তিনি উত্তর করিলেন, "হাঁ"। উত্তর দিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই মূর্ত্তি সহসা অন্তর্হিতা হইল! আশ্চর্য্যের বিষয় ঠিক তার পরদিন রোগী সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইয়া উঠিল।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর তাঁহার ঘরের পূর্ব্বদিকে লম্বা বারান্দার উত্তরাংশে রাখালের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছেন এমন সময়ে তাঁহারা উভয়ে দেখিতে পাইলেন, ফটক পার হইয়া একটী জুড়িগাড়ী তাঁহাদের দিকে আসিতেছে। গাড়ীটী দেখিয়াই ঠাকুর যেন আতঙ্কে তাঁহার ঘরে গিয়া বসিলেন। রাখালও বিস্মিতভাবে তাঁহার অনুগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন, "যা—যা, ওরা এখানে আসতে চাইলে বলিস এখন দেখা হবে না।" রাখাল তৎক্ষণাৎ ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আগন্তুকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে না একজন সাধু থাকেন?" রাখাল বলিলেন, "হাঁ, থাকেন। আপনারা কি প্রয়োজনে এসেছেন?" আগন্তুকদের মধ্যে একজন বলিলেন, "আমাদের একজন আত্মীয় অত্যন্ত পীড়িত। ইনি যদি কোন ঔষধ দয়া করে দেন—তাই এসেছি।" রাখাল তাহাদিগকে বলিলেন, "আপনারা ভুল শুনেছেন। ইনি তো কখন কাহাকেও ঔষধ দেন না। বোধ হয় আপনারা দুর্গানন্দ ব্রহ্মচারীর কথা শুনে থাকবেন। তিনি ঔষধ দেন বটে। তিনি ঐ পঞ্চবটীর নিকটে কুটীরে থাকেন—গেলেই দেখা পাবেন।" ঠাকুর কিছুক্ষণ পরে রাখালকে বলিলেন, "ওদের ভিতর কি যে একটা তমোভাব দেখলাম। তাই ওদের দিকে তাকাতেই পারি নি—ওদের সঙ্গে কথা কইব কি? ভয়ে পালিয়ে এলাম।" এই বলিয়া তিনি রাখালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই মানুষ দেখলে চিনতে পারিস?" রাখাল উত্তরে বলিলেন, "না।" সেইদিন ঠাকুর লক্ষণাদিসহ লোক চিনিবার তত্ত্ব শিখাইয়া দিলেন। উত্তরকালে রাখালের লোক চিনিবার অসাধারণ ক্ষমতা দেখা যাইত।

সাধকের মন যেমন স্তরে স্তরে ঊর্দ্ধে আরোহণ করে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ অলৌকিক বিভূতি প্রকাশ পায়। ঐ দিকে দৃষ্টি পড়িলে মানুষ উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করিতে পারে না। সাধনপথের উহা কণ্টকস্বরূপ। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার নিকট ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "মা, অষ্টসিদ্ধি চাই না, লোক-মান্য চাই না, কেবল এই কোরো, যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়।" সাধন করিতে করিতে রাখালেরও বিভূতি প্রকাশ পাইয়াছিল। কাঁচের ভিতর যেমন জিনিষ দেখা যায় মানুষকে দেখিলে রাখাল তাঁহার ভিতরটা তেমনি সব দেখিতে পাইতেন। দক্ষিণেশ্বরে যে সব লোক ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিত, তাহাদের কাহার ভিতরে কি ভাব আছে, রাখাল তাহা স্পষ্টরূপে দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেন। সুতরাং এইরূপে সকলের অন্তরস্থ ভাব দর্শন করিয়া তন্মধ্যে যাহারা যথার্থ ধর্ম্ম-পিপাসু তাহাদিগকেই ঠাকুরের নিকট যাইতে দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ইহা জানিতে পারিয়া রাখালকে তিরস্কার করিয়া বলেন, "তোর এ সব কি হীনবুদ্ধি ? বিভূতির দিকে নজর রাখলে ঈশ্বরলাভ হয় না। ছিঃ! ছিঃ! ওদিকে কখন মন দিস্ নি।" রাখাল সেইদিন হইতে ঐ সব বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইলেন।

অনন্তর রাখালের অন্তরে তীব্র বৈরাগ্যের ভাব ও ব্যাকুলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঠাকুর তাঁহার এই অবস্থার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "রাখাল মাঝে মাঝে বলতো, বিষয়ী লোক আসতে দেখলে ভয় হয়। আমার যখন প্রথম এই অবস্থা হল তখন বিষয়ী লোক আসতে দেখলে দরজা বন্ধ করতাম।" শ্রীরামকৃষ্ণ আরও

বলিতেন, "রাখাল এখানে শুয়ে শুয়ে বলতো, 'তোমাকেও আমার ভাল লাগে না' ; এমনি তার একটী অবস্থা হয়েছিল।"

যতই দিন যাইতে লাগিল, রাখালও সাধনায় তন্ময় হইতে লাগিলেন। তখন ঠাকুরের আর রীতিমত সেবা করিয়া উঠিতে পারিতেন না। তাঁহার তৎকালীন অবস্থা দেখিয়া ঠাকুর তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে বলিতেন, "রাখালের এমনি স্বভাব হয়ে গেছে যে তাকে আমায় জল দিতে হয়, সেবা করতে পারে না।"

দক্ষিণেশ্বর দেবালয়ের উত্তরে সরকারী বারুদখানা (ম্যাগাজিন ঘর), উহার সংলগ্ন একটী রেলের সাইডিং ছিল। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া ঝাউতলার দিকে যাইতে যাইতে উক্ত লাইনের উপর হঠাৎ পড়িয়া যান। ইহাতে তাঁহার খুব গুরুতর আঘাত লাগে এবং তাঁহার বাম হাতের একখানা হাড় সরিয়া গিয়াছিল। রাখাল তজ্জন্য অন্তরে অতিশয় দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন, কারণ ঠাকুরের শরীর রক্ষা করা তাঁহারই দায়িত্ব ও সেবার অন্তর্গত। রাখালের মনোভাব বুঝিয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "যদিও শরীর রক্ষার জন্য তুই আছিস, তোর দোষ নেই, কেন না, তুই থাকলেও রেল পর্য্যন্ত যেতিস না।" ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইয়া সহাস্যে রাখালকে বলিতেছেন, "দেখিস, তুই যেন পড়িস নে। মান করে যেন ঠকিস নে।" পরে ইহা লইয়াই যে মান অভিমানের অভিনয় হইবে, তাহাই কি তিনি তাঁহার মানস-পুত্রকে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করিয়া দিতেছেন?

রাখাল মনে করিতেন যে সাধারণ লোক ঠাকুরের হাত ভাঙ্গা দেখিলে না বুঝিয়া নানারূপ মিথ্যা ধারণা লইয়া যাইতে পারে, তাই কাপড় দিয়া তাঁহার হাত ঢাকিয়া দিতেন। ইহাতে ঠাকুর

রাখালের প্রতি অসন্তুষ্ট হইতেন। তিনি ভক্তদের বলিতেন, "এমনি অবস্থায় রেখেছেন যে ঢাকা-ঢাকি করবার জো নাই। রাখাল আমার অবস্থা বোঝে না। পাছে কেউ দেখতে পায়, নিন্দা করে, গায়ে কাপড় দিয়ে ভাঙ্গা হাত ঢেকে দেয়। মধু ডাক্তারকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে সব কথা বলছিল। তখন চেঁচিয়ে বল্লাম—'কোথা গো মধুসূদন, দেখবে এস, আমার হাত ভেঙ্গে গেছে'।"

রাখাল শুধু ইহা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না। ঠাকুর যখন বেদনায় অধৈর্য্য হইয়া ইহাকে উঁহাকে তাঁহার হাত দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, তখন ঠাকুরের উপর তিনি চটিয়া উঠিতেন। ঠাকুর ইহাতে রাখালের উপর বিরক্ত হইয়া ভক্তদের নিকট বলিতেন, "রাখাল চটে,—আমার অবস্থা বোঝে না। এক একবার মনে করি এখান থেকে যায় যাক্। আবার মাকে বলি, মা কোথায় যাবে—কোথায় জ্বলতে পুড়তে যাবে!"

এই সময়ে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গ পার্ষদ বালক ভক্তেরা একে একে তাঁহার নিকট আসিতেছিলেন। তাঁহাদিগের প্রতি ঠাকুরের আদর, স্নেহ ও তীব্র আকর্ষণ দেখিয়া রাখালের মনে একটা ঈর্ষা-ভাবের উদয় হইত। ইহার মূলে কাহারও প্রতি তাঁহার ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল না। বালক স্বীয় পিতামাতাকে অপর কোন বালককে আদর ও স্নেহ করিতে দেখিলে যেমন মনে মনে হিংসা করে—রাখালেরও সেইরূপ হইত। এই হিংসা বা অভিমান, প্রেমাস্পদের প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমেরই প্রকাশ। রাখাল মনে করিতেন ঠাকুর যেন তাঁহারই একমাত্র নিজস্ব পিতা, মাতা ও গুরু। অপর কাহারও তাঁহার উপর অধিকার নাই। তাঁহাকে ছাড়া অপর কাহাকেও ঠাকুর আদর বা স্নেহ

করিলে রাখালের অভিমান হইত। এইরূপ হিংসা বা অভিমানের বীজ বিশুদ্ধ প্রেমেই নিহিত থাকে। ঠাকুর এই প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ সারদানন্দ স্বামিজীকে বলিয়াছিলেন, "রাখালের মনে তখন বালকের ন্যায় হিংসাও ছিল। তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও আমি ভাল বাসিলে সে সহ্য করিতে পারিত না, অভিমানে তাহার মন পূর্ণ হইয়া উঠিত। তাহাতে আমার কখন কখন তাহার নিমিত্ত ভয় হইত, কারণ মা (জগদম্বা) যাহাদের এখানে আনিতেছেন তাহাদের উপর হিংসা করিয়া পাছে তাহার অকল্যাণ হয়।"

শ্রীযুত মাষ্টার মহাশয় প্রমুখ ভক্তবৃন্দের নিকট পরে একদিন ঠাকুর এই হিংসার প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "তখন রাখাল খুঁত খুঁত করত, গাড়ীতে আমার সঙ্গে যাবে তা দেরী করত। অন্য ছোকরারা আমার কাছে এলে বিরক্ত হত। যদি কলকাতায় দেখতে যেতে চাইতাম—তাহলে বলতো, 'ওরা কি সংসার ছেড়ে আসবে—তাই আপনি দেখতে যাবেন ?' অন্য ছোকরাদের জলখাবার দেওয়ার আগে ভয়ে বলতাম তুই খা আর ওদের দে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সহসা ভাবচক্ষে দেখিলেন মা যেন রাখালকে সরাইয়া দিতেছেন। তিনি তখন ব্যাকুল হইয়া মাকে জানাইলেন—"মা, ওকে হৃদের মত সরাস নি, মা ও ছেলে মানুষ, বোঝে না তাই কখন কখন অভিমান করে। যদি তোর কাজের জন্য ওকে এখান থেকে কিছুদিনের জন্য সরিয়ে দিস—তা হলে ভাল জায়গায় মনের আনন্দে ওকে রাখিস।"

ঠাকুর অধর সেনের বাড়ীতে হঠাৎ ভাবাবিষ্ট হইয়া একদিন বলিয়াছিলেন, "মা, একি দেখাচ্ছ ! থাম, আবার কত কি ? রাখাল

টাখালকে দিয়ে কি দেখাচ্ছ।" আবার তিনি বলিলেন, "মা, তোমাকে বলেছিলাম, "একজনকে সঙ্গী করে দাও, আমার মত। তাই বুঝি রাখালকে দিয়েছ।" এই দিব্যভাবের দিব্যবাণী ও দিব্যলীলার মর্ম্ম কে বুঝিবে ?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শ্রীবৃন্দাবনে রাখাল

দক্ষিণেশ্বরে রাখালের একাদিক্রমে বাস করিবার পক্ষে এখন প্রধান অন্তরায় হইল, তাঁহার স্বাস্থ্য। যে কারণেই হউক তিনি এই সময়ে প্রায়ই জ্বরে আক্রান্ত হইতেন। এই জন্য ঠাকুর রাখালের নিমিত্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত হইয়া পড়েন। শরীর অসুস্থ হইত বলিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাখাল মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিতেন। এই সময়ে পিতৃগৃহে না থাকিয়া অধিকাংশ দিন শ্রীযুত বলরাম বা শ্রীযুত অধর সেনের বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন। ইঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরক্ত ভক্ত। ঠাকুর তাঁহার বিশিষ্ট গৃহী ভক্তদিগকে বলিতেন, "নরেন্দ্র, ভবনাথ রাখাল এরা আমার অন্তরঙ্গ। এদের খাওয়ালে সাক্ষাৎ নারায়ণকে খাওয়ান হয়। এরা সামান্য নয়, এরা ঈশ্বরাংশে জন্মেছে।" সুতরাং ইঁহারা পরম যত্ন ও আদর সহকারে রাখালকে গৃহে রাখিতেন। ইঁহাদের নিকট হইতে ঠাকুর রাখালের সমুদয় সংবাদ পাইতেন এবং রাখালের সহিত ইঁহাদের প্রায় সর্ব্বদা ঠাকুরের প্রসঙ্গ চলিত। শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে কলিকাতায় ভক্তগৃহে আসিতেন ও নরেন্দ্র রাখাল প্রমুখ অন্তরঙ্গদিগকে সংবাদ দিয়া তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে আদেশ করিতেন। একবার তিনি অধর সেনের বাড়ীতে রাখালকে না দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত হইলেন। অধর ঠাকুরকে ঐরূপ ব্যাকুল দেখিয়া

রাখালকে আনিবার জন্য অবিলম্বে জনৈক লোকসহ গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। আনন্দমোহন সেদিন কলিকাতায় আসাতে রাখাল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।

কলিকাতাতেও রাখালের স্বাস্থ্য ভাল থাকিল না। তাঁহার শরীর ক্রমাগত অসুস্থ হওয়ায় অনেকে জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে পরামর্শ দিলেন। সুযোগও ঘটিল। শ্রীযুত বলরাম সেই সময়ে সপরিবারে বৃন্দাবনে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছিলেন। তিনি রাখালকে তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। ঠাকুর ইহা শুনিয়া অনুমোদন করিলেন। কারণ বলরামের কাছে থাকিলে রাখালের যত্ন, আদর, চিকিৎসা ও শুশ্রূষাদির কোন ত্রুটী হইবে না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ঠাকুর কিছুদিন আগে জানিতে পারিয়াছিলেন, "মা যেন তাহাকে এখান হইতে সরাইয়া দিতেছেন," ইহাতে ঠাকুর ব্যাকুল হইয়া জগদম্বার কাছে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "যদি তোর কাজের জন্য এখান হইতে কিছুদিনের জন্য সরাইয়া দিস, তাহা হইলে ভাল জায়গায় মনের আনন্দে রাখিস।" শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিলেন, মা তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়াছেন, তাই শ্রীযুত বলরামের সঙ্গে রাখালের বৃন্দাবন যাত্রার প্রস্তাবে ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

বৃন্দাবনে গিয়া কিছুদিন পরে রাখাল অসুস্থ হইয়া পড়েন। ঠাকুর ইহা শুনিতে পাইয়া স্নেহময়ী জননীর মতই উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল হইলেন। এমন কি একদিন হাজরার কাছে, 'কি হবে' বলিয়া আকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল পাছে তাঁহার রাখালকে তিনি হারাইয়া ফেলেন। এই প্রসঙ্গে

পূজ্যপাদ সারদানন্দ স্বামিজী যাহা ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছিলেন তাহা লীলাপ্রসঙ্গে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "বৃন্দাবনে থাকিবার কালে রাখালের অসুখ হইয়াছে শুনিয়া কত ভাবনা হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। কারণ ইতিপূর্ব্বে মা দেখাইয়াছিলেন রাখাল সত্য সত্যই ব্রজের রাখাল। যেখান হইতে যে আসিয়া শরীর ধারণ করিয়াছে, সেখানে যাইলে প্রায়ই তাহার পূর্ব্বকথা স্মরণ হইয়া সে শরীর ত্যাগ করে। সেই জন্য ভয় হইয়াছিল পাছে শ্রীবৃন্দাবনে রাখালের শরীর যায়। তখন মার নিকট কাতর হইয়া কত প্রার্থনা করি এবং মা অভয়দানে আশ্বস্ত করেন।"

শ্রীশ্রীজগদম্বার এই অভয়বাণী শুনিয়া তিনি পরে রাখালের অসুস্থতা সত্ত্বেও শ্রীযুত মাষ্টার মহাশয়ের নিকট তাঁহার লিখিত পত্র লইয়া কৌতুক করিয়াছেন। রাখাল লিখিয়াছিলেন, "এ বড় উত্তম স্থান, আপনি আসবেন। ময়ূর ময়ূরী সব নৃত্য করছে—আর নৃত্য-গীত—সর্ব্বদাই আনন্দ।" মাষ্টার মহাশয়কে দেখাইয়া ঠাকুর তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন, "বৃন্দাবন থেকে রাখাল এঁকে লিখেছে, 'এ বেশ জায়গা—ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করছে। এখন ময়ূর ময়ূরী—বড়ই মুশকিলে ফেলেছে'!" ইহার দুই তিন দিন পরে শ্রীবৃন্দাবন হইতে ভক্ত চুণীলাল ফিরিয়া আসিলে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যগ্র-ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাখাল কেমন আছে?' চুণীবাবু তদুত্তরে বলিলেন, "আজ্ঞে, ভাল আছেন।" ঠাকুর ইহা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন।

রাখাল শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া এক আনন্দময় মাধুর্য্যরসের আস্বাদ পাইলেন। শ্রীবৃন্দাবনের অনুপম শ্যামশোভা ও অবিচ্ছিন্ন আনন্দের

প্রবাহ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। আনন্দময় ব্রজধামে বিচরণ করিতে করিতে ব্রজেশ্বরের লীলাস্থানগুলি দর্শন করিয়া রাখাল আনন্দে আত্মহারা ও বিহ্বল হইতেন। সেই বিস্মৃত-যুগের কথা তাঁহার চিত্তদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া যেন নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠিত। তাঁহার মনে হইত সেই বৃন্দাবন! সেই যমুনা—শ্যামসুন্দরের মধুর মুরলীধ্বনিতে নাচিতে নাচিতে যাহা উজানে বহিয়া যাইত, সেই গোচারণ মাঠ—যেখানে ব্রজেশ্বরের বংশীধ্বনি শুনিয়া শ্যামলী-ধবলী গাভীর দল হাম্বা হাম্বা রবে ছুটিয়া আসিত! শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম ও সুবলাদি ব্রজরাখালদের সঙ্গে রাখালরাজ ঘুরিয়া বেড়াইতেন, এই ব্রজমণ্ডলেই পাঁচন হাতে নূপুর পায়ে শ্যামসুন্দরের চারিদিকে নৃত্যরত সখার দল আনন্দে মাতিয়া থাকিত। এই সেই বৃন্দাবন—যেখানে নন্দরাণী মা যশোদা ব্যাকুলভাবে ক্ষীর, সর, নবনী হাতে নন্দলালের জন্য দাঁড়াইয়া রহিতেন। এই সেই ব্রজধাম—যেখানে মুরলীর তানে গোপ-গোপীরা আত্মহারা হইয়া মধুর আকর্ষণে যমুনার কূলে কূলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে খুঁজিয়া বেড়াইত, এই সেই বৃন্দাবন—যেখানে পবিত্র রজঃ কৃষ্ণ-পদচিহ্ন ধারণ করিয়া রহিয়াছে, যাহা শিরে লইলে জন্ম সার্থক হয়, বক্ষে স্পর্শ করিলে তপ্ত হৃদয় শীতল করে, অঙ্গে মাখিলে সকল জ্বালা জুড়াইয়া যায়, সর্ব্ব দেহ মন ইন্দ্রিয় পবিত্র হয়! সেই বৃন্দাবনে কুঞ্জে কুঞ্জে বনে বনে কেকারবে ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করিতেছে, বিরহবিধুর কৃষ্ণপ্রেম গাহিয়া বিভোর হইতেছে, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকল ব্রজবাসী করতালি দিয়া “জয় রাধে গোবিন্দ” বলিয়া প্রেমভরে নৃত্য করিতেছে! রাখালের হৃদয়ে ব্রজমাধুরীর অস্ফুট ছবি মনে উদিত হইলেই তাঁহার

মনে পড়িত—শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহমাখা মূর্তি! ব্রজের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে না করিতে অনন্ত প্রেমসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে তিনি তন্ময় হইয়া পড়িতেন। ইহাই শ্রীশ্রীজগদম্বার লীলা। ব্রজধামে রাখালের যাহাতে স্বরূপ সত্তার অনুভব না হয় ইহাই ছিল মার নিকটে ঠাকুরের প্রার্থনা। তাই ব্রজধামে ব্রজভাবের স্ফূর্ত্তি হইতে না হইতে অনন্ত মাধুর্য্যময় শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি তাঁহার মনে উদিত হইত। শ্রীকৃষ্ণসখার স্বরূপ সত্তার পরিবর্ত্তে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার সন্তানভাবই জাগিয়া উঠিত।

শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া রাখালের হৃদয়ে প্রেমপদ্ম বিকশিত হইল। তাহার স্নিগ্ধ-শুভ্র-বিমলজ্যোতিতে তাঁহার দৃষ্টি উদার ও সম্প্রসারিত হইল এবং তাঁহার বালস্বভাবে এক প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের রেখা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার মনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমজনিত বালকের মত যে মান অভিমান হিংসার উদয় হইত, অনাবিল ভাব-প্রবাহে তাহা যেন কোথায় ভাসিয়া গেল। তাঁহার মনে হইত চিরক্ষমাশীলা স্নেহময়ী জননীর মত তিনি তাঁহার সকল অপরাধ সকল ত্রুটি উপেক্ষা করিয়া এক অপার্থিব ও মঙ্গলময় স্নেহের আবেষ্টনে তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য রাখাল চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে বলরামবাবু সপরিবারে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছিলেন। প্রায় তিন মাস পরে রাখাল ব্রজধাম হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অমৃতের পথে

শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত হইয়া রাখাল দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। প্রায় তিনমাস পরে রাখালকে সুস্থশরীরে ব্রজমণ্ডল হইতে ফিরিতে দেখিয়া ঠাকুর পরম আনন্দিত হইলেন। রাখাল ভক্তদের নিকট অবগত হইলেন যে বৃন্দাবনে তাঁহার পীড়ার সংবাদে ঠাকুর কত ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার আরোগ্যের নিমিত্ত শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরীকে ডাব চিনি মানসিক করিয়াছিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া রাখালের হৃদয় আর্দ্র হইত এবং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার গভীর প্রেম ও ভক্তি শতধারে উথলিয়া পড়িত।

রাখাল বৃন্দাবন হইতে আসিয়া অধিকাংশ সময় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট থাকিতেন। ঠাকুরের ঘরে রাত্রিকালে পূর্ব্বের মত ক্যাম্পখাটে শুইতেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে ঠাকুরের নিকট অনেক অন্তরঙ্গ ভক্তের দল যাতায়াত করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ স্কুল কলেজে পড়িতেছেন, কেহ চাকরি করিতেছেন, কেহ উদাসীনভাবে রহিয়াছেন আবার কেহ কেহ বাড়ীঘর সব ত্যাগ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সেবা ও তাঁহার উপদেশমত সাধন ভজনে নিরত আছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাখালের প্রায় সমবয়স্ক, কেহ বয়সে জ্যেষ্ঠ, আবার কেহ বা

কনিষ্ঠ। ইঁহাদের অনেকেই তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত, কেহ কেহ তাঁহার ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ বন্ধু। শ্রীবৃন্দাবন হইতে আসিয়া ইঁহাদের প্রায় সকলের সহিত রাখাল ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলেন। ইঁহারা যে তাঁহার পরম প্রেমাস্পদ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত, একই স্নেহডোরে যে তাঁহারা সকলেই বাঁধা! ইঁহাদের সকলের দেহ মন ও বুদ্ধি যে শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে অর্পিত, সকলের হৃদয় তাঁহার প্রেমে অনুপ্রাণিত এবং তাঁহার আকর্ষণে আকৃষ্ট। এইসব অন্তরঙ্গ ভক্তদের প্রতি ঠাকুর আদর ও স্নেহ দেখাইয়া সকলের নিকট উচ্চ প্রশংসা করিলেও রাখালের মনে পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর কোন মান, অভিমান, ক্ষোভ বা ঈর্ষ্যার উদয় হইত না। বরং তাঁহারা সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় বলিয়া তাঁহাদের প্রতি তাঁহার হৃদয়ে একটা অপূর্ব্ব ভালবাসার আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিত। তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে লাগিলেন, "চাঁদামামা, সকলেরই মামা"—কাহারও একার নহে।

রাখালের মনের এই পরিবর্ত্তন এবং এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী সাধনের জন্যই শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহাকে ব্রজধামে সরাইয়া লইয়া যান। ঠাকুরের সঙ্গে রাখালের অলৌকিক সম্বন্ধ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় রাখালের একটী বিশিষ্ট স্থান আছে। যিনি জগজ্জননীর সাক্ষাৎ দান, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রার্থিত শুদ্ধ-সত্ত্ব ছেলে, যিনি ঈশ্বরকোটী ও নিত্যসিদ্ধ, তাঁহাকে সাধারণ দৃষ্টি দেখিলে মানুষ কতটুকু বুঝিতে পারে? যাঁহার সম্বন্ধে ঠাকুর স্বয়ং বলিয়াছেন যে, "রাখাল যুগে যুগে প্রত্যেক অবতারের লী সহচর হয়ে এসেছে" তাঁহার দিব্যভাবময় জীবনের—তাঁহার অদ্ভুত

কর্ম্মের কে ইয়ত্তা করিবে? যে মহাশক্তি রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যে মহাশক্তির লীলার জন্য রাখাল আহূত, যে মহাকার্য্যের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ সন্তানেরা মহাশক্তির আকর্ষণে ধরাধামে সমানীত, সেই মহাশক্তিই রাখালের হৃদয়কমলে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রেমদীপ্তির আভায় তাঁহাকে দিন দিন সমুজ্জ্বল করিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবন ধামে লইয়া গেলেন। যিনি উত্তরকালে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সঙ্ঘের সঙ্ঘনায়করূপে শীর্ষস্থানে অবস্থিত হইবেন, যিনি আদর্শ আচার্য্য, গুরু ও নেতারূপে ভবিষ্যতে ধর্ম্মচক্র পরিচালনা করিবেন, যিনি আধ্যাত্মিক জগতে শতসহস্র পিপাসু নরনারীকে শান্তির অমৃতবারি দান করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গী হইয়া আসিয়াছেন এবং যিনি ভাবতন্ময়তার অপূর্ব্ব কমনীয় মূর্ত্তিরূপে সকলের প্রত্যক্ষ-গোচর হইবেন—তাঁহার সেই দিব্য ভাবকে পরিস্ফুট করাইবার জন্যই মহামায়া শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে তাঁহাকে অপসারিত করিয়া ছিলেন। বালস্বভাব রাখাল ভাবী কার্য্য বিষয়ে এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাই ঠাকুর মা-জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "মা, ও ছেলেমানুষ বোঝেনা তাই কখন কখন অভিমান করে।" গুরু-শিষ্য, পিতা-পুত্র এবং জননী-সন্তান প্রভৃতি প্রেমের যে আকারই হউক বিরহের অগ্নিশুদ্ধিতে সকল মলিনতা চলিয়া গিয়া তাহার বিশুদ্ধ উজ্জ্বল রূপ ফুটিয়া উঠে। ইতিহাসে, পুরাণে এবং প্রাচীন কাহিনীতে ইহার শত শত দৃষ্টান্ত আছে। তাই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরামকৃষ্ণের বিরহে রাখালের হৃদয়ে এই অপূর্ব্ব প্রেমের প্রেরণা আসিয়াছিল। যাঁহাদের লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় সঙ্ঘগঠন হইবে, তাঁহাদের সঙ্গে রাখাল সেই অপূর্ব্ব প্রেমসূত্রেই যুক্ত

হইলেন। যে আশঙ্কায় শ্রীরামকৃষ্ণ উদ্বিগ্ন ও ভীত হইয়াছিলেন, পাছে মার প্রেরিত পার্ষদ সন্তানদের হিংসা করিয়া রাখালের অকল্যাণ হয়, বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিলে রাখালকে দেখিয়া তাঁহার সে আশঙ্কা সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়াছিল।

দক্ষিণেশ্বরে কয়েকমাস বাস করিবার পর রাখালের শরীর কিছু অসুস্থ হইয়া পড়ে। ঠাকুরও তৎকালে সর্দ্দি ও গলার বেদনায় কষ্ট পাইতেছিলেন। রাখাল জানিতেন, তাঁহার সামান্য কোন পীড়ার সংবাদে ঠাকুর কেমন ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। দক্ষিণেশ্বরে থাকিলে তাঁহার পীড়ার কথা ঠাকুরের কাছে গোপন থাকিবে না। ঠাকুরের এই অসুস্থ শরীরে তিনি যাহাতে তাঁহার কোন উদ্বেগ বা চিন্তার কারণ না হন, রাখাল তাই তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার কথা ঠাকুরের নিকট কোন উল্লেখ না করিয়া কলিকাতায় পিতৃগৃহে চলিয়া আসেন। বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া সেই সর্ব্বপ্রথম রাখালের পিতৃগৃহে বাস। প্রসঙ্গক্রমে ঠাকুর এই সময়ে তাঁহার কোন কোন ভক্তের নিকটে বলিয়াছিলেন, "রাখাল এখন পেনসন খাচ্ছে। বৃন্দাবন থেকে এসে —এখন বাড়ীতে বাস করছে।"

নরেন্দ্র ও রাখাল প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে দেখিবার জন্য ঠাকুর মাঝে মাঝে বলরামের গৃহে যাইতেন। তাঁহার আগমন সংবাদ যাহাতে ভক্তেরা পায় শ্রীযুত বলরামের উপর সেইরূপ নির্দ্দেশ ছিল। নরেন্দ্র ও রাখালকে না দেখিলে ঠাকুর ব্যস্ত হইবেন ভাবিয়া তিনি সর্ব্বাগ্রে ইঁহাদের নিকট ঠাকুরের আগমন সংবাদ পাঠাইতেন। একদিন বলরামের গৃহে প্রাতঃকালেই ভাবাবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরীয় কথায় বিভোর হইয়া রাখালাদির সঙ্গে কোন

কথা বলিতে পারেন নাই। পাছে ঠাকুর পরে তাঁহাকে তাঁহার শারীরিক স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করেন এই আশঙ্কায় রাখাল ঠাকুরকে না জানাইয়া ধীরে ধীরে গৃহে চলিয়া যান। বেলা প্রায় একটার পর ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়া রাখালকে দেখিতে না পাইয়া শ্রীযুত লাটুকে (অদ্ভুতানন্দ স্বামিজী) জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাখাল কোথায়?" লাটু উত্তর করিলেন, "চলে গেছে; বাড়ী।" শ্রীরামকৃষ্ণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি! আমার সঙ্গে দেখা না করে?" ঠাকুর অবশেষে সব জানিতে পারিলেন। তিন দিন পরেই কথাপ্রসঙ্গে তিনি তাঁহার ভক্তদিগের নিকট বলিয়াছিলেন, "রাখাল বাড়ীতে আছে। তারও শরীর বড় ভাল নয়। ফোঁড়া হয়েছে। একটী ছেলে বুঝি তার হবে।"

রাখাল সুস্থ হইবামাত্র দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া আসিলেন। গৃহে কিছুদিন বাস করিলেও তাঁহার মন নিয়ত বিচরণ করিত শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে। তিনি প্রায় অন্তর্মুখী হইয়া থাকিতেন। পিতৃগৃহে বাস করিয়া তিনি ছিলেন সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত।

দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া আসিবার কয়েকদিন পরে একদিন রাত্রি নয়টার সময় তান্ত্রিকসাধক শ্রীযুত মহিমাচরণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নিকট তাঁহার একটী অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে তিনি উপস্থিত ভক্তদের লইয়া একটী ব্রহ্মচক্র রচনা করিয়া সাধন করেন।

সেদিন কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর রাত্রি। রাণী রাসমণির দেবালয়, গৃহ ও প্রাঙ্গণ তখন নীরব নিস্তব্ধ। ঠাকুরের ঘরখানি সেই নিঃশব্দ রজনীতে এক দিব্যভাবে পরিপূর্ণ ছিল। সেই ঘোরা তমিস্রা

নিশায় মুহুর্মুহুঃ সমাধিমগ্ন, অনন্ত ভাব-সিন্ধু, মাতৃগত-প্রাণ শ্রীরাম-কৃষ্ণের সম্মুখে তান্ত্রিক সাধক মহিমাচরণ মহাশক্তির আরাধনায় শ্রীযুত মাষ্টার মহাশয়, কিশোরী প্রমুখ দুই একটী ভক্ত এবং রাখালকে লইয়া তাঁহার ঈপ্সিত ব্রহ্মচক্র রচনা করিলেন। মন্দিরের বিরাট নিস্তব্ধতার মধ্যে চারিদিকে ঝিল্লীরব এবং পূতসলিলা ভাগীরথীর কলকলধ্বনি ব্যতীত আর কিছু শ্রুতিগোচর হইতেছিল না। চক্রমধ্যস্থ সমবেত সকলকে ধ্যান করিতে মহিমাচরণ অনুরোধ করিলেন ঠাকুর ছোট খাটটীতে বসিয়া একদৃষ্টে সব দেখিতেছিলেন। ধ্যান করিতে করিতে সহসা রাখালের ভাবাবস্থা উপস্থিত হইল। ঠাকুর ইহা দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ খাট হইতে অবতরণ করিয়া গম্ভীর-কণ্ঠে শ্রীশ্রীজগদম্বার মধুর নাম করিতে করিতে রাখালের বুকে হাত বুলাইতে লাগিলেন। ধ্যানরত সাধকেরা চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন এই অপূর্ব্ব দৃশ্য। ধীরে ধীরে রাখালের বাহ্যসংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। তৎকালে কোন বিষয়ে একটু উদ্দীপনা হইলেই রাখাল একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন।

ইহার দুই দিন পরে ঠাকুর হঠাৎ বেলা ৮টা হইতে অপরাহ্ন ৩টা পর্য্যন্ত মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের তখন গলার বিচিতে বেদনা ও শরীর অসুস্থ। এই সদানন্দ পুরুষকে সম্পূর্ণ মৌন হইতে দেখিয়া শ্রীশ্রীমা, রাখাল এবং লাটু কাঁদিতেছিলেন। মৌন ভঙ্গ হইলে তিনি বলিলেন, "মা দেখিয়ে দিচ্ছিলেন যে সবই মায়া ; তিনিই সত্য, আর যা কিছু সব মায়ার ঐশ্বর্য্য। আর একটি দেখলুম, ভক্তদের কার কতটা হয়েছে।" ঠাকুর রাখালকেও তন্মধ্যে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু কে কতটা আধ্যাত্মিক পথে উন্নত সে সম্বন্ধে

তিনি কিছু বলিলেন না। পূজ্যপাদ সারদানন্দ স্বামী লীলাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "রাখালের সম্বন্ধে মা কত কি দেখাইয়াছেন। তাহার অনেক কথা বলিতে নিষেধ আছে।" সে গুপ্তরহস্য কে ব্যক্ত করিবে?

এই ঘটনার প্রায় মাস দুই পূর্ব্বেই ঠাকুরের গলরোগের সূত্রপাত ‌হইয়াছিল। রোগ ক্রমশঃ কঠিন আকার ধারণ করিল। শাকসবজি তরিতরকারি বা কোন শক্তদ্রব্য তিনি গলাধঃকরণ করিতে পারিতেন না। হঠাৎ একদিন শোনা গেল যে তাঁহার কণ্ঠতালুদেশ হইতে রক্ত নির্গত হইয়াছে। ভক্তেরা তখন ঠাকুরকে কলিকাতায় আনিয়া চিকিৎসা করিবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রথমে বলরামের গৃহে কয়েকদিন থাকিয়া শ্যামপুকুরের একটী ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ঠাকুর আসিলেন। সুবিখ্যাত কবিরাজেরা কোন আশা ভরসা না দেওয়ায় এবং তীব্র ঔষধাদি তাঁহার ধাতে সহ্য হয় না বলিয়া সকলে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করাই সঙ্গত বোধ করিলেন। তৎকালে উক্ত মতে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন—তাঁহারই চিকিৎসাধীনে ঠাকুর রহিলেন। পথ্যাদি প্রস্তুত ও সেবাশুশ্রূষার জন্য শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী শ্যামপুকুরের বাড়ীতে আগমন করিলেন। রাত্রি জাগিয়া ঔষধ পথ্য ব্যবস্থার ভার নরেন্দ্র রাখাল প্রমুখ অন্তরঙ্গ ভক্তের দল লইলেন। গৃহী ভক্তেরা সাধ্যমত সমুদায় খরচপত্র বহন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ব্যয়ভার লাঘব করিবার জন্য রাখালপ্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের তরুণ অন্তরঙ্গ সেবকেরা গৃহে গিয়া ভোজনাদিকার্য্য সমাপন করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণকে এইরূপ কঠিন রোগগ্রস্ত হইতে দেখিয়া রাখাল

প্রথমে নির্ব্বাক হতবুদ্ধির ন্যায় হইয়া রহিলেন। সর্দ্দি ও গলার বিচিতে বেদনা যে এইরূপ কঠিন রোগে পরিণত হইবে তাহা তিনি ইতঃপূর্ব্বে কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই। ঠাকুরের রোগ-যন্ত্রণা দেখিয়া কখন কখন তাঁহার হৃদয়ে অন্তস্তলের মর্ম্মস্থান ভেদ করিয়া এক দুঃসহ বেদনা উঠিত, তাঁহার বক্ষপিঞ্জর নৈরাশ্যের হাহাকারে কখন কখন ভাঙ্গিয়া পড়িত আবার কখন নিশ্চল পাষাণ পুত্তলিকার মত স্থিরদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতেন। নিরুপায় দেখিয়া তিনি মা জগদম্বার নিকট তাঁহার আরোগ্যের জন্য ব্যথিত হৃদয়ে প্রার্থনা করিতেন। রাখালের নীরব অন্তর্ভেদী প্রার্থনা কোন মহাশূন্যে বিলীন হইত কে জানে ?

রাখালের বুক সর্ব্বদা অব্যক্ত ব্যথায় ভরিয়া থাকিত। রাখাল দেখিলেন চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা যথারীতি চলিলেও রোগের কোনরূপ উপশম দেখা যাইতেছে না। ভাবিতে ভাবিতে রাখালের মনে কি যেন এক আশঙ্কার রুদ্রমূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিত। রাখাল ভয়-চকিত হইয়া বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। প্রাণপাত করিয়া ঠাকুরের সেবা করিবার জন্য তিনি দৃঢ়সংকল্প হইলেন।

শ্যামপুকুরে গৃহী ভক্ত ও তরুণ অন্তরঙ্গেরা শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া সম্মিলিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল। কিন্তু ঠাকুর সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে মতের কোন সামঞ্জস্য বা মিল ছিল না। গিরিশাদি ভক্তেরা যাঁহারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম বা যুগাবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন তাঁহারা ঠাকুরের এই কঠিন রোগকে একটা মিথ্যা ভান বলিয়া ধরিয়া

লইতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই রোগের ছলনা। কার্য্য সংসাধিত হইলে আবার পূর্ব্বস্বাস্থ্য লাভ হইবে। আবার কোন কোন ভক্ত ঠাকুরকে শ্রীশ্রীজগদম্বার যন্ত্রস্বরূপ মনে করিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস জগজ্জননী কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য তাঁহার শরীরে এই কঠিন ব্যাধি দিয়াছেন। সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইলেই জগন্মাতা তাঁহার ব্যাধি আরোগ্য করিবেন। কিন্তু তরুণ অন্তরঙ্গ ভক্তেরা ভাবিতেন জন্ম মৃত্যু ব্যাধি দেহের ধর্ম্ম; সুতরাং ইহার মধ্যে কোন অলৌকিক গূঢ় রহস্য আরোপ করা অনাবশ্যক। যতদিন তাঁহার ব্যাধি থাকিবে ততদিন নির্ব্বিচারে তাঁহার রীতিমত চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা করাই তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম।

চারিদিকে এই সব অলৌকিক কল্পনা বা আলোচনার কথা রাখালের কর্ণে প্রবেশ করিলেও তাঁহার হৃদয়কে তাহা কিছুমাত্র স্পর্শ করিত না। তিনি মনে মনে ভাবিতেন যে, যাঁহাকে লইয়া এই সব নিরর্থক আলোচনা কিংবা তর্ক বিতর্ক, তিনি যে সকলের চক্ষুর সম্মুখে দিন দিন দুর্ব্বল ও শুষ্ক হইয়া পড়িতেছেন। সুতরাং ইহাতে বৃথা শক্তি ক্ষয় না করিয়া একাগ্রভাবে তাঁহার প্রাণপণ সেবা এবং তাঁহার রোগ-যন্ত্রণা যাহাতে লাঘব হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখাই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে একমাত্র কর্ত্তব্য। মাতা পিতার গুরুতর অসুস্থতায় কেহ কি তাঁহাদের সম্বন্ধে দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক বিচার করিতে বসে? রাখালের এই সব প্রসঙ্গ বিষবৎ জ্ঞান হইত।

শ্যামপুকুরের বাড়ীতে কালীপূজার পূর্ব্বদিন ঠাকুর অকস্মাৎ তাঁহার কয়েকটী অন্তরঙ্গ ভক্তকে বলিলেন, "কাল

পূজার সব উপকরণ ঠিক রাখিস।" ঠাকুরের এইমাত্র নির্দ্দেশ থাকায় ভক্তেরা বিষম সমস্যায় পড়িলেন। কোন্ উপচারে মায়ের পূজা হইবে এবং কিরূপ ভোগের ব্যবস্থা থাকিবে তাহার কোন উল্লেখ না থাকায় তাঁহারা সকলে বহু জল্পনা কল্পনা করিয়াও স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারিলেন না। অগত্যা তাঁহারা শুধু গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ এবং ভোগের জন্য কিছু মিষ্টান্ন ও পায়েস বন্দোবস্ত রাখিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন পরে ঠাকুর আদেশ করিলে অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহ করা যাইবে। কিন্তু আশ্চর্য্য কালীপূজার দিন রাত্রি সাতটা পর্য্যন্ত ঠাকুর পূজার কোন কথাই উত্থাপন করিলেন না। অন্যান্য দিনের মত তিনি স্থিরভাবে শয্যায় বসিয়া রহিলেন। ভক্তেরা নিরুপায় হইয়া ঠাকুরের সন্নিকটে পূর্ব্বদিকে স্থান মার্জ্জনা করিয়া সংগৃহীত দ্রব্যগুলি রাখিলেন। ঠাকুরকে তথাপি নীরব দেখিয়া তাঁহারা পরে শয্যাপার্শ্বে সমুদায় উপকরণগুলি স্থাপিত করিয়া ধূপ দীপ জ্বালাইয়া দিলেন। ঘর আলোকিত ও ধূপগন্ধে আমোদিত হইল। ঠাকুরকে বেষ্টন করিয়া সকলেই নীরব নিস্তব্ধ ও ধ্যানমগ্ন। সহসা গিরিশচন্দ্র পুষ্পচন্দন লইয়া "জয় মা" বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। অমনি ঠাকুর শিহরিয়া জগন্মাতার ভাবে আবিষ্ট হইয়া গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন। দুই হাতে বরাভয় মুদ্রা ধারণ করিয়া তিনি এক দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলেন। ভক্তেরা কেহ "মা ব্রহ্মময়ী" কেহ "জয় মা" বলিয়া শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন।

রাখাল তখন প্রত্যক্ষ করিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীজগন্মাতা অভিন্ন। আপদে বিপদে তাঁহার বরাভয় সর্ব্বদা তাঁহাকে রক্ষা

করিতেছে। যে সন্তানভাবে তন্ময় হইয়া রাখাল শ্রীরামকৃষ্ণকে স্নেহময়ী জননীস্বরূপে দেখিতেন, বাৎসল্যরসে আপ্লুত হইয়া যাঁহার অনন্ত মাধুর্য্যসুধা পান করিতেন, আজ দেখিলেন তিনি শুধু তাঁহার জননী নহেন—নিখিল বিশ্বের জীব-জগতের তিনি জগদ্ধাত্রী জগজ্জননী! যে মাতৃমূর্ত্তি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণে প্রতিবিম্বিত দেখিতেন, আজ দেখিলেন সেই মাতৃমূর্ত্তির বিরাট জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিমা। রাখাল অনিমেষলোচনে পরমানন্দে তন্ময়ভাবে জননীর দিব্য মাধুর্য্যরস আস্বাদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে "জয় মা" বলিয়া তিনিও সেই শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন।

শ্যামপুকুরে শ্রীশ্রীশ্যামাপূজার রাত্রিতে ঠাকুরকে জগন্মাতারূপে দর্শন করিয়া রাখালের মনে অপূর্ব্ব ভাবান্তর ঘটিল। তিনি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিলেন যে ঠাকুরের এই পীড়া ও রোগ যন্ত্রণা তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছেন। তাঁহার সেবা ও তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন চিন্তায় যাহাতে তাঁহাদের মন প্রতিনিয়ত রত হয়, তাঁহাদের প্রতি কার্য্য এবং তাঁহাদের সমগ্র শারীরিক ও মানসিক চেষ্টা যাহাতে তাঁহাতেই উন্মুখ হইয়া থাকে, দিবারাত্র যাহাতে তাঁহারা তাঁহাতেই যুক্ত হইতে শিখে, তাই মা জগদম্বা শ্রীরামকৃষ্ণরূপে এই লীলা করিতেছেন। ঠাকুরের পীড়ার ও যন্ত্রণার জন্য তাঁহার পূর্ব্বকার মানসিক চাঞ্চল্য, ব্যস্ততা ও গভীর চিত্তক্লেশ চলিয়া গেল। তিনি তাঁহার সেবায় ও চিন্তায় তন্ময় হইতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঔষধে কোন ফল হইতেছে না দেখিয়া ডাক্তার সরকার সহরের উপকণ্ঠে কোন বাগান বাড়ীতে ঠাকুরকে রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন।

খুঁজিতে খুঁজিতে ভক্তেরা কাশীপুরে একটী উদ্যানবাড়ী পাইলেন। শুভদিনে ভক্তেরা শ্রীরামকৃষ্ণকে সেই কাশীপুরের উদ্যানবাড়ীতে লইয়া গেলেন। রাখালও তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কয়েক দিন পরে মনোমোহন ঠাকুরের নিকট প্রকাশ করিলেন যে রাখালের একটী পুত্রসন্তান হইয়াছে। রাখাল শুনিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে রহিলেন। তাঁহার মনে তখন গভীর বৈরাগ্যজনিত প্রশান্তি বিরাজ করিতেছিল। মায়ার লেশমাত্র তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিতে পারে নাই। কোন বন্ধনেই মহামায়া আর তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর ঠাকুর একদিন প্রসঙ্গক্রমে গিরিশকে বলিয়াছিলেন, "রাখাল-টাখাল এখন বুঝেছে, কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা। ওরা যে সংসারে গিয়ে থাকে, সে জেনে শুনে। পরিবার আছে, ছেলেও হয়েছে—কিন্তু বুঝেছে যে সে সব মিথ্যা, অনিত্য। রাখাল-টাখাল এরা সংসারে লিপ্ত হবে না। যেমন পাঁকাল মাছ। পাঁকের ভিতর বাস, কিন্তু গায়ে পাঁকের দাগটী পর্য্যন্ত নেই।"

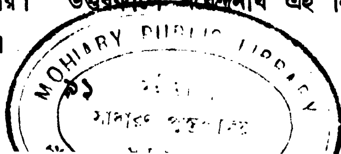
বাস্তবিকই তখন রাখালের মনে হইত যে এই অমৃতময় দিব্যপুরুষের সমগ্র জীবন, সমগ্র ভাবপ্রবাহ, নিখিল জীবজগতের প্রতি তাঁহার অহৈতুকী করুণা ও অপার্থিব স্নেহ যেন অনন্ত আনন্দের নির্ঝর হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে। সেই অমৃতের পথের পথিক হইবার জন্য রাখালের হৃদয়ে একটা তীব্র পিপাসা জাগিয়া উঠিল।

কাশীপুর উদ্যানে রুগ্ন অবস্থায় ঠাকুর তাঁহার অন্তরঙ্গ যুবক ভক্তদিগকে ত্যাগ ও তপস্যার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছিলেন।

নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, বাবুরাম, তারক, যোগীন, কালী, লাটু ও গোপাল প্রায় সর্ব্বদা কাশীপুরে বাস করিতেন। ঠাকুর তাঁহাদের প্রত্যেককে চরম আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও ঈশ্বরলাভের জন্য অধিকারী ভেদে সাধন ভজনের প্রণালী বলিয়া দিতেন।

কিন্তু রাখালের অন্তর্মুখী ভাবতন্ময়তা বুঝিয়া ঠাকুর তাঁহাকে গোপনে অপরূপ দিব্য ভাবের সূক্ষ্ম অনুভূতির রাজ্যে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। রাখাল দিনমানে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্যকরূপে সেবা করিয়াও নির্জ্জনে ঠাকুরের ইঙ্গিত মত সাধনায় সারারাত্র অতিবাহিত করিতেন। স্বামী সারদানন্দ কথাপ্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করিয়া বলিতেন "স্বামিজী (নরেন্দ্র) ও মহারাজ (রাখাল) ঠাকুরের এত সেবা করেও ক্লান্তি বোধ করতেন না। তাঁরা দুজনে সারারাত সাধন ভজন নিয়েই থাকতেন।"

প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যার পর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে তাঁহার সন্নিধানে ডাকাইয়া দুই তিন ঘণ্টা কাল তাঁহার সহিত ভাবী সঙ্ঘ গঠনের বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। তাঁহার এই সব ত্যাগী যুবক ভক্তেরা পুনরায় সংসারে যাহাতে না যায় এবং কি ভাবে তাঁহাদিগকে একত্রে রাখিয়া পরিচালিত করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে ঠাকুর তাঁহাকে যথাযোগ্য উপদেশ দিতেন। একদিন ঠাকুর তাঁহাকে নিভৃতে বলিলেন, "রাখালের রাজবুদ্ধি আছে, ইচ্ছে করলে সে একটা প্রকাণ্ড রাজ্য চালাতে পারে।" তীক্ষ্ণবুদ্ধি নরেন্দ্রনাথ অমনি বুঝিতে পারিলেন যে রাখালকেই ভাবী সঙ্ঘের সঙ্ঘনায়ক পদে বরণ করাই ঠাকুরের অভিপ্রায়। উত্তরকালে নরেন্দ্রনাথ এই নির্দ্দেশ মতই কাজ করিয়াছিলেন।



ঠাকুরের প্রত্যহ এইরূপ নরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া আলোচনা ও শিক্ষাদানের কথা অপর অন্তরঙ্গ ভক্তেরা জানিতে পারিলেন। তাঁহাদের মনে স্বতঃই উদিত হইল যে তাঁহাদিগকে একস্থানে একত্রিত করিয়া একটী সঙ্ঘ গঠন করিবার উদ্দেশ্যে ঠাকুর পীড়ার একটা অছিলা করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই পুনরায় পূর্ব্বস্বাস্থ্য লাভ করিবেন। এইরূপ আশার সঞ্চার তাঁহাদের প্রায় সকলের অন্তরেই হইতে লাগিল।

সত্য সত্যই ঠাকুর তাঁহাদের সেই ভুল ভাঙ্গিয়া দিলেন। একদিন নরেন্দ্র ও রাখালের দিকে তাকাইয়া তিনি স্নেহে বিগলিত হইয়া পড়িতেছিলেন। শিশুর মত তাঁহাদিগকে আদর করিয়া মুখে হাত বুলাইতে বুলাইতে হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, "শরীরটা কিছুদিন থাকত তো লোকদের চৈতন্য হত। তা রাখবে না, সরল মূর্খ দেখে পাছে লোক সব ধরে পড়ে। সরল মূর্খ পাছে সব দিয়ে ফেলে! একে কলিতে ধ্যানজপ নাই।" রাখাল তখন মর্ম্মভেদী কাতরস্বরে তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি বলুন, যাতে আপনার দেহ থাকে।" শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর করিলেন "সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।" রাখাল চুপ করিয়া রহিলেন কিন্তু নরেন্দ্রনাথ তাহাতে বলিলেন, "আপনার ইচ্ছা ও ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হয়ে গেছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের রোগ যেমন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এই সব যুবকের দল তেমনি অনন্যমন হইয়া সেবা ও সাধনভজনে নিরত হইলেন। উদ্যানবাটীর দ্বিতলে ঠাকুর থাকিতেন এবং সেবকেরা নিম্নতলে বাস করিতেন। তাঁহাদের ঘরে সর্ব্বদা সঙ্গীত, স্তোত্র ও শাস্ত্র পাঠ, মহাপুরুষদের জীবন আলোচনা, তাঁহাদের ত্যাগ তপস্যা

ও কঠোর সাধনার চিন্তায় তাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বদা উদ্দীপিত থাকিত। কেহ বাগানের বৃক্ষতলে, কেহ গৃহকোণে, কেহ দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী মূলে এবং কেহ গঙ্গাতীরে ধ্যানভজন করিতেন। রাখাল গভীর ধ্যান ও জপে প্রায় নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন।

এই সাধকমণ্ডলীর মধ্যে গোপাল (অদ্বৈতানন্দ স্বামী) বয়সে প্রৌঢ় ছিলেন। ইনি পূর্ব্বে চিনাবাজারে বেণী পালের দোকানে কাজ করিতেন। স্ত্রীবিয়োগের পর সংসারত্যাগ করিয়া সাধন ভজনে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বেণী পালের বাড়ীতে ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে ইনি ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন। তাঁহাকে দেখিয়াই গোপাল তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিলেন যে ইনি তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে একজন। গোপাল নাম একাধিক থাকাতে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে তাঁহার নাম ছিল "বুড়ো" গোপাল। ঠাকুর পীড়িত হইয়া কাশীপুরে অবস্থান করিবার সময় গোপাল হিমালয়ের দুর্গম সুপবিত্র তীর্থ শ্রীকেদারনাথ ও শ্রীবদ্রীনারায়ণ দর্শন করিয়া আসেন এবং তদুপলক্ষে ঠাকুরের নিকট সাধু ভোজনাদি করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলেন, "কোথায় সাধু খুঁজবি এখানেই সব রয়েছে—এই ছোকরাদের খাওয়ালেই হবে।" গোপাল তাহাই করিলেন এবং তৎসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ ও ইঙ্গিত মত মালাচন্দন ও কয়েকখানি গেরুয়া বস্ত্র আনিয়া ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া দেন। ঠাকুর তাঁহার অন্তরঙ্গ কামকাঞ্চন-ত্যাগী শুদ্ধ যুবক ভক্তদিগকে স্বহস্তে একে একে সেই গৈরিক বসনগুলি দান করেন। সেই যুবকদের নাম—নরেন্দ্র, রাখাল,

যোগীন্দ্র, বাবুরাম, নিরঞ্জন, তারক, শরৎ, শশী, গোপাল, কালী, ও লাটু। উদ্বৃত্ত একটী গেরুয়া বস্ত্র তাঁহার নিকটে রাখিয়া দিলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলে তাঁহাকে উহা দান করেন।

এক অপূর্ব্ব আনন্দ প্রবাহের ভিতর দিয়া ঠাকুর ইঁহাদিগকে বৈরাগ্যের অমৃতময় পথে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর শুধু বাহ্যিক শাস্ত্রীয় রীতিনীতি পালনে ইঁহাদিগকে তিনি অনুপ্রাণিত করেন নাই,—অন্তরে প্রেম ও বৈরাগ্যের দী বহ্নি জ্বালিয়া দিয়াছিলেন। বরং কাহারও ভিতর সে ভাবের অণুমাত্র ব্যতিক্রম দেখিলে তাঁহাকে প্রকাশ্যেই বলিতেন, "ওকি, শুক্‌নো সাধু হবি কেন?" বৈরাগ্যকে তিনি আনন্দমণ্ডিত করিয়াছিলেন। সেই সদানন্দ পুরুষ তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যদিগকে একটি আনন্দময় মূর্ত্তিরূপে গড়িয়া তুলিলেন। "রসে বসেই" থাকিতে বলিতেন এবং তজ্জন্যই সংস্কারযুগে এই ইংরাজী শিক্ষিত ব্রাহ্মভাবাপন্ন নবযুবকের দল তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার বাণী ও সাধনা সহজে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মধুরোজ্জ্বল জীবনের আলোকসম্পাতে শাস্ত্রাদির প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাইতে তাঁহারা বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। বাস্তবিকই ঠাকুরের নিকট যখন তাঁহারা যে স্থানেই অবস্থান করিতেন, তখন তাঁহাদের মনে হইত উহা যেন সাক্ষাৎ আনন্দধাম। এই আনন্দের ভিতর দিয়াই ঠাকুর তাঁহাদের জন্মজন্মার্জ্জিত সংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে আনন্দরাজ্যে বিচরণ করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে সাধুদের ভিতর এই আনন্দের

একটা বিশিষ্টরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাখাল এই আনন্দময় ভাবের এক পূর্ণমূর্ত্তি ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মানসসন্তানের আধ্যাত্মিক রূপের সৌন্দর্য্য আনন্দধারায় ঝরিয়া পড়িত। বলিতে গেলে রাখালের এই আনন্দময় আধ্যাত্মিকতাই ছিল তাঁহার বিমল বাহ্য সৌন্দর্য্যের একটা স্বতঃপ্রকাশ।

ঠাকুর বলিতেন, "সংসারীদের সম্মুখে কেবল দুঃখের কথা ভাল নয়।" আনন্দ চাই। রাখাল ইহা শুনিয়াছিলেন ও দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। উত্তরকালে তিনি সকলকেই হাস্যকৌতুকাদি নানা প্রসঙ্গের মধ্যে ভগবৎতত্ত্ব ও সাধনার ইঙ্গিত দিয়া আগন্তুকদের চিত্তে একটা অনৈসর্গিক আনন্দের আস্বাদ দিতেন। ইহা তাঁহার চরিত্র মাধুর্য্যের একটা বিশেষত্ব ছিল।

গেরুয়া বস্ত্র দানের পর ঠাকুর তাঁহার ত্যাগী অন্তরঙ্গ ভক্তদের মাঝে মাঝে ভিক্ষা করিতে পাঠাইতেন এবং স্বয়ং সে ভিক্ষান্ন আস্বাদ করিতেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিতেন, "ভিক্ষান্ন অতি শুদ্ধ অন্ন।" এই প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ লাটুমহারাজ বলিয়াছেন, "ঠাকুর আমাকে আর রাখাল মহারাজকে ভিক্ষা করতে বলতেন। তিনি প্রায়ই আমাদের নিকট বলতেন, 'ওরে, ভিক্ষান্ন বড় পবিত্র।' আমি আর রাখাল মহারাজ একদিন ভিক্ষা করতে গেলাম। যাবার সময় ঠাকুর বলে দিলেন, 'কেউ গাল দেবে, আবার কেউ আশীর্ব্বাদ করবে, হয়ত আবার কেউ পয়সাও দেবে, তোরা সব নিবি'।" ভিক্ষায় তাঁহারা সেদিন অনেক চাউল, ডাল ও পয়সা পাইলেন। ভিক্ষার্জ্জিত দ্রব্যগুলি তাঁহারা ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। আনন্দময় পুরুষ আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোরা

কেমন করে ভিক্ষা করলি বল।" তাঁহাদের নিকট সমুদায় বিবরণ শুনিয়া তিনি ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যগুলি লইয়া রন্ধন করিতে বলিলেন। পরে পরমতৃপ্তি ও আনন্দ সহকারে তিনি সেই ভিক্ষান্নের আস্বাদ স্বয়ং গ্রহণ করিলেন।

সাধনভজনে কাহারও রোখ না দেখিলে ঠাকুর তাঁহাকে "ম্যাদাটে" বলিতেন। এই "ম্যাদাটে" ভাব তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। রাখাল ও নরেন্দ্রকে তিনি পুরুষ বা ব্যাটাছেলে বলিয়া উল্লেখ করিতেন। কাশীপুরের উদ্যানে তিনি অসুস্থ অবস্থাতেও নানা ভাবে তাঁহার অন্তরঙ্গ ত্যাগী সাধকদলকে শিক্ষা দিতেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। ইহাতে তাঁহাদের প্রত্যেকের চরিত্র একটা সংহত ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া গড়িয়া উঠিতে লাগিল। ইঁহাদের একদিকে ত্যাগ, বৈরাগ্য, তপস্যা, সংযম ও পবিত্রতা, অপরদিকে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, সেবা, ভক্তি ও প্রেম পরস্পর মিলিত হইয়া অপূ মাধুর্য্যের বিকাশ করিল। সমগ্র উদ্যানবাড়ীটী যেন আধ্যাত্মিকতার আবেষ্টনে পরিবেষ্টিত থাকিত। রাখাল প্রভৃতি ত্যাগী অন্তরঙ্গেরা অমৃত পথের যাত্রী হইয়া স্থানটীকে পবিত্র তপোভূমি করিয়া রাখিতেন।

এই সময়ে অকস্মাৎ একদিন নরেন্দ্রনাথ তাঁহার দুইজন গুরুভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরকে না বলিয়াই গোপনে বুদ্ধগয়ায় চলিয়া গেলেন। ত্যাগী ভক্তদের মধ্যে কাহার কাহারও মনে পূর্ব্ব হইতেই তীর্থ ভ্রমণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল—নরেন্দ্রনাথকে যাইতে দেখিয়া তাঁহারা অনেকেই পশ্চিম প্রদেশে যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ সত্য সত্যই শ্রীক্ষেত্র

ও গঙ্গাসাগর দর্শনে গিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাতে কাহাকেও বাধা দিতেন না। ভক্তদের নিকট একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "আচ্ছা, ছোকরাদের একি হচ্চে বল দেখি? কেউ শ্রীক্ষেত্রে, কেউ গঙ্গাসাগরে।"

ঠাকুরের ত্যাগী অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে একে একে অনেকেই তীর্থ পর্য্যটনে চলিয়া যাইতেছেন কিন্তু রাখাল অবিচলিত চিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া রহিয়াছেন। কোন চঞ্চলতা বা ভাববিলাসিতা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। কঠোর বৈরাগ্য বা তপস্যার প্রলোভন তাঁহাকে চঞ্চল বা উন্মত্ত করিয়া তুলিতে পারে নাই। তিনি সর্ব্বদাই স্থির, ধীর, গম্ভীর ও তন্ময়। শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁহার সর্ব্বতীর্থের সার—সর্ব্বপ্রকার বৈরাগ্য ও তপস্যার অমৃত ফল, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রয় এবং পরম ধাম। শ্রীরামকৃষ্ণই সর্ব্বশক্তির আধার—স্বয়ং মহাশক্তি। এই সুদৃঢ়ভাব হইতে রাখাল কখন বিন্দুমাত্র বিচলিত বা চঞ্চল হন নাই। স্বভাবতঃই তিনি বালকের মত কোমল প্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু এই দিব্য বালক নিজভাবে অটল অচল ও সুমেরুবৎ অবিচলিত থাকিতেন। কাশীপুর উদ্যানে তাঁহার এই স্বতন্ত্র রূপ বিকাশ পাইতেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাই তাঁহার ধ্যান জ্ঞান ও প্রাণ। বৈরাগ্যের উচ্ছ্বাসে তাঁহার গুরুভ্রাতারা চঞ্চল হইয়া ঠাকুরের এই রোগ বৃদ্ধিকালে সেবা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেছেন ইহাই তাঁহার মর্ম্মান্তিক দুঃখ। অবশেষে যখন নরেন্দ্রনাথ অকস্মাৎ দুইজন গুরুভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া গোপনে গয়াধামে চলিয়া যান তখন রাখাল ব্যস্ত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

সেবকসংখ্যার অল্পতায় ও নরেন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে পাছে ঠাকুরের যথারীতি চিকিৎসা সেবা, যত্ন ও শুশ্রূষার কোন ত্রুটী ঘটে ইহাই তাঁহার চিন্তার কারণ হইল। একদিন তিনি ঠাকুরের নিকট তাঁহার মনের কথা বলিয়া ফেলিলেন। ঠাকুর সব শুনিয়া বিশেষ নরেন্দ্রনাথসম্বন্ধে তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, "কেন ভাবছিস্? কোথায় যাবে সে? কদিন বাইরে থাকতে পারবে? দেখ না, এল বলে!" তারপর হাসিতে হাসিতে ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন,"চার খুঁট ঘুরে আয়, দেখবি কোথাও কিছু নেই"। পরে নিজের বুকে হাত দিয়া বলিলেন, "যা কিছু আছে—সব এইখানে।"

ইহা শুনিয়া রাখালের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। তিনি এতদিন গোপনে অনুভূতি ও দর্শনাদিতে ঠাকুরের যে স্বরূপ তত্ত্ব বোধ করিতেছিলেন, অহরহ যে ভাবে তিনি তন্ময় হইয়া আছেন, এ যে ঠাকুর তাঁহার শ্রীমুখে তাহাই প্রকাশ করিতেছেন! রাখালের অন্তরের আনন্দ বাহিরে উথলিয়া পড়িল। তিনি বিভোর হইয়া ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বাস্তবিক ইহার দুই চারি দিন পরে নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই একে একে কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে উপনীত হইলেন। বাহিরে গিয়া তাঁহারা কেহ শান্তি পাইলেন না।

সাধন ভজন করিতে করিতে ঠাকুর সম্বন্ধে রাখালের এক নূতন জ্ঞাননেত্রের উন্মেষ হইল। তিনি উপলব্ধি করিলেন রামকৃষ্ণ জগদ্‌গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অনন্ত প্রেম অনন্ত ধারায় জগতের হিতকল্পে বিলাইতেছেন। একদিন রাখাল ঠাকুরের

সম্মুখেই উপবিষ্ট ভক্তদের নিকট নিজ মনোভাব সরল ভাবে স্পষ্টরূপে বলিয়াছিলেন, "উনি কৃপা করে জানিয়ে দিয়েছেন 'মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু!' উনি কি কেবল আমাদের জন্যই এসেছেন?"

রাখাল নরেন্দ্রনাথের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার ঈদৃশ মনোভাব অকপটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাহাতে কোন প্রতিবাদ করা দূরে থাক বরং জ্বলন্ত উৎসাহপূর্ণ বাক্যে উহা অনুমোদন করিলেন! বিভোর ভাবে নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার নিজ জীবনের অনুভূতি তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে রাখাল বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। একদিন নরেন্দ্রের সম্মুখেই তিনি আনন্দে শ্রীরামকৃষ্ণকে সব জানাইয়া বলিলেন, "এখন নরেন্দ্র আপনাকে খুব বুঝছে।" তাহাতে তিনি মৃদুমধুর হাসিয়া বলিলেন, "আবার দেখছি অনেকে বুঝছে।" তখন শ্রীযুত মাষ্টার মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর রাখালের দিকে চাহিয়া ইঙ্গিতে নরেন্দ্র ও মাষ্টার মহাশয়কে দেখাইলেন। রাখাল হাসিয়া ঠাকুরকে বলিলেন, "আপনি বলছেন নরেন্দ্রের বীরভাব আর মাষ্টার মশায়ের সখীভাব?" শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আমার কি ভাব?" নরেন্দ্র ঠাকুরকে সর্ব্ব ভাবের আধার বলিয়া দেখিতেন—তাই স্পষ্টভাবে উত্তর করিলেন "বীরভাব, সখীভাব—সব ভাব।" নরেন্দ্রের কথা শুনিয়া ঠাকুর নিজের বুকে হাত দিয়া বলিলেন, "দেখছি, এর ভিতর যা কিছু।" উপস্থিত সকলে এই কথা শুনিয়া নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ঠাকুর তখন ইসারা করিয়া নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বুঝলি?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "যত সৃষ্ট পদার্থ সব আপনার ভিতর

থেকে।” ঠাকুর আনন্দোৎফুল্ল বদনে রাখালের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, “দেখছিস! কেমন বুঝছে?” আধ্যাত্মিক স্তরে কাহার কি ভাব এবং কে কেমন তাঁহাকে বুঝিতে পারিতেছে তাহা যেন ঠাকুর তাঁহার এই মানসপুত্রকে ইঙ্গিতে বলিতেছেন। উপলব্ধির কোন্ উচ্চ স্তরে আরোহণ করিলে এই প্রকার অস্ফুট ইসারা চলে তাহার মর্ম্ম কে বুঝিবে?

নরেন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণ গান গাহিতে বলিলে তিনি তখন মোহ-মুদ্গর হইতে বৈরাগ্যসূচক শ্লোক সুর করিয়া আবৃত্তি করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন রামানন্দকে বলিয়াছিলেন, “এহ বাহ্য,আগে কহ আর।” তেমনি ঠাকুর তাঁহাকে জানাইলেন, “এই সব ভাব অতি সামান্য।” দিব্যভাবাপন্ন ঠাকুর তখন পরিপূর্ণ প্রেমের আস্বাদনে ভরপুর হইয়া আছেন—নরেন্দ্র ইহা বুঝিয়া কৃষ্ণবিরহিণী ব্রজগোপীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া গাহিলেন,

কাহে সই জিয়ত মরত কি বিধান?
ব্রজ কি কিশোর সই   কাঁহা গেল ভাগই
ব্রজজন টুটায়ল পরাণ॥

নরেন্দ্র দেবদুর্লভ কণ্ঠে প্রেমোন্মত্ত ভাবে যখন ইহা গাহিলেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণ ও রাখালের নয়ন হইতে প্রেমাশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে! নরেন্দ্রও রাধাভাবে উদ্দীপিত হইয়া আবার গাহিলেন—“তুমি আমার, আমার বঁধু।” শ্রীরামকৃষ্ণের সন্নিধানে বসিয়া প্রেমবিহ্বলচিত্তে প্রেমবিগলিত অশ্রুধারায় প্লাবিত হইয়া নির্ব্বাকভাবে রাখাল ব্রজের এই প্রেম মাধুর্য্যের রস আস্বাদন করিতে লাগিলেন।

কাশীপুরের উদ্যানে রাখালের হৃদয়ের প্রসারতা, গভীরতা

ও উদারতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার এই ভাবের বিকাশ ও বিস্তার। যে যেভাবেই হউক শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ থাকিলেই জীবের মঙ্গল হইবে—এই সম্বন্ধে তাঁহার কোন সংশয় ছিল না। দক্ষিণেশ্বরে)যুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সহিত একবার একজন স্ত্রীলোক আসিয়াছিল। সে মাঝে মাঝে তথায় ঠাকুরকে ব্রহ্মসঙ্গীত ও শ্যামা বিষয়ক গান শুনাইয়া যাইত। তাহার অস্বাভাবিক চাল চলন দেখিয়া সকলে তাহাকে পাগলী বলিয়া ডাকিত। একদিন সেই পাগলী ঠাকুরের ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া পাগলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কাঁদছিস্?" উত্তরে সে বলিল, "মাথা ব্যথা করছে।" আবার অন্যদিন ঠাকুর আহারে বসিয়াছেন তখন পাগলী হঠাৎ আসিয়া বলিল, "আমায় দয়া কর্ল্লেন না—মনে ঠেল্লেন কেন?" ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর কি ভাব?" পাগলী উত্তরে বলিল, "মধুর ভাব।" শ্রীরামকৃষ্ণ অমনি বলিয়া উঠিলেন, "সব মেয়েরা যে আমার মা।" কাশীপুর উদ্যানে এই পাগলী ঠাকুরের নিকটে যাইবে বলিয়া প্রায়ই নানারূপ উপদ্রব করিত। তাঁহার ত্যাগী যুবক অন্তরঙ্গেরা উক্ত পাগলীকে দেখিলেই বিরক্ত হইতেন। তাঁহারা ধমক বা প্রহারের ভয় দেখাইয়া অতিকষ্টে উদ্যান হইতে তাহাকে বাহির করিয়া দিতেন। একদিন শ্রীযুত শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) পাগলীর কথা উল্লেখ করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে রাখালকে বলিলেন, "এবার পাগলী এলে ধাক্কা মেরে তাড়াতে হবে।" অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু ঠাকুর অমনি ইসারায়

বলিলেন, "না—না, সে আসবে আর দেখে চলে যাবে।" পাগলী যে ভাবেই হউক দিনরাত ঠাকুরের চিন্তা করিতেছে, সকলের নিকট গালাগালি, লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিয়াও তাঁহার নিকটে আসিতে চাহিতেছে, ইহাই স্মরণ করিয়া রাখালের মন দ্রব হইতেছিল। যে যেভাবেই হউক ঠাকুরের চিন্তা করিলে তাহার মঙ্গল নিশ্চয় এই দৃঢ় ধারণায় পাগলীর প্রতি রাখালের মনে অনুকম্পা জাগিয়া উঠিল। তাই শশীকে সম্বোধন করিয়া তিনি ঠাকুরের আদেশ শুনাইলেন। শশী তাহাতে বলিলেন, "কিন্তু অসুখের সময় কেন? আর ওরকম উপদ্রব?" রাখাল প্রেমার্দ্র হৃদয়ে শশীকে বলিলেন, "উপদ্রব সব্বাই করে। সকলেই কি খাঁটি হয়ে ওঁর কাছে এসেছে? ওঁকে আমরা কষ্ট দিই নাই?" বলিতে বলিতে রাখালের পূর্ব্বস্মৃতি উদিত হইল। তাঁহার কাছে কত মান, অভিমান, ক্ষোভ ও আব্দার করিয়াছেন! ঠাকুর সব উপেক্ষা করিয়া, সব সহ্য করিয়া, প্রেমের অমৃতনিষেকে তাঁহাকে সিক্ত করিয়াছেন! শুধু কি একা তিনি? ঠাকুর যাঁহাকে সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি বলেন, যিনি জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, বিদ্যায় ও তেজস্বিতায় অতুলনীয়, তিনি এক সময়ে ঠাকুরের সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়া কত বিরক্ত করিয়াছেন, পাগলী তো সামান্যা বিকৃত-মস্তিষ্ক নারী! সে যে উপদ্রব করিবে ইহা আর আশ্চর্য্য কি? ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ন্যায় প্রবীণ মনস্বী ব্যক্তি ঠাকুরকে কত কি বলিয়া থাকেন তাই ব্যথিত হৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণগত-প্রাণ রাখাল প্রেমার্দ্রহৃদয়ে বলিলেন, "উপদ্রব সব্বাই করে। সকলেই কি খাঁটি হয়ে ওঁর কাছে এসেছে? ওঁকে আমরা কষ্ট দিই নাই? নরেন্দ্র টরেন্দ্র আগে কি রকম ছিল—কত তর্ক করতো?" ডাক্তার

সরকার কত কি ওঁকে বলেছে ! ধরতে গেলে কেহই নির্দ্দোষ নয় !” শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালের এই প্রেমবিগলিত বাক্য শুনিয়া আনন্দপ্রকাশ করিলেন। পাগলীর কথা পুনরায় উত্থাপন করিয়া রাখাল বলিতেছেন, দুঃখ হয় যে সে উপদ্রব করে, আর তার জন্য অনেকে কষ্টও পায়।”

এইরূপ প্রেমে, আনন্দে, সেবায় এবং নিয়তসাধন ভজনে রাখাল এক অপূর্ব্ব উদার প্রেম দৃষ্টিতে সকলকে নিরন্তর নিরীক্ষণ করিতেন। তাঁহার ঈশ্বরলুব্ধ চিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ও তাঁহার প্রেমমূর্ত্তি দিন দিন দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইতে লাগিল। ঠাকুর তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদের সম্বন্ধে বলিতেন, “আমি কে, আর ওরা কে, এই জানলেই হল।” কাশীপুর উদ্যানে তাঁহাদের মধ্যে এই তত্ত্বই দিন দিন স্ফুরিত হইয়া উঠিল। দক্ষিণেশ্বরে যাহা বীজাকারে অন্তরঙ্গদের মধ্যে ছিল, কাশীপুর উদ্যানে তাহা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। অলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদদের লইয়া একটী মহাশক্তির সঙ্ঘ ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। যে প্রেম সূত্রে ইঁহারা পরস্পর আনন্দে আবদ্ধ হইতেছেন—সেই প্রেম সূত্রই শ্রীরামকৃষ্ণ। একদিন নরেন্দ্রনাথ তাঁহার গুরুভ্রাতাদের নিকট প্রসঙ্গক্রমে রাখালের কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন, “আজ থেকে আমরা রাখালকে ‘রাজা’ বলে ডাকব।” তাঁহার প্রতি ঠাকুরের আদর ও স্নেহবাৎসল্য স্মরণ করিয়া নরেন্দ্রের প্রস্তাব সকলেই পরমানন্দে অনুমোদন করিলেন। ক্রমে এই কথা ঠাকুরের কানেও উঠিল, তিনি শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ সহকারে নরেন্দ্রপ্রমুখ অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে বলিলেন, “রাখালের ঠিক নাম হয়েছে।” ইহাই তাঁহার ভাবী সঙ্ঘনায়কত্বের পূর্ব্বাভাস।

এইরূপ আনন্দ প্রবাহের মধ্যে কিন্তু ঠাকুরের রোগ-যন্ত্রণা

দেখিলে সহসা তাঁহাদের চিত্ত বিষাদে ভরিয়া উঠিত। সব আনন্দ আহ্লাদ নিমিষে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইত !

যাঁহার জন্য, যাঁহার আশ্রয়ে, যাঁহার কৃপায় পরম পুরুষার্থ লাভের প্রত্যাশায়, তাঁহারা ঘর সংসার আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, যাঁহার দিব্যসঙ্গলাভে, অনাবিল অপার্থিব স্নেহে এবং অলৌকিক শক্তিতে তাঁহারা ইহজগতে দুর্লভ পরম আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন, যাঁহার অভয়বাণী তাঁহাদের সকল সংশয় দূর করিয়া দিতেছে, যাঁহার অলোকসামান্য জীবন দিব্য অনুভূতির আলোক সম্পাত করিয়া অমৃতের পথে তাঁহাদিগকে লইয়া যাইতেছে, আজ রোগশয্যায় তাঁহার ভীষণ যন্ত্রণা দেখিয়া নিমিষে সকল আনন্দ অন্তর্হিত হইয়া গভীর দুঃখে তাঁহাদের হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সকল প্রকার চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষাদি সত্ত্বেও তিলে তিলে দিন দিন তাঁহাদের সম্মুখেই ঠাকুরের দেহ ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, অথচ সদানন্দ পুরুষ অপূর্ব্ব অমৃতরসে এবং প্রেমের গভীর তরঙ্গে তাঁহাদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়াছেন ! যেন যন্ত্রপুত্তলিকার মত তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহারা চালিত হইতেছেন।

ধীরে ধীরে কালপূর্ণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু ত্যাগ বৈরাগ্যের অমৃতদীপ্তিতে অশ্রুতপূর্ব্ব, কঠোর সাধনায় ও মহাশক্তির আহ্বানে যে পবিত্র হোমানল তিনি প্রজ্বলিত করিলেন—তাঁহার ত্যাগী সন্তানের দল তাহা ঘিরিয়া বসিয়া রহিলেন। নরেন্দ্র রাখাল প্রমুখ অন্তরঙ্গেরা দিব্যমন্ত্রে মুখরিত করিয়া দিকসমূহ ধ্বনিত, উদ্ভাসিত ও পুণ্যগন্ধে আমোদিত করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

বরাহনগর মঠে

শ্রীরামকৃষ্ণের বিরহে ত্যাগী ভক্তমণ্ডলী দারুণ শোকে ম্রিয়মাণ। কেহ স্তব্ধ ও মৌন, কেহ আবিষ্ট ও মুখর, কেহ গম্ভীর ও চিন্তামগ্ন, কেহ ব্যাকুল ও চঞ্চল, কেহ রুদ্ধাশ্রু ও সজলচক্ষু, কেহ উগ্র ও শুষ্ক, কেহ ধ্যানস্তিমিত ও উদাস, কেহ বিবশ ও বিবর্ণ, কেহ শান্ত ও সংযত এবং কেহ ত্রস্ত ও অবসন্ন। ইঁহারা যেন কোন প্রকারে প্রাণহীন দেহ ধারণ করিয়া আছেন।

নরেন্দ্র রাখাল প্রমুখ ত্যাগী ও অনুরাগী গৃহস্থ ভক্তগণ কাশীপুরের উদ্যানে সম্মিলিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যকথা আলোচনা করিতেন। তাঁহার পুণ্যস্মৃতির স্মরণ, মনন এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে সেবাই তাঁহাদের বিরহতপ্ত হৃদয়ে এখন একমাত্র সুস্নিগ্ধ শান্তিবারি। কিন্তু এই দুঃসহ বিরহের মধ্যে একটী সমস্যার চিন্তায় ভক্তদের মন আলোড়িত হইতে লাগিল—ততঃ কিম, তারপর ?

সমস্যাটি এই যে মাসের অবশিষ্ট কয়েকদিন উত্তীর্ণ হইলে যখন কাশীপুরের সেই উদ্যানবাড়ী ছাড়িয়া দিতে হইবে, তখন শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি এবং তাঁহার পবিত্র ভস্মাস্থিপূর্ণ তাম্রকৌটা কোথায় রক্ষা করা যাইবে ? অনেক পরামর্শ ও আলোচনার পর ইহার শেষ মীমাংসা হইল যে আপাততঃ পরমভক্ত শ্রীযুক্ত বলরামের গৃহে ইহা রক্ষিত হইবে। ভস্মাবশেষের কিয়দংশ কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে সমাধিমন্দিরে স্থাপিত হইয়াছিল। নরেন্দ্র

শরত ও শশী প্রভৃতি কেহ কেহ স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেলেন। যোগীন, কালী ও লাটু শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সহিত শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। কয়েকদিন পরে তারক ও (শিবানন্দ) একাকী তথায় চলিয়া যান। রাখাল বলরামের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাখালকে যত্ন করিতে ও তাঁহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে ঠাকুর শ্রীযুত বলরামকে আদেশ করিয়াছিলেন।

রাখালের প্রশান্ত গম্ভীর হৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতির তরঙ্গে অহর্নিশি আলোড়িত হইত। তাঁহার মনে পড়িত কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমঘন মূর্ত্তি, তাঁহার অলৌকিক দিব্যলীলা, তাঁহার অপার করুণা ও অগাধ স্নেহ, তাঁহার অদ্ভুত পবিত্রতা ও অপূর্ব্ব প্রেমবিহ্বলতা এবং তাঁহার অশ্রুতপূর্ব্ব বিচিত্র মুহু র্মুহুঃ সমাধি ও অতীন্দ্রিয় আনন্দের অনন্তপ্রবাহ! তাঁহার অলৌকিক দিব্যসঙ্গে ও দিব্যস্পর্শে সেই অনন্ত আনন্দের অমৃতবিন্দু যে রাখালের হৃদয়ে কানায় কানায় ভরিয়া আছে। রাখাল অনন্যমনে তন্ময়চিত্তে তাহা স্মরণ করিয়া নির্জ্জনে নির্ব্বাক ও নিষ্পন্দ হইয়া থাকিতেন।

গৃহে নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের বিরহে ব্যাকুল ও গম্ভীর। তাঁহার একমাত্র চিন্তা কি উপায়ে ঠাকুরের ত্যাগী অন্তরঙ্গ সন্তানেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে একস্থানে বাস করিতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রদর্শিত সনাতন সত্য ও তাঁহার মহান্ আদর্শজীবন যাহাতে তাঁহাদের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া জগতের দ্বারে দ্বারে প্রচারিত হইতে পারে ইহাই এখন তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। ঠাকুর স্বয়ং যে তাঁহার উপর সমুদায় ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি

দিবারাত্র এই চিন্তায় বিভোর হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়ে এক অচিন্তিতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল।

ঠাকুরের পরম অনুরক্ত ভক্ত শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় আফিস হইতে প্রত্যাগত হইয়া সন্ধ্যাকালে একদিন তাঁহার ঠাকুর ঘরে বসিয়া পূজা করিতেছিলেন এমন সময়ে তাঁহার এক অদ্ভুত দিব্যদর্শন হইল। তিনি দেখিলেন অকস্মাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুই করছিস কি? আমার ছেলেরা সব পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তার আগে একটা ব্যবস্থা কর।" ইহা বলিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইলেন। ইহা শুনিয়া সুরেন্দ্র অমনি নরেন্দ্রনাথের নিকট উন্মত্তভাবে ছুটিয়া গেলেন। ইঁহারা এক পল্লীতেই বাস করিতেন। অশ্রুধারায় সিক্ত হইয়া সুরেন্দ্র নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার এই দিব্যদর্শনের সমুদায় বৃত্তান্ত বলিয়া অবশেষে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "ভাই, একটা আস্তানা ঠিক কর, যেখানে ঠাকুরের ছবি ভস্মাস্থি আর তাঁর ব্যবহৃত জিনিষগুলি রেখে রীতিমত পূজার্চ্চনা চলতে পারে। যেখানে তোমরা কামকাঞ্চনত্যাগী ভক্তেরা একজায়গায় থাকতে পার। মাঝে মাঝে আমরা গিয়ে সেখানে জুড়ুতে পারব। আমি কাশী-পুরে মাসে মাসে যে টাকা দিতাম, এখনও তাই দেব।" নরেন্দ্র-নাথও ইহা শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া সজলনয়নে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

পরদিন হইতেই নরেন্দ্রনাথ কাশীপুর বরাহনগর অঞ্চলে বাড়ীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে বরাহনগরে মুন্সীবাবুদের গঙ্গাতীরের সন্নিকটে একটা পুরাতন জীর্ণ বাগান-

বাড়ী মাসিক এগার টাকা ভাড়ায় স্থির হইল। তারক (শিবানন্দ স্বামিজী) তখন বৃন্দাবন হইয়া কাশীধামে অবস্থান করিতেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ আসিবার জন্ম তার করিয়া দিলেন। পরদিন যখন নরেন্দ্রনাথ রাখালের সহিত পরামর্শ করিয়া সব বন্দোবস্ত করিবার জন্ম শ্রীযুত বলরামের গৃহে গিয়াছিলেন তখন তারকও ষ্টেশন হইতে গাড়ী করিয়া তথায় উপনীত হইলেন। সেই গাড়ীতেই নরেন্দ্রনাথ রাখাল ও তারক প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া বরাহনগরের ভাড়াটীয়া বাড়ীতে চলিয়া যান। ইহাই মঠ প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত।

বরাহনগরের একটী ভগ্নজীর্ণ বাড়ীতেই শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সর্ব্বপ্রথম মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই গৃহের কক্ষে কক্ষে নরেন্দ্র ও রাখাল প্রমুখ ত্যাগী অন্তরঙ্গ সন্তানদের কঠোর তপস্যা ও অদ্ভুত সাধনার স্মৃতিকাহিনী অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। বাংলাদেশে পূতসলিলা ভাগীরথী তীরে দক্ষিণেশ্বরে জগতের সুপ্ত প্রাণশক্তির প্রথম জাগরণ ও আধ্যাত্মিক জ্যোতির স্ফূরণ হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীমূলে শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরে ও কাশীপুর উদ্যানে মহাশক্তির স্পন্দনে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ত্যাগী সন্তানদের হৃদয়ে যে বিদ্যুদ্বাহী অগ্নিকণার সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহাই দীপ্ত হইয়া উঠিল বরাহনগরের এই জীর্ণ গৃহে। দিন নাই, রাত্রি নাই, আহার নাই, আলস্য নাই, ক্লান্তি বা অবসাদ নাই সকলেই সেই অমৃতের পথে অনন্তের সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া চলিয়াছেন। কি যেন এক প্রবল উন্মাদনা, অদম্য উৎসাহ, অটল দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রেম ও বিশ্বাস তাঁহাদের প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি কার্য্যে এবং প্রতি চিন্তায় প্রকাশ পাইতেছিল। এক অদৃশ্য মহাশক্তির ইঙ্গিতে, প্রেরণায় ও আকর্ষণে নরেন্দ্র, রাখাল, শরত,

শশী, বাবুরাম, যোগীন, নিরঞ্জন, গোপাল, কালী, লাটু, সারদাপ্রসন্ন, সুবোধ, গঙ্গাধর ও হরি আসিয়া ক্রমে ক্রমে এই মঠে সকলে একত্রিত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই ত্যাগী সন্তানমণ্ডলীর প্রাণস্বরূপ ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে সকলে সাধন ভজন শাস্ত্রপাঠ ও ভগবদ্ প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেন। কিন্তু তিনি মঠ পরিচালনার ভার দিয়াছিলেন রাখালের উপর। মঠের বন্দোবস্ত বা নিয়মিত পরিচালনায় কোন দোষ বা ত্রুটী দেখিলে তাঁহাকেই দায়ী করিতেন। রাখালের প্রতি নরেন্দ্রনাথের শুধু কেবল মাত্র বন্ধুপ্রীতি বা গুরুভ্রাতার আকর্ষণ ছিল না;—তাঁহার অন্তরে ছিল রাখালের উপর একটা সসম্মান দৃষ্টি, অগাধ বিশ্বাস ও অসীম প্রাণঢালা ভালবাসা। নরেন্দ্রের প্রতি রাখালেরও সেইরূপ গভীর শ্রদ্ধা, অশেষ প্রীতি এবং প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। ইহার মূলে ছিল তাঁহাদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধ, তাঁহার আচরণ এবং তাঁহাদের স্বরূপ পরিচয়ের বাণী।

নরেন্দ্রের পবিত্রসঙ্গ ও তাঁহার প্রাণস্পর্শী আলাপ আলোচনা এবং তাঁহার সর্ব্বদা উদ্দীপনাময় বাক্য রাখালের হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হইত। মঠ হইতে একবার কোন গুরুভ্রাতাকে তপস্যার জন্য অন্যত্র চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "কোথায় ছুটে ছুটে বেরিয়ে যাস! এখানে সাধুসঙ্গ, এ ছেড়ে যেতে আছে? আর নরেনের মত লোকের সঙ্গ। এ ছেড়ে কোথায় যাবি?" বাস্তবিকই জ্বলন্ত বৈরাগ্যমূর্ত্তি নরেন্দ্রনাথ তাঁহার গুরুভ্রাতাদিগকে এক অপূর্ব্ব ভাবের প্রেরণায় প্রদীপ্ত করিয়া

রাখিতেন। রাখালও তাঁহার তন্ময় গভীর ভাবে এবং স্বাভাবিক মধুর চরিত্র ও সুমিষ্ট ভাষায় সাধন ভজনের জন্য সকলের মধ্যে উৎসাহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিতেন।

কিছুদিন পরে বাবুরামের মাতা ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদিগকে আঁটপুরে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। বাবুরাম বলরামবাবুর গৃহে নরেন্দ্রনাথকে উহা জানাইলেন। নরেন্দ্রনাথ দিন ও সময় স্থির করিয়া শরত প্রমুখ গুরুভ্রাতাদিগকে আঁটপুরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতে বলিলেন। মঠ হইতে তাঁহারা অনেকেই আসিলেন কিন্তু তন্ময়চিত্ত রাখাল তাঁহাদের সঙ্গী হন নাই। নরেন্দ্র প্রমুখ সকলেই পথে গীতবাদ্য ও হাস্য কৌতুক করিতে করিতে আঁটপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন। আঁটপুর গ্রামে বাবুরামের জন্মভূমি ও পৈতৃক বাসভবন—তাই সকলে মহা উৎসাহে আনন্দে মগ্ন হইলেন। বাবুরাম শ্রীরামকৃষ্ণের পরম স্নেহাস্পদ ত্যাগী সন্তান। ঠাকুর ইঁহাকে দেবী-অংশসম্ভূত ও ঈশ্বরকোটী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। বাবুরামের অপূর্ব্ব পবিত্রতার কথা উল্লেখ করিয়া ঠাকুর বলিতেন যে, "বাবুরামের হাড় পর্য্যন্ত শুদ্ধ।" ঠাকুরের ভাব ও সমাধি অবস্থায় রাখাল ও বাবুরাম ছাড়া অপর কাহাকেও তিনি স্পর্শ করিতে দিতে পারিতেন না। আজ এই সর্ব্বত্যাগী, পরম-পবিত্র, ঠাকুরের বিশেষ অন্তরঙ্গ পার্ষদের জন্মভূমি ও তাঁহার পৈতৃক বাস ভবনে আসিয়া তাঁহার ত্যাগী গুরুভ্রাতারা পরম উৎফুল্ল ও আনন্দিত হইবেন, তাহা আর বিচিত্র কি?

আঁটপুরে এই বাড়ীর উদ্যানে কোন বৃক্ষমূলে একটী ধুনি জ্বালা হইত। সেই ধুনির চারিদিকে এই ত্যাগীর দল অধিকাংশ সময়ে

বসিতেন। সেখানে শাস্ত্রপাঠ, আলোচনা এবং মহাপুরুষদের অলৌকিক জীবনকাহিনী লইয়া নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইত। একদিন নরেন্দ্রনাথ ধুনির পার্শ্বে বসিয়া Imitation of Christ বা ঈশানুসরণ গ্রন্থ পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। তিনি ভাবে তন্ময় হইয়া ঈশার পবিত্রতা, ত্যাগ, বৈরাগ্য, ভক্তি ও প্রেমের কথা জ্বলন্ত ভাষায় বলিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি প্রবল আবেগে ঈশার সর্ব্বত্যাগী শিষ্য ও ভক্তগণের পবিত্র আত্মনিবেদিত জীবন, তাঁহাদের কঠোর তপশ্চর্য্যা, অসাধারণ ধৈর্য্য এবং অপার কষ্টসহিষ্ণুতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। ঈশার মহান্ আদর্শে ও প্রেমে তাঁহাদের জীবন অনুরঞ্জিত করিয়া কিরূপ অদ্ভুত অনুরাগে জগতের ভোগসুখ সম্পূর্ণ উপেক্ষাপূর্ব্বক তাঁহারা দ্বারে দ্বারে ঈশার সমগ্র জীবন ও বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। মনুষ্যজাতির কল্যাণের জন্য তাঁহারা সকল অপমান, সকল লাঞ্ছনা এবং সকল দুঃখ-যন্ত্রণাকে হাসিতে হাসিতে আলিঙ্গন করিয়াছেন। এই সকল মহাপুরুষদের রুধিরস্রাবে খ্রীষ্টধর্ম্ম আজ জগতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। তাঁহাদের অপূর্ব্ব ত্যাগ ও আত্মবলিদানের কথা বলিতে বলিতে নরেন্দ্রনাথ প্রমত্তভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের অশ্রুতপূর্ব্ব ত্যাগ, বৈরাগ্য, তপস্যা ও সাধনা, তাঁহার অদ্ভুত জ্ঞান, প্রেমভক্তি এবং তাঁহার সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের অতুলনীয় আদর্শের কথা উল্লেখ করিলেন। তিনি তাঁহার সমবেত গুরুভ্রাতাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ঠাকুরের আদর্শে ও ভাবে আমাদের জীবন গঠিত করতে হবে। তাঁর ভাব, তাঁর মহান আদর্শ, তাঁর প্রেমপূর্ণ শান্তির বাণী জগতের মঙ্গলের জন্য, মনুষ্যজাতির কল্যাণের জন্য আমাদের প্রচার করতে

হবে। এই আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত।" নরেন্দ্রনাথের উদ্দীপনাময়ী বাণী সকলের অন্তরে সকলের প্রাণে যেন একটা তাড়িত প্রবাহের মত খেলিয়া গেল। তাঁহারা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিলেন ঈশ্বরানুভূতি এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মহান্ আদর্শ ও বাণী মানুষের ভিতর প্রচার করাই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত। তাঁহারা সেই প্রজ্বলিত ধুনির সম্মুখে সমুদায় বাসনা-বিরহিত হইয়া এই ব্রতগ্রহণ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী বা পরীক্ষার্থী ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের সে সব সংকল্প ত্যাগ করিলেন। আঁটপুরে সেই পবিত্র ধুনির সম্মুখে তাঁহাদের উদ্দেশ্য, জীবনের গতি এবং ব্রত সমবেতভাবে একাভিমুখী হইল। তাঁহারা স্থির করিলেন যে আজি হইতে শ্রীরামকৃষ্ণকেই কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের ভাবী জীবন দৃঢ়লক্ষ্যে অগ্রগতিতে চলিতে থাকিবে। বৈরাগ্যের দীপ্তমহিমায় সকলের অন্তর উদ্ভাসিত হইয়া কি এক অচিন্ত্য দিব্যশক্তির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইল। এই দিব্যভাবের আবেশ চলিয়া গেলে তাঁহারা জানিতে পারিলেন সেদিন ২৪শে ডিসেম্বর, ঈশার আবির্ভাবের প্রাক্সন্ধ্যা (X'mas Eve)। সেই ত্যাগী সন্ন্যাসীর দল বুঝিলেন যে, শুভদিনে শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিতে এবং প্রেরণায় নরেন্দ্রনাথের ভিতর দিয়া এই অপূর্ব্ববাণী নির্গত হইয়াছে এবং তাঁহাদের চিত্তকে দিব্যভাবে মণ্ডিত করিয়াছে। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে ইহা একটী পুণ্যস্মৃতি-কাহিনী।

বাবুরামের মাতাঠাকুরাণী ঠাকুরকে অনেকবার দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি পরম ভক্তিমতী ছিলেন। আঁটপুরে এই ত্যাগী দলের মধ্যে

রাখালকে না দেখিয়া তিনি তৃপ্তি বোধ করিলেন না। অনেকে জানিতেন ঠাকুরের স্ত্রী-ভক্তদের মধ্যে কত স্নেহের ও আদরের মানস-পুত্র রাখাল। তাঁহারা যদি কেহ তাঁহাকে সমুচিত স্নেহাদর ও যত্ন না করিতেন ঠাকুর কত ক্ষুণ্ণ হইতেন। সেই রাখাল আঁটপুরে না আসাতে বৃদ্ধা এই আনন্দোৎসবে একটা অভাব বোধ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া বৃদ্ধাকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি অবিলম্বে রাখালকে লইয়া আঁটপুরে আসিবেন এবং তাঁহারা দুইজনে মিলিয়া পরমানন্দে তথায় কয়েকদিন বাস করিবেন। কিছুদিন পরে নরেন্দ্রনাথ রাখালকে সঙ্গে লইয়া আঁটপুরে আসিলেন। সঙ্গে বাবুরাম ও বুড়া গোপালও ছিলেন। বাবুরামের মাতার আশা পূর্ণ হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর তাঁহাকে স্মরণ করিয়া ঠাকুরের স্ত্রী-ভক্তেরা অনেকে রাখালকে আদর যত্ন ও ভোজন করাইয়া তৃপ্তি বোধ করিতেন। রাখাল নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আঁটপুরে আসিয়া তথায় বৃক্ষলতা পরিবেষ্টিত উন্মুক্ত প্রান্তর ও গ্রামের শ্যামশোভা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। তাঁহার সরল মধুর বালগম্ভীর ভাব দেখিয়া গ্রামের অনেকে আকৃষ্ট হন। এমন কি পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত একজন শিক্ষিত যুবক হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু রাখালের ধ্যানতন্ময় ভাব দেখিয়া ও তাঁহার মধুর সরল বাক্য শুনিয়া যুবকটী উক্ত সংকল্প ত্যাগ করেন।

বরাহনগর মঠে রাখাল যখন অবস্থান করিতেছিলেন তখন তাঁহার পিতা আনন্দমোহন প্রথম প্রথম প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। তাঁহার মনে মনে আশা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের বিরহজনিত

আবেগ কাটিয়া গেলে রাখাল পুনরায় গৃহে প্রত্যাগত হইতে পারেন। আনন্দমোহন মঠে আসিলে রাখাল শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ স্মরণ করিয়া তাঁহাকে যথোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করিতেন না। কিন্তু পিতার স্বার্থ-প্রণোদিত অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াও তিনি উদাসভাবে মৌন হইয়া তাঁহার নিকটে বসিতেন। একদিন রাখাল তাঁহার এইরূপ নিরর্থক বারম্বার মঠে যাতায়াতের ক্লেশ দেখিতে না পারিয়া স্পষ্টাক্ষরে তাঁহাকে বিনয়-নম্র গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কেন আপনারা কষ্ট করে আসেন? আমি এখানে বেশ আছি। এখন আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনারা আমায় ভুলে যান আর আমি আপনাদের ভুলে যাই।" রাখালের ঈদৃশ দৃঢ়সংকল্পের নির্ম্মম বাণী শুনিয়া আনন্দমোহন হতাশ হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে রাখালকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা বৃথা।

আঁটপুর হইতে ফিরিয়া আসার পর সকলেই ত্যাগের অমৃতময় পথে কঠোর তপস্যা ও ধ্যানভজনে অগ্রসর হইয়া ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া এই বরাহনগর মঠে বিধিমত শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের পর বিরজাহোম করিয়া বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। কৌপীনবস্ত হইয়া সন্ন্যাসাশ্রমে তাঁহাদের নামের পরিবর্ত্তন হইল। সকলেই স্বামী সংজ্ঞায় নূতন নাম গ্রহণ করিলেন। নরেন্দ্রনাথের নাম বিবেকানন্দ, রাখাল—ব্রহ্মানন্দ, তারক—শিবানন্দ, শরত—সারদানন্দ, শশী—রামকৃষ্ণানন্দ, যোগীন—যোগানন্দ, বাবুরাম—প্রেমানন্দ, হরি—তুরীয়ানন্দ, নিরঞ্জন—নিরঞ্জনানন্দ, লাটু—অদ্ভুতানন্দ, গঙ্গাধর—অখণ্ডানন্দ, সারদাপ্রসন্ন

ত্রিগুণাতীতানন্দ, কালী—অভেদানন্দ, বুড়োগোপাল—অদ্বৈতানন্দ এবং সুবোধ—সুবোধানন্দ নাম ধারণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, "আমি ষোল ট্যাং করেছি তোরা এক ট্যাংও কর।" তাঁহাদের সর্ব্বদা মনে পড়িত ঠাকুরের কঠোর ত্যাগ ও তপস্যা। ইহা স্মরণ করিয়া তাঁহারা অশ্রুতপূর্ব্ব কঠোর সাধনায় ব্রতী হইলেন। আহার নিদ্রা ভুলিয়া দিনের পর দিন তাঁহারা ধ্যান জপে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের তীব্র ব্যাকুলতা যখন তাঁহাদের স্মৃতিপথে উদিত হইত, তখন তাঁহারা আপনাদের ধিক্কার দিয়া আর্ত্তভাবে বলিতেন, "হায়, কোথায় সে ব্যাকুলতা ?" কোনদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল না, কেবল মনে হইত বুদ্ধের তপস্যা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তি ও ব্যাকুলতা, জ্ঞানগুরু শঙ্করের অদ্বৈতানুভূতি এবং সর্ব্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ, তপস্যা, ব্যাকুলতা, প্রেম ও সমাধির জীবন্ত অগ্নিময় আলেখ্য !

বরাহনগর মঠে এই যুবক ত্যাগীর দল তীব্র বৈরাগ্যে কঠোর ভাবে দিন কাটাইতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের সেবা-পূজায় তন্ময় হইয়া থাকিতেন। পাচক উঠিয়া গেল। তিনি স্বহস্তে রাঁধিয়া ভোগ নিবেদন করিতেন। তাঁহারা যথাক্রমে দুই তিনজন কখনও চারিজন মিলিয়া একত্রে ভিক্ষায় বাহির হইতেন। কত লোকে তাঁহাদিগকে দেখিয়া কত কর্কশ ও কটুকথা শুনাইত আবার কেহ ঠাট্টা বিদ্রূপও করিত। তাঁহারা নিন্দা, উপহাস, সুখ্যাতি, প্রশংসা সমভাবে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না বরং সেই সব প্রসঙ্গ তুলিয়া সকলে মিলিয়া অন্য সময় আনন্দ উপভোগ করিতেন।

পাড়াপড়শী দুর্জ্জনেরা তাঁহাদের প্রতি নানাবিধ অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়া আমোদ পাইত। কেহ কেহ তাঁহাদের কুৎস ও গ্লানি প্রচার করিয়াও বেড়াইত। ইহা সন্ন্যাসজীবনের অঙ্গের ভূষণ বলিয়া এই তরুণ ত্যাগীর দল সমস্তই উপেক্ষা করিতেন ঠাকুরের গৃহস্থ ভক্তেরা প্রায়ই সংবাদ পাইতেন না—তাঁহারা বি আহার করিতেন। কোনদিন তাঁহাদের ভিক্ষা জুটিত আবার কোন দিন একটা তণ্ডুলকণাও জুটিত না। একদিন চারিজন ভিক্ষায় বাহির হইয়া একমুষ্টি তণ্ডুল বা একটি কপর্দ্দকও পাইলেন না ভাণ্ডারেও চাউল নাই যে তাঁহারা ঠাকুরকে ভোগ দিবেন বেলা দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্রে হাসিমুখে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার যখন জানাইলেন যে—আজ ভিক্ষা মিলিল না, তখন সকলে যুক্তি করিলেন যে—"এস, আজ সকলে মিলিয়া কীর্ত্তন করা যাক্ ভগবানের নামে ক্ষুধাতৃষ্ণা অবসাদ সব দূর হয়ে যাবে।" সকলেই খোল-করতাল সহযোগে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তনানন্দে সকলে এত মাতিয়া উঠিয়াছেন যে তাঁহাদের আর কোন বিষয়ে হুঁশ নাই। এদিকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (শশী মহারাজ) দেখিলেন— আজ ঠাকুর উপবাস থাকিবেন ; একথা ভাবিতেই তাঁহার অন্তর যেন দগ্ধ হইতে লাগিল—তিনি ব্যথিত ও চঞ্চল হইলেন। অবশেষে মঠের নিকটস্থ কোন পরিচিত বন্ধুকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন— "ভাই, আজ ভিক্ষায় কিছুই পাওয়া যায় নাই,—কিছু আলো চাল, দুটো আলু ও এক ছিটে ঘি দিতে পার ?" বন্ধুটির বাড়ীর অপর সকলেই এই সন্ন্যাসীদের উপর বিরক্ত। লেখাপড়া শিখিয়া ভদ্র ঘরের ছেলেরা ভিক্ষা করে খায়—ছিঃ! এ ক্ষেত্রে বন্ধুটি কোন-

রকমে পোয়াটাক চাল, কয়েকটা আলু ও আধছটাক ঘি সংগ্রহ করিয়া গোপনে জানালার মধ্য দিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের হাতে দিলেন। রামকৃষ্ণানন্দ তাহা পাইয়া পরম আনন্দিত। তিনি এই ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য রাঁধিয়া ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করিলেন। ভোগের পর তিনি অন্নপ্রসাদ এক সঙ্গে চট্‌কাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ড প্রস্তুত করিলেন। সেই পিণ্ডগুলি 'দানাদের' ঘরে লইয়া গিয়া তিনি দেখিলেন সকলেই হরিনামে উন্মত্ত ও কীর্ত্তনানন্দে বিভোর। রামকৃষ্ণানন্দ এক একজনের সম্মুখে প্রসাদের পিণ্ড নিয়া ধরিয়া বলিলেন, "হাঁ কর, ঠাকুরের প্রসাদ।" একে একে তাঁহাদের প্রত্যেকের মুখে সেই ভাবে এক একটি অন্ন-পিণ্ড তুলিয়া দিলেন। এই অপূর্ব্ব প্রসাদের আস্বাদ পাইয়া সকলে পরম পরিতৃপ্ত ভাবে বিস্মিত নয়নে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই শশী! এ অমৃত কোথায় পেলে ভাই?" পুনরায় কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। মঠে প্রায়ই তাঁহাদের এই ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। কতদিন ভিক্ষা করিয়া তাঁহারা চাউল সংগ্রহ করিলেন কিন্তু কোনও শাকসবজি তরকারি মিলিল না। এই কপর্দ্দকহীন সন্ন্যাসীদের তখন উহা ক্রয় করিয়া আনা সাধ্যাতীত ছিল। সুতরাং অবশেষে বেড়ার গা হইতে তেলাকুচা পাতা আনিয়া তাহাই রাঁধিয়া অন্নগ্রহণের একমাত্র ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইল। দারুণ শীতে শীতবস্ত্র বা পাদুকা নাই, কখনও বা পরিধেয় বস্ত্রের অভাব, কিন্তু এই নবীন সন্ন্যাসীর দল কিছুতেই দমিতেন না—তাঁহারা সহাস্যবদনে সব সহ্য করিতেন। সুযোগক্রমে যদি কখনও উত্তম খাদ্য দ্রব্য আসিয়া জুটিত তবে প্রসাদজ্ঞানে সামান্য গ্রহণ করিয়া তাহার অধিকাংশ অতিথি

অভ্যাগত ও ভক্তদের সেবায় বিতরিত হইত। কোন কোন রাত্রিতে তাঁহারা শুধু লবণ সহযোগে দু'একখানি শুক্‌নো রুটী খাইয়া সাধনায় অতিবাহিত করিতেন। এমন দিনও তাঁহাদের গিয়াছে যেদিন আদৌ আহার জুটে নাই—শুধু ভগবদ্‌প্রসঙ্গে ক্ষুধাতৃষ্ণা কোথায় চলিয়া গিয়াছে!

এই কঠোর ভাবের কথা স্মরণ করিয়া উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—"বরাহনগরে এমন কতদিন গিয়াছে যে খাবার কিছু নেই, ভাত জোটে ত নুন জোটে না। কয়েকদিন হয় ত শুধু নুন ভাতই চললো কিন্তু কারুর তাতে গ্রাহ্য নেই। জপধ্যানের প্রবল তোড়ে তখন আমরা ভাসছি। কখন কখন শুধু তেলাকুচো পাতা সিদ্ধ ও নুন ভাত—এই মাসাবধি চলছে। আহা সে সব কি দিনই গেছে। সে কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেত মানুষের কথা কি?" উত্তরকালে ব্রহ্মানন্দও রহস্য কৌতুক করিয়া কাহাকে কাহাকে বলিয়াছিলেন "যখন খাবার শক্তি ছিল তখন তেলাকুচো সিদ্ধ ভাত জোটাই মুশকিল হত, এখন খাবার সামর্থ্য নেই তাই উপাদেয় আহার জুটচে।"

মঠে কীর্ত্তন, পাঠ, জপ, ধ্যান অবিরাম চলিত। বিবেকানন্দ তাঁহার ত্যাগী গুরুভ্রাতাদের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের এক একটি বাণী লইয়া শাস্ত্রযুক্তি সহায়ে ও আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে তাহার ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার ব্যাখ্যায় ও পাণ্ডিত্য-পূর্ণ আলোচনায় ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ গুরুভ্রাতারা বুঝিতে সক্ষম হইলেন যে, ঠাকুরের সামান্য সামান্য উপদেশে কত গভীর ভাব ও তথ্য নিহিত আছে। অনবরত শাস্ত্রপাঠ ও ভগবদ্‌প্রসঙ্গের আলোচনা

করিতে করিতে তাঁহারা হৃদয়ে ঈশ্বরলাভের জন্য একটা তীব্র ব্যাকুলতা অনুভব করিলেন। বরাহনগর মঠের একটী বৃহত্তম ঘরে সকলে সমবেত হইয়া তাঁহারা নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করিতেন। কোন গৃহস্থ ভক্ত বা আগন্তুক ভদ্রলোক আসিলে এই ঘরেই তাঁহাদের সহিত ঈশ্বরপ্রসঙ্গ চলিত। ঈশ্বরচিন্তা ভিন্ন তাঁহারা আর কিছু জানিতেন না। এই সময়ে ঠাকুরের পরম অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় মঠে আসিলে ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "মাষ্টার মশায়! আসুন, সকলে সাধন করি। তাই ত আর বাড়ীতে ফিরে গেলাম না। যদি কেউ বলে ঈশ্বরকে পেলে না তবে আর কেন? তা নরেন্দ্র বেশ বলে ঈশ্বরকে পেলাম না বলে শ্যামকে নিয়ে ঘর করতেই হবে? আহা! নরেন্দ্র এক একটী কথা বেশ বলে।" নরেন্দ্রের কথা শুনিলে তাঁহার মনে শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতির উদ্দীপনা হইত। ঠাকুর যে তাঁহাকে বলিতেন সহস্র-দল-কমল! আগন্তুক কোন ভদ্রলোকের সহিত নরেন্দ্রনাথের ঈশ্বর-প্রসঙ্গের আলোচনা হইলে রাখাল সমীপস্থ ভক্ত ও গুরুভ্রাতাদের সম্বোধন করিয়া বলিতেন, "চল, নরেন কি বলছে শুনি গিয়ে।"

এই ত্যাগিমণ্ডলী বরাহনগর মঠে কঠোর তপস্যা ও অহর্নিশি সাধনভজন করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছিলেন না। সকলেই কোনও নির্জ্জন স্থানে বসিয়া সাধনভজন করিতে ব্যাকুল হইলেন। কাহারও কাহারও ইচ্ছা হইল যে লোকালয় হইতে বহুদূরে গিয়া কোন বিজনপ্রদেশে, নদীতীরে বা গিরি গুহায় স্থিরাসনে বসিয়া ঈশ্বর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। কেহ ভাবিলেন তপোভূমি হিমালয়ের ক্রোড়ে বসিয়া সর্ব্বদা কঠোর সাধনায় রত হইবেন।

বরাহনগর মঠে এইরূপ একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হইল। রাখালের মনেও ইহার স্পর্শ লাগিল।

ব্রহ্মানন্দ নির্জ্জনে একাকী বসিয়া তন্ময়ভাবে চিন্তা করিতেন কেন মনের শান্তি হইতেছে না? কি যেন চাই, কি যেন প্রাণে অপূর্ণতা বোধ হইতেছে কিন্তু কিছুতেই সে অভাব দূর হইতেছে না। এই মঠ, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী পরম পবিত্রচিত্ত ঈশ্বরলুব্ধ অন্তরঙ্গেরা দিনরাত কঠোর তপস্যা ও সাধনভজনে নিরত আছেন, এই মঠ যেখানে নরেন্দ্রনাথের ন্যায় বৈরাগ্যবান ত্যাগিশ্রেষ্ঠ, দৃঢ়চেতা, তেজস্বী, মহাশক্তিশালী, জ্ঞানী, বিদ্বান ও উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি-সম্পন্ন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়তম অন্তরঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছেন—এই মঠ যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে অনুরঞ্জিত হইয়া তাঁহার সেবা, পূজা, স্তব ও ধ্যানধারণাদি চলিতেছে সেই পূতস্থানে থাকিয়াও মনের কেন শান্তি হইতেছে না? রাখালের মনে হইল যোগবাশিষ্ঠে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা। মনই সকল অশান্তির মূল। ইহার নাশই একমাত্র উপায়। কঠোর সাধনে গভীর ধ্যানে এই মনের লয় করিতে হইবে। ঠাকুরের দিব্যস্পর্শে এই মনে যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি হইত, মন যে উচ্চতমস্তরে আরোহণ করিত, যে অতীন্দ্রিয় ভাবে তন্ময় হইয়া থাকিত —তাহা যে তাঁহার শক্তি—তাঁহার খেলা। কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা লইয়া নানা ছাঁচে তাহার গড়ন করে, তিনিও যে তাঁহাদের মন লইয়া নানা ছাঁচে গড়িতেন! আজ তাঁহার বিরহে প্রতিমুহূর্ত্তে রাখাল বুঝিতেছেন যে তাঁহার শক্তিতে ও তাঁহার অপার করুণায় এই মনে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও আনন্দলাভ হইত! শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগে অর্জ্জুন শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহাবীর মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুনের

গাণ্ডীব তুলিবার পর্য্যন্ত সামর্থ্য ছিল না। ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানে তাঁহার মনে হইল যে সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। সে মন কোথায়? যেরূপেই হউক এই মনের নাশ করিতে হইবে? রাখাল ভাবিয়া দেখিলেন যে মঠে বাস করিলে কত কাজকর্ম্ম ও বহির্মুখী চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। গুরুভ্রাতাদের আহার বিহার স্বাস্থ্য ও মঠের পরিচালনার ভার নরেন্দ্র তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাও যে সুসম্পন্ন করা সময় সময় অসম্ভব হইয়া উঠে। মঠের গুরুভ্রাতারাও একে একে তপস্যার জন্য চলিয়া যাইতেছেন। নরেন্দ্রকে বলিয়া তিনিও কোথাও গিয়া একাগ্রমনে সাধনভজন করিবেন এইরূপ মনস্থ করিলেন।

এই বৈরাগ্যের উন্মাদনায় ঈশ্বরলাভের জন্য নির্জ্জনে কঠোর তপস্যার দৃঢ়সংকল্প লইয়া রাখাল নরেন্দ্রনাথকে একদিন বলিলেন, "এখানে থেকে তো কিছুই হল না! তিনি যা বলেছিলেন—ভগবান দর্শন কৈ হল?" রাখালের এই কথায় নরেন্দ্র কোন উত্তর দিলেন না। রাখাল তখন পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন, "চল, নর্ম্মদায় বেড়িয়ে পড়ি।" এবার নরেন্দ্রনাথ রাখালের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বের হয়ে কি হবে? জ্ঞান কি হয় তাই জ্ঞান জ্ঞান করছিস্?" ব্রহ্মানন্দ তদুত্তরে বলিলেন, "মুক্তি ও তাহার সাধন বইখানিতে আছে সন্ন্যাসীদের একসঙ্গে থাকা ভাল নয়। সন্ন্যাসী নগরের, কথা আছে।" নরেন্দ্রনাথ নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহার মনেও তখন তীব্র ব্যাকুলতা—নির্জ্জন তপস্যায় আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছে।

অমৃতের পথ কঠিন, দুর্গম ও শানিত ক্ষুর ধারের মত। ব্রহ্মানন্দ সেই দুর্গম পথের যাত্রী। তাঁহার অন্তরে শ্রীরামকৃষ্ণের বিরহে

যে প্রদীপ্ত বহ্নি শিখা জ্বলিতেছিল—যে অশান্তির হাহাকারধ্বনি উঠিতেছিল, যে তীব্র অভাব প্রতি মুহূর্ত্তে হৃদয়ের অন্তরতমস্তলে অনুভব করিতেছিলেন তাহাই বৈরাগ্যের আকারে দুঃসহ ঈশ্বর ব্যাকুলতার রূপ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণই যে তাঁহার ধ্যান জ্ঞান তপস্যা ও ঈশ্বর। তিনি নিজেই যে নরেন্দ্রনাথকে স্পষ্টভাবে সরলভাষায় বলিয়াছেন, "যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ!" সেই পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ যে স্বয়ং রামকৃষ্ণ। গুরু কর্ণধার রূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া স্তরে স্তরে কত উচ্চ উচ্চতর ও উচ্চতম অনুভূতি-রাজ্যে তিনি তাঁহাদের বিচরণ করাইয়াছেন। সেই মহাশক্তি কিসে লাভ হয়? আজ রাখাল সেই অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করিবার জন্য কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া অনন্তের ধ্যানে নিমগ্ন হইবার জন্য ব্যাকুল।

তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাদের মধ্যে যখন একে একে অনেকেই সাধনভজনের উদ্দেশে তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন তখন রাখালও কোন তীর্থে গিয়া তপস্যা করিবেন ইহা দৃঢ়সংকল্প করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আদরের রাখাল কোথাও গিয়া ভিক্ষা বা কষ্ট করিবে ইহা নরেন্দ্রনাথ বা তাঁহার কোন গুরুভ্রাতা পছন্দ করিতেন না। তাই তাঁহারা রাখালকে একাকী তপস্যার জন্য কোথাও যাইতে দিতে চাহিতেন না।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী যখন নীলাচলে যাত্রা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন তখন তিনি রাখালের তীর্থভ্রমণ ও তপস্যা করিবার সংকল্পের কথা শুনিতে পাইলেন। রাখালের সাধ পূর্ণ হয় এবং কোন কষ্ট না পান ইহা মনে করিয়া তিনি তাঁহাকে তাঁহার

সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলেন। রাখালও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সহিত যাইতে উৎসাহিত হইলেন। ইহাতে নরেন্দ্রনাথও কোন বাধা দিলেন না। পুরীতে শ্রীযুত বলরাম বাবুদের বিস্তীর্ণ জমিদারী ও শশী-নিকেতনের ন্যায় প্রাসাদোপম অনেক অট্টালিকা আছে। শ্রীশ্রীমার সঙ্গে রাখাল যাইবে এবং বলরামবাবুও তথায় আছেন ইহা মনে করিয়া নরেন্দ্র রাখাল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন।

রাখাল নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিবার জন্য শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে প্রেমে আবিষ্ট হইয়া তন্ময়ভাবে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে স্বতঃই উদয় হইল শ্রীগৌরাঙ্গের কথা। সেই বিরহতপ্ত প্রেমময় মূর্ত্তি। যাঁহার বিরহাগ্নির উত্তাপে শ্রীমন্দিরের জগমোহনে অরুণস্তম্ভের নিকটে কঠিন পাষাণ গলিয়া তাঁহার করপল্লব ও পদচিহ্ন আজিও ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। যিনি মহাপ্রেমে আবিষ্ট হইয়া যমুনাভ্রমে সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, চটক পর্ব্বতকে গোবর্দ্ধন গিরি মনে করিয়া প্রেমোন্মত্তভাবে ছুটিয়া গিয়াছিলেন, যিনি প্রেমে বিহ্বল হইয়া কৃষ্ণবিরহে ভিত্তিগাত্রে মুখ ঘর্ষণ করিতেন—সেই অপূর্ব্ব বিরহী প্রেমিকের কথা রাখালের মনে উদিত হইয়া হৃদয় আর্দ্র হইয়া গেল। শ্রীচৈতন্যের বিরহের কথায় আর এক বিরহী প্রেমিকের কথা তাঁহার মনে পড়িল। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভাগীরথীকূলে “মা” “মা” করিয়া মাটিতে পড়িয়া মুখ ঘষিতেন, তাঁহার বিরহতপ্ত অশ্রু গঙ্গাসলিলে মিশিয়া যাইত—তাঁহার “মা” “মা” রবে বিরহের আর্ত্তনাদে পাষাণ হৃদয়েও চক্ষু সজল হইয়া উঠিত। সেই প্রেম—সেই বিরহের কথা স্মরণ করিতে করিতে

রাখাল অশ্রুধারায় বিগলিত হইলেন। তিনি এই সময়ে দীনভাবে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। কোন কোন দিন এমার মঠে আবার কোন কোন দিন অন্যান্য মঠে একবেলা মাত্র মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া ভগবদ্ চিন্তায় বিভোর হইয়া রহিলেন। শরীরের দিকে আদৌ দৃষ্টি রাখিতে পারিতেন না। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ইহা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। তাঁহাদের স্নেহের দুলাল রাখাল কোন কঠোরতা বা ক্লেশ করিতেছে শুনিলে শ্রীশ্রীমা অত্যন্ত চিন্তিত ও ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। বলরামবাবু ইহা শুনিতে পাইয়া রাখালকে তাঁহার গৃহে রাখিয়া যত্ন করিতে ব্যগ্র হইলেন। রাখাল দেখিলেন নীলাচলে থাকিলে তাঁহার অভীপ্সিত তপশ্চর্য্যা ও কঠোর সাধনার পথে অনেক অন্তরায় আছে। তিনি মনে করিলেন যে একাকী বহুদূরে কোন নির্জ্জন স্থানে না গেলে কিছুই হইবে না। অগত্যা তিনি পুরী হইতে কটক হইয়া বরাহনগরের মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

তপস্যায় নিষ্ক্রমণ

মঠে ফিরিয়া আসিয়া ব্রহ্মানন্দ বিবেকানন্দ প্রমুখ কয়েকজন গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হইলেন। ইতোমধ্যে তাঁহার গুরুভ্রাতাদের মধ্যে অনেকেই তপস্যা ও সাধন ভজন করিবার জন্য ব্যাকুলচিত্তে নানা তীর্থে চলিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ মঠে তন্ময়ভাবে বাস করিলেও অন্তরে অশান্তির অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলেন। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে কিন্তু যে পরমা শান্তি ও যে পরম নিবৃত্তি শ্রীরামকৃষ্ণ সন্নিধানে তাঁহার মন অনুক্ষণ বোধ করিত তাহা কোথায়? কোথায় সে অনাবিল অপার্থিব প্রেম যাহার প্রবাহে বিশ্বজগৎ বিলুপ্ত হইয়া নিয়ত আনন্দের তরঙ্গ উত্থিত হয়? কি করিলে কোথায় গেলে তাহা পাওয়া যায়? পুরী হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি মঠের পরিচালনাকার্য্যে সম্পূর্ণ ভাবে দৃষ্টি রাখিতে পারিতেন না। স্বামিজী ব্রহ্মানন্দের এই তন্ময় ব্যাকুলতার ভাব লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার সহিত একান্তে আলাপ-আলোচনা করিয়া তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার নির্জ্জনে তপস্যা করিবার প্রবল আগ্রহ হইয়াছে। তিনিও তখন একাকী কোন সুদূর প্রদেশে বা তীর্থে তপস্যা করিবার সংকল্প করিতেছিলেন। ব্রহ্মানন্দের ব্যাকুলতা দেখিয়া নিজের মনের অবস্থা দৃষ্টে তাঁহার হৃদয় সহানুভূতিতে পূর্ণ হইল। কোনরূপ আপত্তি ও নিরুৎসাহ না

করিয়া তিনি তাঁহাকে উত্তরাখণ্ডে যাইবার জন্য পরামর্শ দিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তিনিও সেই অঞ্চলে যাইবার মনস্থ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মানন্দের যাহাতে কোন কষ্ট না হয় স্বামিজী সেজন্য সুবোধানন্দকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ইহাতে সর্ব্বাগ্রে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অনুমতি ও আদেশ লইবার প্রয়োজন। শ্রীশ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে ছিলেন। তিনি রাখালের অভিপ্রায় শুনিতে পাইয়া শ্রীযুত বলরামবাবুকে লিখিলেন যে, "শুনিলাম রাখাল পশ্চিমে যাইবে। গেলবারে জগন্নাথে শীতে কষ্ট পাইয়াছিল। শীত অন্তে ফাল্গুন মাস নাগাত গেলে ভাল হয়। তবে যদি একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে তাহা হইলে আর কি বলিব।" মা বুঝিয়াছিলেন যে ব্রহ্মানন্দের মনে এখন তীব্র ব্যাকুলতা। অনন্যচিত্তে পরম নিভৃতে তপস্যার দ্বারা ঈশ্বরলাভ করাই তাঁহার এই সন্তানের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। নীলাচলে ব্রহ্মানন্দ বিশেষ কোন গরম বস্ত্র লইয়া যান নাই তজ্জন্য মায়ের প্রাণ স্নেহে বিগলিত হইয়াছিল। পুরীতে শীতও প্রবল নহে এবং কোন গরম বস্ত্র না লইলেও তেমন কষ্ট হইবার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। তবুও তিনি যে মা এবং ব্রহ্মানন্দ তাঁহার ও শ্রীরামকৃষ্ণের আদরের মানসপুত্র। স্নেহের প্রাবল্যেই তিনি লিখিয়াছিলেন, "জগন্নাথে শীতে কষ্ট পাইয়াছিল।" তিনি জানিতেন যে ব্রহ্মানন্দ যেভাবে সর্ব্বদা তন্ময় হইয়া আছেন তাহাতে শরীরের দিকে দৃষ্টি আদৌ থাকে না। এই অবস্থায় শীতপ্রধান পশ্চিমের কথা মনে করিয়াই তিনি তাঁহাকে ফাল্গুন মাসে যাইবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু অন্তর্য্যামী জননী অন্তরে অন্তরে বুঝিলেন

ব্রহ্মানন্দের মনে যে দিব্যভাবের ব্যাকুলতা আসিয়াছে, যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও বলবতী বাসনার উদয় হইয়াছে, যে মহাপুণ্যময়ী অশান্তির পূতাগ্নি তাঁহার হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা নিরোধ করা কঠিন। অপার মাতৃস্নেহে বিগলিত হইয়াও তাই পুত্রের মঙ্গলকামনায় শেষে লিখিলেন, "তবে যদি একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে তাহা হইলে আর কি বলিব।" বাস্তবিকই এখানে বলিবার কিছু নাই। যখন বিপুলসলিলা স্রোতোস্বিনী উচ্ছ্বসিত তরঙ্গভঙ্গে সমুদ্রের অভিমুখে অপ্রতিহত গতিতে ধাবিত হয়, যখন স্থির বায়ুমণ্ডলে ঝটিকা বিক্ষুব্ধ হইয়া প্রবল বেগে জল স্থল আলোড়ন করে, যখন মধুলোভী ভ্রমর মধুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া প্রমত্তভাবে কুসুমের দিকে ছুটিয়া যায়—তখন সে গতি, সে আলোড়ন এবং সে আকর্ষণকে কে বাধা দিতে পারে? ব্রহ্মানন্দ আর ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি অগ্রহায়ণের শেষ ভাগেই স্বামিজীর উপদেশ মত উত্তরাখণ্ডে যাত্রা করিতে অভিলাষী হইলেন। এই পর্য্যটনে ব্রহ্মানন্দের যাহাতে কোন ক্লেশ না হয় তজ্জন্য স্বামিজী—শুধু সুবোধানন্দকে সঙ্গে দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি প্রমদাবাবুর নিকট একখানি পরিচয়পত্র তাঁহাদের সঙ্গে দিলেন। পত্রে তিনি বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিলেন যে ব্রহ্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

স্বামিজীর পরামর্শ মত তাঁহারা প্রথমে বাবা বিশ্বনাথ ও মাতা অন্নপূর্ণাকে দর্শন করিতে বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে তাঁহারা বৈদ্যনাথ ধামে নামিয়া পড়িলেন। বৈদ্যনাথের

উন্মুক্ত বিস্তৃত প্রান্তর, আশে পাশে, নিকটে ও দূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিরাজীর শোভা এবং তরুলতার অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহার মনে বিমল আনন্দের সঞ্চার হইল। স্থানটী তপস্যার অনুকূল দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। বরাবর কাশীর টিকিট থাকায় তাঁহারা মাত্র দুইদিন তথায় থাকিতে পারিয়াছিলেন।

বৈদ্যনাথ ধাম হইতে রওনা হইয়া তাঁহারা দুইজনে যথাকালে অবিমুক্ত বারাণসী ধামে উপনীত হইলেন। প্রথমে উভয়ে বাঙ্গালী টোলায় বংশীদত্তের বাড়ীতে উঠিয়াছিলেন এবং তথায় একতলায় একটি স্যাতসেতে ঘর পাইয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ লিখিয়াছিলেন, "বংশীদত্তের বাটীতে আমাদের শীতেতে হাড় সেঁকে দিত।" বাড়ীটী পুরাতন প্রথায় নির্ম্মিত, রৌদ্র বা আলো আসিবার ব্যবস্থা খুব কম ছিল। ইহা ছাড়া পশ্চিমের শীত সম্বন্ধে ইঁহাদের এই প্রথম অভিজ্ঞতা।

কাশীধামে পৌছিয়াই সেইদিন ব্রহ্মানন্দ স্বামিজীর লিখিত পত্রসহ সুবোধানন্দকে প্রমদাবাবুর নিকট পাঠাইয়া দেন। এই পরিচয়পত্র ছাড়া স্বামিজী ডাকযোগে প্রমদাবাবুর নিকট কাশীধামে ইঁহাদের রওনা হইবার কথা জানাইয়া ছিলেন। সুতরাং সুবোধানন্দকে দেখিয়াই তিনি যথোচিত যত্নসহকারে অভ্যর্থনা করেন এবং তৎপর-দিন দুইজনকেই তাঁহার বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের কয়েকজন সন্ন্যাসীর সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে প্রায়ই তাঁহার পত্রের আদান প্রদান চলিত। কাশীধামে প্রমদাবাবুর ডাক নাম ছিল "রাজাবাবু।" অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও হিন্দুদর্শনে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অনুরাগ, ধর্ম্মপ্রাণতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া

স্বামিজীপ্রমুখ সন্ন্যাসীরা তাঁহার গুণমুগ্ধ ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ তাঁহার বিষয়ে পূর্ব্বেই স্বামিজীর নিকট শুনিয়াছিলেন এবং প্রমদাবাবুর সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া ও তাঁহার অমায়িক ব্যবহার দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পিশাচমোচন পল্লীস্থিত উদ্যানবাটীতে তাঁহাদের থাকার জন্য প্রমদাবাবু বারম্বার বিশেষ অনুরোধ করিলেন। স্থানটী নির্জ্জন এবং সাধনভজনের অনুকূল হইবে বলিয়াই ব্রহ্মানন্দ ইহাতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু প্রমদাবাবু যখন তাঁহাদের তথায় আহারের বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, তখন তিনি উহা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া স্পষ্টভাবে তাঁহাকে বলিলেন, "সত্রে সত্রে ভিক্ষা করিয়া আহার করাই সাধুর কর্ত্তব্য। আমরা তাহাই করিব।" সত্রে সত্রে ভিক্ষা করিয়াই তাঁহারা কোনরূপে উদরপূর্ত্তি করিতেন।

ব্রহ্মানন্দ কোন লোকাপেক্ষা রাখিতেন না। শুধু স্বামিজীর কথা ও উপরোধের সম্মান রাখিবার জন্যই তিনি প্রমদাবাবুর সহিত আলাপ পরিচয় করিয়াছিলেন, নতুবা এই সময়ে তাঁহার মন শুধু তপস্যার জন্য ব্যাকুল থাকিত, লোকসঙ্গ তাঁহার ভাল লাগিত না। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কখন কোন বিষয়ে কাহারও নিকট ভিক্ষাপ্রার্থী হন নাই।

সারদানন্দ এই সময়ে হৃষীকেশে সাধনভজন করিতেছিলেন, তিনি সংবাদ পাইলেন যে ব্রহ্মানন্দ ও সুবোধানন্দ উভয়েই কাশীধামে প্রমদাবাবুর বাগানে রহিয়াছেন। প্রমদাবাবুর সহিত তাঁহার পূর্ব্বে পরিচয় ছিল। কাশীধামে পাছে ব্রহ্মানন্দের কোন কষ্ট হয় সেজন্য তিনি ব্যস্ত হইলেন। হৃষীকেশে ব্রহ্মানন্দ

আসিলে তাঁহারা তাঁহার দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে পারিবেন; এই ভাবিয়া সারদানন্দ প্রমদাবাবুকে লিখিলেন যে, "কলিকাতার একপত্রে জ্ঞাত হইলাম যে, আমাদের রাখাল ও সুবোধ কাশীতে আপনার বাগানে রহিয়াছেন এবং হৃষীকেশ আসিতে বড়ই উৎসুক। তাঁহাকে এইপত্র দেখাইবেন এবং কহিবেন যে এখন এই স্থান সম্পূর্ণ অনুকূল। শীত কলিকাতা অপেক্ষা অধিক নহে। ধুনির কাষ্ঠ ইত্যাদিও প্রচুর পাওয়া যায়। ভিক্ষার খুব সুবিধা। থাকিবার ঘরও রহিয়াছে। জল অমৃত তুল্য, পান করিলে খুব ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। অধিক আর কি লিখিব। এখানে আসিলে তাঁহার এখন কোন কষ্টই হইবে না বরং অপূর্ব্ব আনন্দ লাভই করিবেন। হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ আন্দাজ ১৪ মাইল হইবে। টাট্টু ঘোড়া পাওয়া যায়। সুবোধের যদি এখন না আসা মত হয় তাহা হইলে তিনি একাকী আসিলেও কোন কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। এখন আসিলে মাঘমাসের কল্পবাসও হইবে, কারণ সপ্তপ্রয়াগের মধ্যে এইস্থান দ্বিতীয় প্রয়াগ।"

স্বামী সারদানন্দের পত্রোক্ত এত সুখ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মানন্দ তখন হৃষীকেশে গেলেন না। তখন কাশীধাম তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল। তিনি মানসচক্ষে দেখিতেন অবিমুক্ত বারাণসী ধাম, যেখানে কত সাধু, যোগী, ঋষি, তপস্বী, সাধক ও আচার্য্য পুরুষেরা, কত পুণ্যাত্মা মহাত্মারা সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সত্য সত্যই স্বর্ণকাশী। তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইত যে এই পুণ্য-তীর্থে আসিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দিব্য দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন স্বর্ণপুরী কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটে স্বয়ং জগদ্‌গুরু বিশ্বনাথ মুমূর্ষু

জীবের কর্ণে মহামন্ত্র দান করিতেছেন—মহারুদ্র মহাকাল ভৈরব ত্রিশূল হস্তে বেড়াইতেছেন! হায়, সেই দর্শন কোন্ প্রজ্ঞাচক্ষু লাভে হয়? কৈ সে প্রজ্ঞাচক্ষু, সেই দিব্যভাবময় দৃষ্টি—যাহাতে দর্শন হয় শুভ্ররজতগিরিসম বিভূতিভূষিতাঙ্গ অস্থিমালা-শোভিত দিগম্বর চন্দ্রমৌলি ভগবান পিনাকপাণি বিশ্বনাথ? কৈ সে প্রজ্ঞাচক্ষু, সেই দিব্যভাবময় দৃষ্টি,—যাহাতে দর্শন হয় কোটী-চন্দ্রার্কদ্যুতিসমুজ্জ্বলা তড়িন্ময়ী সর্বৈশ্বর্য্যধারিণী বরাভয়-প্রদায়িনী ভক্তাভীষ্টপূর্ণকারিণী তপঃফলদাত্রী—দক্ষকরে বিচিত্ররত্নরচিতস্বর্ণ-দৰ্বিধৃতা অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণা জগজ্জননী বিশ্বেশ্বরী! অর্দ্ধচন্দ্রাকারে পুণ্যপ্রবাহিণী ভাগীরথীতটদেশে আকাশস্পর্শী শত শত মন্দির-চূড়া শোভা পাইতেছে! পঞ্চক্রোশী কাশী "বোম্" "বোম্" "হর" "হর" নিনাদে কাঁপিয়া উঠিতেছে—গগনপবন মুখরিত করিতেছে। বরুণা ও অসি কত নীরব সাধকের স্মৃতি বক্ষে লইয়া নীরবে বহিয়া যাইতেছে। ভাবঘন ধ্যানমূর্ত্তি কাশীধাম! এই পুণ্যতীর্থে নির্জ্জনে বসিয়া ব্রহ্মানন্দের শরীর ও মন ভাবে তন্ময় হইয়া পড়িত। তথায় অহরহ দিবারাত্রি "শিব" "শিব" "হর" "হর" ধ্বনি শুনিতে শুনিতে ব্রহ্মানন্দ পরমানন্দে গভীরধ্যানে তন্ময় হইতেন। কাশীধাম সহসা ত্যাগ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না।

এই সময়ে একটী বাঙ্গালী পরিব্রাজক ব্রহ্মানন্দকে দেখিয়া আকৃষ্ট হন। উক্ত পরিব্রাজক প্রায়ই তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন। ব্রহ্মানন্দের ধীর প্রশান্ত মূর্ত্তি, তাঁহার কঠোর বৈরাগ্য, তপস্যাদীপ্ত জীবন এবং অমায়িক ব্যবহার দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। একদিন তিনি শুনিতে পাইলেন যে ব্রহ্মানন্দ নর্ম্মদা তীর্থে চলিয়া

যাইতেছেন। ইহা শুনিয়া পরিব্রাজকও তাঁহার সঙ্গে নর্ম্মদায় যাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। সুবোধানন্দ এবং উক্ত সঙ্গী সহ ব্রহ্মানন্দ ওঙ্কারনাথের অভিমুখে রওনা হইলেন।

ভারতের পুণ্যতীর্থ পবিত্র নদনদীর মধ্যে নর্ম্মদা অন্যতম। এই নর্ম্মদার তীরে আচার্য্য শঙ্করের কত কীর্ত্তিকাহিনী বিজড়িত রহিয়াছে। নর্ম্মদার তীরেই ওঙ্কারনাথের মন্দির। ব্রহ্মানন্দের বহুদিনের ঈপ্সিত তপস্যার স্থান। এইখানে তপস্যা করিবার জন্য তাঁহার কত আগ্রহ ও ব্যাকুলতা ছিল। তাঁহারা নর্ম্মদাতীর্থে পৌছিলে দৈবক্রমে একটী মঠে তাঁহাদের তিনজনের স্থান হইল। তপস্যার একান্ত অনুকূল স্থানে, স্বভাব-সুন্দর দৃশ্যের মধ্যে, পবিত্র তীর্থের আধ্যাত্মিক আবেষ্টনে ব্রহ্মানন্দ অহরহ তন্ময় হইয়া থাকিতেন। এই নর্ম্মদার তীরেই তিনি একাদিক্রমে ছয় দিন গভীর অতীন্দ্রিয় ভাবসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া তন্ময়ভাবে ছিলেন। তাঁহার কোন বাহ্যসংজ্ঞা ছিল না। তৎকালীন তাঁহার অন্তরের উপলব্ধি কে প্রকাশ করিবে? তিনি নিজের সাধনভজন বা অনুভূতির কথা প্রায়ই গোপন রাখিতেন। এইজন্য মহাপুরুষদের সাধকজীবনের প্রচেষ্টা ও অনুভূতির অনেক কথা ইতিহাসের অন্ধকারে লুপ্ত থাকে। কোন অন্তররাজ্যে বিচরণ করিয়া উত্তরকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিতেন, "নির্ব্বিকল্প সমাধির পর ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়।" সে গভীর তত্ত্ব কয়জন বুঝিবে?

ওঙ্কারনাথ হইতে ব্রহ্মানন্দ শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্যলীলাক্ষেত্র গোদাবরীতটে পঞ্চবটী বন দর্শন করিতে গমন করিলেন। কিন্তু

সেখানে গিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে পুণ্যতোয়া গোদাবরী কলকল রবে বহিয়া যাইতেছে সত্য কিন্তু বনের নাম গন্ধ নাই। ভীষণ দণ্ডকারণ্যের পঞ্চবটী বন এখন বিভিন্ন পল্লীসমন্বিত সহরের আকার ধারণ করিয়াছে। ঋক্ষ, ব্যাঘ্র, সিংহ, গজ প্রভৃতি হিংস্র শ্বাপদকুলের গর্জ্জন নাই—এখন তৎপরিবর্ত্তে নানা শ্রেণীর নরনারীর কল-কোলাহল। ঘন নিবিড় শাল পিয়াশাল অর্জ্জুন প্রভৃতি দীর্ঘাকৃতি বৃক্ষরাজির স্থলে বিচিত্র সুদৃঢ় অট্টালিকাশ্রেণী এবং লোকের ঘন বসতি! কিন্তু এই সব নানাপ্রকার পারিপার্শ্বিক পরিবর্ত্তন ও বিক্ষেপ সত্ত্বেও পম্পা সরোবরের তটে তিনি শ্রীশ্রীসীতারামের পুণ্যলীলা স্মরণ করিয়া ভাবে আবিষ্ট হইলেন। সেই অতীত দৃশ্য তাঁহার নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠিল। তিনি ভাবচক্ষে দেখিলেন যে জটাবল্কল পরিহিত ধনুর্ধারী শ্যামলসুন্দর রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্র পরমতপস্বী বেশে দাঁড়াইয়া আছেন, পার্শ্বে কাষায় বসনধারিণী মা জানকী এবং অদূরে কুটীর সম্মুখে ব্রহ্মচারিবেশে লক্ষ্মণ অপলকনেত্রে অবস্থান করিতেছেন। কি অনুপম শোভা! নিবিড় দণ্ডকারণ্যে এই পঞ্চবটী কুটীরের চারিদিকে পুষ্পতরুতে কত বর্ণের কুসুমরাশি ফুটিয়া রহিয়াছে—তাঁহারা যেন নীরবে শ্রীশ্রীসীতারামকে অর্চ্চনা করিতেছে, বৃক্ষে বৃক্ষে তরুলতায় বিহগ কাকলীতে তাঁহাদের স্তবগানে মুখরিত হইতেছে! "জয় জয় রাম সীতারাম", উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি বিভোর হইয়া পড়িলেন। ব্রহ্মানন্দ ভাবে তন্ময় হইয়া গেলেন—তাঁহার আর বাহ্যসংজ্ঞা রহিল না।

এইরূপভাবে তিন দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। আবার

তিনি সহজ অবস্থায় ফিরিয়া আসিলে। দ্রবীভূত হৃদয়ে প্রেম-বিগলিত কণ্ঠে রাম নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। এই তীর্থ ভ্রমণকালে যখনই ব্রহ্মানন্দ তন্ময়ভাবে নিমগ্ন হইয়া পড়িতেন, তখনই সুবোধানন্দ তাঁহার দেহ রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যগ্র ও সতর্ক হইতেন।

শ্রীভগবান যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি জীবহিতকল্পে ও ধর্ম্মস্থাপনার্থে মনুষ্যরূপে যে যে লীলা করেন—তাহা নিত্য। কামকাঞ্চনাসক্ত সাধন ভজনহীন সাধারণ জীব তাহা স্থূল চক্ষে দেখিতে পায় না কিন্তু যাঁহারা সাধক, উচ্চ ভাবভূমিতে যাঁহাদের মন অবস্থিত, তাঁহারা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ভাবময় চক্ষে এই নিত্যলীলা দর্শন করিয়া থাকেন। ভক্তিরসে রসিক কত সাধক বৈষ্ণব মহাজন বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা এখনও দর্শন করিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হন। এই জন্যই বৈষ্ণব মহাজন বলিয়া থাকেন,

"অদ্যাপিও সেই লীলা করেন গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥"

মহাপুরুষেরা পুণ্যতীর্থে গিয়া তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া যান। তাঁহাদের চিত্তদর্পণে সেই ভাবের প্রতিবিম্ব পড়ে এবং তাঁহাদের ভাবময় চক্ষে চিন্ময়লীলা স্ফুরিত হইয়া সমুপস্থিত হয়। ঠাকুর বলিতেন, "চিন্ময় ধাম, চিন্ময় নাম, চিন্ময় শ্যাম।"

শ্রীরামচন্দ্রের চিন্ময় আনন্দলীলা দর্শন করিয়া ব্রহ্মানন্দ অপরিসীম আনন্দে কয়েকদিন তথায় অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর পঞ্চবটী হইতে তিনি শ্রীদ্বারকানাথ দর্শনের উদ্দেশে তাঁহার গুরুভ্রাতা সুবোধানন্দ ও পরিব্রাজক সঙ্গী সহ বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বোম্বাই সহরে জনডিকিন্‌সনের বড়বাবু এবং শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত শ্রীকালীপদ ঘোষ (কালী দাদা) কর্ম্মোপলক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ তথায় উঠিলেন না। শ্রীশ্রীমুম্বা-দেবীর মন্দিরসংলগ্ন একটি একান্ত নিভৃত স্থানে তিনি সঙ্গিদ্বয়-সহ আশ্রয় লইলেন। কারণ একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, কোন ব্যক্তির মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িলে উক্ত ভাবের বিচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ এই সময়ে জনকোলাহল বা লোকসঙ্গ তাঁহার ভাল লাগিত না। তাঁহার মন এখন ব্যাকুলতাপূর্ণ। তাই কালীপদবাবু আন্তরিক অনুরোধ ও আগ্রহ করিলেও ব্রহ্মানন্দ তাঁহার বাড়ীতে থাকিতে স্বীকৃত হইলেন না। সাত আট দিন বোম্বেতে বাস করিয়া তিনি শ্রীদ্বারকানাথ দর্শনে গমন করিলেন।

ব্রহ্মানন্দ ভিক্ষান্নের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া চলিতেন। অর্থ তিনি স্পর্শ করিতেন না। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ-লাবণ্যপূষ্ট ধ্যানগম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া জনৈক ভাটীয়া মহাজন বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন। শেঠজী জানিতে পারিলেন যে তাঁহারা শ্রীদ্বারকাধামের যাত্রী। তাঁহাদের তীর্থপর্য্যটনে তিনি কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ উহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। শেঠজী যখন দেখিলেন যে ইঁহারা তাঁহার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতে একান্ত অনিচ্ছুক তখন অগত্যা তিনি তিনজনের দ্বারকাধাম যাইবার জন্য ষ্টীমারের টিকিট কিনিয়া সুবোধানন্দের হস্তে প্রদান করিলেন।

ষ্টীমারযোগে সাতচল্লিশ ঘণ্টা যাত্রার পর ব্রহ্মানন্দ

সহযাত্রীদের সহিত দ্বারকাধামে উপনীত হইলেন। অনন্ত প্রশান্ত আরব সমুদ্রের নীলবক্ষ হইতে শ্রীশ্রীদ্বারকানাথের শ্রীমন্দিরের চূড়া দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রতটের নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে সম্মুখে অনন্তফেনিল বারিরাশি তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া অবিরাম বেলাভূমির উপর প্রতিহত হইতেছে। অপর দিকে গোমতীর শীর্ণধারা ক্ষীণভাবে সমুদ্রে মিশিয়াছে। আর মধ্যভাগে বিচিত্র সৌধমালার ভিতর আকাশচুম্বী শ্রীদ্বারকানাথের মন্দিরচূড়া শোভা পাইতেছে। শত শত নরনারীর কণ্ঠে উচ্চারিত হইতেছে "জয় দ্বারকানাথ কি জয়", "জয় রণছোড়জী কি জয়"। ষ্টীমার হইতে নৌকাযোগে নামিয়া ব্রহ্মানন্দ সঙ্গিগণসহ শ্রীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী একটী ধর্ম্মশালায় অবস্থান করিলেন।

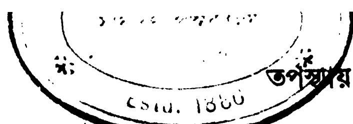
দ্বারকা ধামে তীর্থযাত্রীরা পুণ্যসলিলা গোমতী নদীতে স্নান করা পুণ্যজনক মনে করিয়া থাকে এবং তথায় তীর্থযাত্রার ইহা একটি প্রধান অঙ্গ। ব্রহ্মানন্দ তাঁহার গুরুভ্রাতা ও অপর সঙ্গিসহ তথায় স্নান করিতে গেলেন। কিন্তু স্নানের পূর্ব্বে রাজসরকারের কর্ম্মচারী প্রত্যেকের নিকট হইতে দুই টাকা মাশুল চাহিলেন। যাত্রীরা ইহা দিলে তবে গোমতী স্নানের পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারে। ব্রহ্মানন্দ উক্ত কর দিতে অস্বীকার করিলেন। নিঃসম্বল সঙ্গীদের বলিলেন, "চল আমরা ফিরিয়া যাই।" একজন অর্থশালী ব্যবসায়ী শেঠ তাঁহাদের অস্নাতভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন। শেঠজী নিজেও স্নানার্থী; তিনি ইঁহাদের দেয় মাশুল দিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতে চাহিলেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "গোমতী নদীতে স্নান অপেক্ষা

তীর্থরাজ সমুদ্রে স্নান অধিকতর পুণ্যজনক। বৃথা অর্থব্যয়ের কোন আবশ্যক নাই। আমরা সঙ্গমে সমুদ্রে স্নান করিতে চলিলাম। ব্রহ্মানন্দের ঈদৃশ উক্তি শেঠজীর হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনিও ইঁহাদের পশ্চাতে সমুদ্রস্নানে চলিলেন। ব্রহ্মানন্দের তেজঃপূর্ণ বাক্য ও বৈরাগ্যমণ্ডিত গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া শেঠজী মুগ্ধ হইলেন। তিনি তাঁহার গৃহে ভিক্ষা লইবার জন্য ব্রহ্মানন্দকে সঙ্গিসহ আমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা শেঠজীর গৃহে উপনীত হইলে তিনি ফুলচন্দন দিয়া তাঁহাদের পূজা করিলেন এবং প্রত্যেকের হস্তে একখানি ভগবদ্গীতা গ্রন্থ দিলেন। তিনদিনই শেঠজী তাঁহাদিগকে পরম ভক্তি-সহকারে সেবা করিয়াছিলেন। ভারতের নানাস্থানে তাঁহার কারবার ছিল, তিনি তাঁহার কর্ম্মচারীদের নিকট ব্রহ্মানন্দকে পরিচয় পত্র দিতে চাহিলেন, যাহাতে তীর্থ বা দেশভ্রমণে তাঁহার কোনরূপ ক্লেশ বা অসুবিধা না হয়। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে বলিলেন, "আমার কোন বস্তুর অভাব বা আবশ্যক নাই। সাধু-সন্ন্যাসীর ঈশ্বরই একমাত্র আশ্রয় ও ভরসা।" ইহা শুনিয়া শেঠজী কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আপনার তীর্থভ্রমণের গাড়ী ভাড়া স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ দিতে চাই, অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করুন।" তদুত্তরে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "আমার অর্থ বা কোনরূপ গাড়ীর দরকার নাই। আমি পদব্রজে গমন করিব।" এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দ তথা হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাদের আবাসে চলিয়া গেলেন।

পরদিন ব্রহ্মানন্দ তাঁহার গুরুভ্রাতা ও অপর সঙ্গিসহ নয় ক্রোশ দূরে ভেটদ্বারকা দর্শনে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। তথায় দর্শনাদির পর অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত বোধ করিলে তিনি সুবোধানন্দকে ধর্ম্মশালা

হইতে কিছু ভিক্ষা করিয়া আনিতে বলিলেন। ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষ সাধুসেবার জন্য বাদাম রাখিতেন। সুবোধানন্দ ভিক্ষা চাহিলে অধ্যক্ষ তাঁহাকে কয়েক সের বাদাম ভিক্ষা দিলেন। বাদাম লইয়া ব্রহ্মানন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত বাদাম কে দিয়েছে?" সুবোধানন্দ বলিলেন "ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষ।" ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "আমাদের জন্য দুই ছটাক রেখে বাকগুলি ফিরিয়ে দিয়ে এস।" "সন্ন্যাসীর সঞ্চয় করিতে নাই" শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণী তাঁহার ত্যাগধর্ম্মের মূলমন্ত্র ছিল। তাঁহারা ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যই ভিক্ষা করিতেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কখনও লইতেন না। সুবোধানন্দ দুই ছটাক বাদাম রাখিয়া অবশিষ্টগুলি অধ্যক্ষকে প্রত্যর্পণ করিতে গেলে উহা সে ফেরত লইতে স্বীকৃত হইল না। সুবোধানন্দ ইহা জানাইলে ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "দুই ছটাক রাখিয়াছ তো? অবশিষ্টগুলি দরিদ্রদের মধ্যে বিলাইয়া দাও।"

ভেটদ্বারকা হইতে ফিরিয়া তাঁহারা সুদামাপুরী বা পোরবন্দর যাত্রা করিলেন। সুদামাপুরী হইতে পদব্রজে জুনাগড় হইয়া তাঁহারা গির্ণার পাহাড়ে গেলেন। গির্ণারের অভ্রভেদী চূড়া দেখিয়া ব্রহ্মানন্দ মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার গুরুভ্রাতা ও সঙ্গিলোকটিকে লইয়া সেই উচ্চ চূড়ায় উঠিতে লাগিলেন। প্রায় ১০ মাইল পথ খাড়া চড়াই। তাঁহারা তিনজন ধীরে ধীরে প্রখর রৌদ্রে সেই দুরারোহ পথ অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলেন। দেহ ঘর্ম্মাক্ত, শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া আসিতেছে কিন্তু উপরে না পৌছান পর্য্যন্ত কোন উপায় নাই। এই পথ চলিতে তাঁহাদের অত্যন্ত ক্লেশ হইল। কিন্ত



যখন তাঁহারা পর্ব্বতশীর্ষে উঠিলেন তখন স্থানটির মনোরম দৃশ্যে ও শ্রান্তিহর সুমন্দপবনে তাঁহাদের সমুদায় কষ্ট যেন চলিয়া গেল। এই পর্ব্বত আরোহণে ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মানন্দের সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ছিল। গির্ণার পর্ব্বতে অশোকস্তম্ভ, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও মুসলমান যুগের প্রাচীন জীর্ণ মন্দিরাদি, সমাধিক্ষেত্র এবং খাপরা-খোদিগুহাদি পথে চলিতে চলিতে তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। ৺শিবরাত্রি ব্রত তাঁহারা এই পাহাড়ের উপরেই উদ্‌যাপন করিলেন। তথায় বাস করিবার সময় তাঁহারা নীচে পাহাড় সংলগ্ন জঙ্গলে কোন কোন দিন সিংহগর্জ্জন শুনিতে পাইতেন।

গির্ণার হইতে অবতরণ করিয়া ব্রহ্মানন্দ সঙ্গিদ্বয়সহ পদব্রজে গুজরাটের মধ্য দিয়া আমেদাবাদে আসিলেন। তথায় দুই এক দিন বিশ্রাম করিয়া তাঁহারা পুনরায় অন্যান্য তীর্থ পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন।

প্রথমে তাঁহারা পুষ্করতীর্থে আসিয়া পৌঁছিলেন। স্থানটী অতি মনোরম দেখিয়া ব্রহ্মানন্দ তথায় ৮।৯ দিন বাস করিলেন। এখানে একটী বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী তাঁহাদিগকে খুব আদর যত্নসহকারে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ তাঁহার সরল ব্যবহার ও আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। দৈবক্রমে তাঁহাদের সঙ্গী পরিব্রাজকটী প্রবল জ্বররোগে আক্রান্ত হন। জ্বর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তথায় চিকিৎসার সুবিধা না থাকায় ব্রহ্মানন্দ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি ও সুবোধানন্দ দুইজনে মিলিয়া অতিকষ্টে তাঁহাকে আজমীর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য লইয়া আসিলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে জানাইলেন, "ইঁহার নিউমোনিয়া হইয়াছে।" আর কোন উপায়

নাই দেখিয়া অগত্যা তাঁহারা তাঁহাকে হাসপাতালে রাখিয়া আসিলেন। যথাবিধি চিকিৎসা ও পথ্যাদির সুবন্দোবস্ত বিষয়ে ডাক্তারের প্রতিশ্রুতি পাইয়া তাঁহারা পুষ্করে ফিরিয়া গিয়া শ্রীবৃন্দাবনের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে ব্রহ্মানন্দের এই দ্বিতীয়বার আগমন। পূর্ব্বে একবার শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাদেহে বর্ত্তমান থাকিতে শ্রীযুত বলরামবাবুর সঙ্গে তথায় আসিয়াছিলেন। সে একদিন আর আজ একদিন! শ্রীরামকৃষ্ণ-বিরহে আজ ব্রহ্মানন্দের প্রাণে দারুণ অশান্তি। বৎসরের পর বৎসর চক্রনেমির মত আবর্ত্তিত হইতেছে, জপ, ধ্যান সাধন ভজনে মন ঊর্দ্ধস্তরে গিয়া তন্ময় বা সমাহিত হইয়াও আজ ব্রহ্মানন্দের প্রাণে শান্তি নাই! কেন এই অশান্তি? ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ বিরহজনিত অন্তরের অন্তরতম হইতে বেদনার মূক অনুভূতি। কোন অবস্থাতেই মনে শান্তি নাই। শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে তাঁহার এই প্রবল অশান্তির একটা অস্পষ্ট আভাস তিনি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ২৯শে মার্চ্চ তারিখের পত্রে শ্রীযুত বলরামবাবুকে জানাইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, "তাঁহার লীলা কেহ বুঝিতে পারে না। জ্ঞানী হউক আর অজ্ঞানী হউক, সৎকর্ম্ম করুক আর অসৎকর্ম্ম করুক, সুখদুঃখ কর্ম্মানুসারে সকলকেই ভোগ করিতে হয়। এ জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ এবং শান্তিতে অবস্থান করে—এমত লোক অতি বিরল। বিশেষ ভাগ্যবান তিনিই—যিনি সকল বাসনা হইতে মুক্ত হইয়াছেন, বোধ করি শান্তিরাজ্যে তাঁহারই অধিকার। এ জগতে সুখের ভাগ অতি অল্প, দুঃখের ভাগই অধিক এবং এই দুঃখময় জীবন লইয়া সকলেই

দিন অতিবাহিত করিতেছে। জগদীশ্বর পরম দয়াময় হইয়া কেন তাঁহার জীবকে কষ্টভোগ করান, ইহার গূঢ়ভাব তিনিই জানেন, সামান্য জীবের জানিবার কোন উপায় নাই, জীবের এত কষ্ট কেবল "আমি" এবং "আমার" এই অজ্ঞান বশতঃ। যাহার অহংকার একেবারে পরিত্যাগ হইয়াছে, মন, বুদ্ধি, প্রাণ যিনি সেই জগদীশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছেন—আমার বলিতে কিছুই নাই, এমত ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান এবং যথার্থ সুখী। জীবের নিজের কোন বিষয় করিবার ক্ষমতা কিছুমাত্র নাই সর্ব্বদা তাঁহার নিকট প্রার্থনা ভিন্ন অন্য উপায় কিছু নাই—হে জগদীশ্বর আমি কিছুই নই, এই চৈতন্য যেন থাকে এবং তুমি সত্য এই বোধ যেন সর্ব্বদা থাকে। তাহা হইলে অজ্ঞান তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বলিতেন, স্ত্রীপুত্রাদিতে যেরূপ লোকের আসক্তি এবং ভালবাসা, ভগবানের নিমিত্ত কটা লোকের সেরূপ ভালবাসা হয়? বোধকরি শতাংশের এক অংশ জীব ভগবানকে ভালবাসিতে পারে না এবং কটা লোকই বা ভালবাসিতে চেষ্টা করে।

"বাহ্যজগত হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে এবং বাহ্যজগতে মন থাকিতে বড় ভালবাসে, ইহাই মনের স্বধর্ম্ম। এই মনকে সর্ব্বপ্রকারে বাহ্যবস্তু হইতে উঠাইয়া লইয়া সেই হরি পাদপদ্মে স্থিতি করা—ইহা কেবল ভগবানের কৃপা না হইলে কোনমতে হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

"উপস্থিত আমার মনের অবস্থা বড় ভাল নহে। যত দিন যাইতেছে ততই অজ্ঞানতা এবং অশান্তিতে মনকে জড়ীভূত করিতেছে। সাধন ও ভজন দ্বারা মনে শান্তি পাইব এরূপ আশা নাই। যেমন

পক্ষীর পক্ষ না থাকিলে উড়া অসম্ভব, তদ্রূপ অনুরাগবিহীন সাধনভজনের চেষ্টা আমার পক্ষে বিফল হইতেছে। জানিনা কতদিন আমাকে এরূপ অশান্তিতে এবং মনঃকষ্টে কালযাপন করিতে হইবে। শ্রীশ্রীজগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি এবং আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন সত্বর দেহাদি ভাব হইতে মুক্ত হইতে পারি। এ জনমে আর কোন আশা নাই। এখন বাঁচিয়া থাকা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। আশীর্ব্বাদ করুন যেন গুরুপাদপদ্মে মিশিয়া যাই, আর আমার কোন বাসনা না থাকে।"

যিনি ভগবান লাভের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে কঠোর সাধনভজন করিয়াছেন, যিনি দক্ষিণেশ্বরে এবং অন্যান্য স্থানে ঈশ্বরপ্রসঙ্গে বা নাম সঙ্কীর্ত্তনে কতবার বাহ্যসংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিয়াছেন, যিনি নর্ম্মদার তীরে একাদিক্রমে ছয়দিন সমাহিত অবস্থায় ছিলেন—তাঁহার আজ কিসের অশান্তি? কিসের জ্বালা? কে বুঝিবে?

তাই মনে হয় ইহা সম্ভবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণবিরহ-জনিত নিবিড় ব্যথার অস্ফুট আভাস। কিছুতেই শান্তি নাই—জীবনে ভীষণ নৈরাশ্যজনিত দুঃখ,—যাহা চাওয়া যায় তাহা যেন পাওয়া যায় না। লীলাময় বিগ্রহকে লইয়া যে আনন্দ, যে প্রেমসম্ভোগ ইনি করিয়াছেন, আধ্যাত্মিক রাজ্যের বিভিন্ন স্তরে যে সকল অপূর্ব্ব বিকাশ তাঁহাতে দেখিয়াছেন—তাঁহার অন্তর্দ্ধানে স্বীয় জীবনে ঐ সব অনুভূতি সম্যক পরিস্ফুট না হওয়ায় অশান্তির প্রবল আগুনে যেন তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছিল।

শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া ব্রহ্মানন্দ কি যেন এক অপূর্ব্ব ভাবে তন্ময় হইয়া

থাকিতেন। সুবোধানন্দ তাঁহাকে কোথাও কখন ভিক্ষা করিতে দেন নাই এবং এখানেও দিতেন না। তিনি নিজে ভিক্ষা করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতেন। ব্রহ্মানন্দ ব্রজধামে সর্ব্বদাই অন্তর্মুখী হইয়া রহিতেন বলিয়া বাহ্যবিষয়ে তাহার কোনই খেয়াল থাকিত না। তিনি যে ঘরে বাস করিতেন সেখানে অহর্নিশি শুধু নামজপ ও ধ্যানে নিমগ্ন এবং তন্ময়; কচিৎ কোন দিন সুবোধানন্দের সহিত বাক্যালাপ হইত। তাঁহার প্রতি ব্রহ্মানন্দের এইমাত্র নির্দ্দেশ ছিল যে ভিক্ষালব্ধ তাঁহার আহার্য্য গৃহকোণে রাখিয়া তিনি চলিয়া যাইবেন। নিয়মিত সময়ে উঠিয়া তিনি আহার করিবেন। যেদিন সুবোধানন্দের ভিক্ষা হইতে ফিরিতে বিলম্ব হইত এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে ব্রহ্মানন্দ তাঁহার আহার্য্য দ্রব্য না দেখিতেন—সেদিন পুনরায় তাঁহার সাধনস্থানে আসিয়া বসিতেন—তাঁহার আহার হইত না। সুবোধানন্দ পরদিন দেখিতেন যে আহার্য্যদ্রব্য তিনি যেমন রাখিয়া গিয়াছিলেন তেমনই আছে। ব্রহ্মানন্দের জন্য সুবোধানন্দ পাঁচরকম ব্যঞ্জন ভিক্ষা করিয়া আনিতেন কিন্তু তিনি দেখিতেন ব্রহ্মানন্দ একটী ব্যঞ্জন ব্যতীত অপরগুলি স্পর্শই করেন নাই। এই কঠোরতা তাঁহার ইচ্ছাকৃত বা চেষ্টা করিয়া নয়, তিনি সাধনায় এত তন্ময় ও বিভোর হইয়া থাকিতেন যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার অনেক সময়ে বোধ থাকিত না। শরীর ধারণোপযোগী সামান্য কিছু আহার করিলেই হইল। অনেক ত্যাগিপুরুষ বা সাধক স্থূলবিষয়ে ত্যাগ করিতে পারেন কিন্তু রুচিমত সুস্বাদু দ্রব্যের আস্বাদনের সূক্ষ্ম আকাঙ্ক্ষা সহজে যায় না। ভক্তিশাস্ত্রে ইহা জিহ্বা-লাম্পট্যের অন্যতম লক্ষণ। উত্তরকালে কথাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ বলিতেন

"স্থূলবিষয়ের ত্যাগ অপেক্ষা সূক্ষ্ম বাসনার ত্যাগ অত্যন্ত কঠিন সূক্ষ্ম বাসনার মধ্যে জিহ্বা-লাম্পট্য আরও কঠিন। উচ্চ আধ্যাত্মিব অবস্থায় এই সূক্ষ্ম লালসার ত্যাগ হয়।" ব্রহ্মানন্দের এই অপূর্ব কঠোরতা ও তন্ময়তার কথা সুবোধানন্দ কাহারও কাহারও নিকটে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "দিন নাই, রাত্রি নাই মহারাজ (ব্রহ্মানন্দ) একাসনে বসিয়া তন্ময়ভাবে ডুবিয় থাকিতেন। কথাবার্ত্তা প্রায় বলিতেন না।" শ্রীযুত বলরাম বাবুকে ব্রহ্মানন্দ পত্রে লিখিয়াছিলেন, "যাঁহার অহঙ্কার একেবারে পরিত্যাগ হইয়াছে, মনবুদ্ধি প্রাণ যিনি সেই জগদীশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছেন, আমার বলিতে কিছুই নাই এমত ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান।" ইহারই কি বাহ্য আকার—এই ধ্যান তন্ময়তা? বাহ্যবস্তু হইতে মনকে সর্ব্বপ্রকারে আকর্ষণ করিয়া "হরিপাদপদ্মে স্থিতি" করিলে কি এই তন্ময়তা লাভ করিতে পারা যায়?

কোন কোন দিন ব্রহ্মানন্দ শ্রীবিগ্রহ দর্শনে মন্দিরে যাইতেন। পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এই সময়ে শ্রীশ্রীগোপীনাথ মন্দিরের বাগানের মধ্যে বাস করিতেছিলেন। তিনি তখন তিলকমালা ধারণ করিয়া ভক্তি অঙ্গের সাধনায় ব্রজবাসী বৈষ্ণবদের সঙ্গে সর্ব্বদা কীর্ত্তনাদি করিতেন। ব্রহ্মানন্দ মন্দির দর্শনের সময় সুবোধানন্দের নিকট বিজয়কৃষ্ণের কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। দক্ষিণেশ্বরে ও কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে উভয়েই ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলেন। অনেক দিন পরে তাঁহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলে উভয়েই খুব আনন্দিত হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে সুবোধানন্দ আসিয়া ব্রহ্মানন্দের

কঠোর সাধনভজনের কথা বিজয়কৃষ্ণকে জানাইয়াছিলেন। গোঁসাইজী কথাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দকে বলিলেন, "পরমহংসদেব আপনাকে তো সব রকম সাধনভজন অনুভূতি দর্শনাদি করিয়ে দিয়েছেন, তবে আপনি এখন কেন আবার কঠোর সাধনা করছেন?" ব্রহ্মানন্দ মৃদুস্বরে তাঁহাকে বলিলেন, "তাঁর কৃপায় যে সব অনুভূতি দর্শন হয়েছে, এখন সেগুলি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছি মাত্র।" গোঁসাইজী বুঝিলেন যে ব্রহ্মানন্দ এখন প্রবল অনুরাগের বন্যায় প্লাবিত হইতেছেন—তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে যাওয়া বৃথা।

একদিন গোঁসাইজী সুবোধানন্দের নিকট শুনিতে পাইলেন যে ব্রহ্মানন্দের জ্বর হইয়াছে। ইহা শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে ব্রহ্মানন্দের কোন মশারি নাই। সুবোধানন্দের নিকট তিনি জানিলেন যে ব্রহ্মানন্দ সারারাত বসিয়া জপধ্যান করেন। বৃন্দাবনের ভীষণ মশার উপদ্রবের মধ্যে ব্রহ্মানন্দের মশারি নাই জানিতে পারিয়া গোঁসাইজী তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন এবং ঐ দিনই তিনি মশারি পেরেক ও দড়ি প্রভৃতি লইয়া আসিয়া নিজেই মশারিটী অতি সুন্দর ভাবে টান করিয়া খাটাইয়া দেন। পরে ব্রহ্মানন্দের নাড়ী দেখিয়া তিনি কাগজে ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া একটী ঔষধ সেবন করিতে তাঁহাকে বলেন। ব্রহ্মানন্দ উক্ত ঔষধ সেবন করিতে ইতস্ততঃ করাতে গোঁসাইজী তাঁহাকে বলেন, "আমার ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ সেবনে আপনার কোন ভয়ের কারণ নেই। আমি মেডিকেল কলেজে কিছুদিন পড়েছি—চিকিৎসাও করেছি। আমাদের সময় বাঙ্গালা বিভাগ ছিল। আমি আপনাকে জোর করে বলতে পারি, এই

ঔষধেই আপনার উপকার হবে।" গোঁসাইজীর আগ্রহে ও যত্নে তিনি তাঁহার প্রদত্ত ঔষধ সেবন করিলেন। এই ঔষধেই তিনি শীঘ্র জ্বরমুক্ত হইলেন। মাঝে মাঝে গোঁসাইজীর সহিত তাঁহার ভগবদপ্রসঙ্গ হইত।

ব্রহ্মানন্দ উত্তরাখণ্ডে যাইবেন এই আশাতেই সুবোধানন্দ বিবেকানন্দের আদেশে তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। তিনি বলরামবাবুর পত্রে জানিতে পারিলেন যে একে একে তাঁহার গুরুভ্রাতারা অনেকেই হরিদ্বারে চলিয়া গিয়াছেন। সুবোধানন্দও তথায় যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তিনি দেখিলেন ব্রহ্মানন্দ অহর্নিশ এত তন্ময় হইয়া থাকেন তাঁহার উত্তরাখণ্ডে যাওয়া হইবে কিনা সন্দেহ। একদিন সুবোধানন্দ তাঁহার নিকট হরিদ্বার গমনের প্রস্তাব উঠাইলেন, তিনি উত্তরে তাঁহাকে বলিলেন, "আমি হেঁটে এত পথ বোধ হয় যেতে পারব না, তাই এবার সেখানে যাবার সংকল্প ত্যাগ করলুম। তোর যদি যাবার ইচ্ছে হয়ে থাকে তবে তুই যা। আমার জন্য তোকে ভাবতে হবে না। রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড ব্রজপরিক্রমা শেষ করে যাস।" সুবোধানন্দ তখন একেবারে তরুণ যুবক। তিনি ব্রহ্মানন্দের আদেশ ও অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া একদিন ব্রজমণ্ডলাদি পরিক্রমার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড এবং ব্রজমণ্ডলের কতকাংশ পরিক্রমা করিয়া আর তিনি ফিরিয়া আসিলেন না। তিনি পদব্রজে উত্তরাখণ্ডের দিকে রওনা হইলেন।

ব্রহ্মানন্দ এখন ব্রজধামে একাকী বাস করিতে লাগিলেন। সুবোধানন্দ নাই আর কে তাঁহাকে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া খাওয়াইবে? ব্রহ্মানন্দ সেজন্য বিন্দুমাত্র অসুবিধা বোধ করিলেন না। যেদিন

আহার করিবার খেয়াল হইত সেদিন তিনি জীবনধারণের জন্য কখনও মাধুকরী বা কখন কোন কুঞ্জে ভিক্ষা করিতেন। একাকী নিঃসঙ্গ হইয়া কঠোর তপস্যায় তিনি আত্মনিয়োগ করিতে লাগিলেন।

একদিন সহসা রাখাল দেখিলেন শ্রীযুত বলরামের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি। বলরাম যেন হাসিতে হাসিতে দিব্যলোকে চলিয়া যাইতেছেন। ব্রহ্মানন্দ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভাবিলেন এ কি? তবে কি বলরামবাবু মর্ত্ত্যধাম ছাড়িয়া গেলেন? তাঁহার মন তাঁহার জন্য চিন্তাভারাক্রান্ত হইল। তিনি যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়তম অন্তরঙ্গ ভক্ত, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একান্ত হিতৈষী বন্ধু, তিনি যে তাঁহার পরমাত্মীয় গুরুভ্রাতা! তাঁহার মনে বলরামবাবুর সম্বন্ধে কত অতীত স্মৃতি জাগ্রত হইল। তিনি যে তাঁহাকে সহোদরাধিক ভালবাসিতেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে লইয়াই তাঁহার সহিত যে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এ তো মায়িক বন্ধন নয়, এ যে আধ্যাত্মিকতার পরম প্রেমসূত্র! ব্রহ্মানন্দ তাঁহার জন্য উদ্বিগ্ন হইলেন। পরদিন তিনি সংবাদ পাইলেন যে বলরামবাবু সত্য সত্যই পূর্ব্বদিন দেহত্যাগ করিয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দ হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন। এই বৃন্দাবনে তাঁহার কত স্মৃতি বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিলেন ইহাও মহামায়ার বন্ধন—সোনার শৃঙ্খল! মনের এই স্রোতকেও নিরুদ্ধ করিতে হইবে। তিনি হিমালয়ের বিজন পার্ব্বত্য-প্রদেশে একাকী কঠোর সাধনায় সমাহিত হইয়া থাকিবার জন্য দৃঢ়-সংকল্প হইলেন। ব্রহ্মানন্দ ব্রজভূমি অবিলম্বে ত্যাগ করিয়া হরিদ্বার অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

প্রত্যাবর্ত্তন

পুণ্যসলিলা গঙ্গাবিধৌত হিমালয়ের সুপবিত্র পরম রমণীয় তপোভূমি হরিদ্বারে আসিয়া ব্রহ্মানন্দ আনন্দিত হইলেন। সম্মুখে পশ্চাতে আশেপাশে নিকটে ও দূরে অভ্রভেদী শৈলশ্রেণী, পাদপ-লতাগুল্ম পরিবৃত বিজন অরণ্য এবং মাঝে মাঝে সর্ব্বত্যাগী সাধু-তপস্বীদের কুটীর তাঁহার মনে এক শান্ত গম্ভীরভাব উদ্রেক করিয়া দিল। তিনি জনকোলাহল বর্জ্জিত কনখলের এক নিভৃত স্থানে একটী পর্ণকুটীরে বাস করিয়া কঠোর সাধনায় নিরত হইলেন। কোন দিন তিনি ভিক্ষায় বাহির হইতেন আবার কোন কোন দিন সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টভাবে ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি বাহ্যবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া ধ্যানে তন্ময় থাকিতেন। কঠোর সংযম ও একাগ্র ধ্যানে সমগ্র ইন্দ্রিয়দ্বার নিরোধপূর্ব্বক শান্ত সমাহিতচিত্তে তিনি সর্ব্বদা এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করিতেন। দিনের পর দিন তিনি এইরূপ একাসনে গভীর তন্ময়তার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। উত্তরকালে তাঁহার এই তপস্যাপূত স্থানেই রামকৃষ্ণ মিশনের সুবৃহৎ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ব্রহ্মানন্দের গুরুভ্রাতারা অনেকেই তখন হৃষীকেশে তপস্যা ও সাধনভজনে নিরত ছিলেন। বিবেকানন্দ বরাহনগর মঠ হইতে হৃষীকেশে গিয়া কঠোর তপশ্চর্য্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি তথায় গুরুতর পীড়িত হইলেন এবং একদিন বাহ্যসংজ্ঞা হারাইয়া মৃতবৎ

শয্যায় পড়িয়াছিলেন। গুরুভ্রাতারা চিকিৎসক অভাবে তাঁহার জন্য মহা চিন্তিত ও ব্যস্ত হইলেন। এমন সময় তাঁহাদের ঝুপড়ীর দ্বারদেশে একটী সাধু আসিয়া মধু দিয়া পিপ্পলীচূর্ণ তাঁহাকে সেবন করাইতে বলিলেন। উক্ত ঔষধ সেবনের কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার চেতনার সঞ্চার হইল। গুরুভ্রাতারা লক্ষ্য করিলেন তাঁহার মুখমণ্ডল যেন দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত। কয়েক দিন পরে বিবেকানন্দের শরীর সুস্থ হইলে তাঁহারা হকিমী চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে দিল্লী লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহারা শুনিতে পাইলেন যে ব্রহ্মানন্দ কনখলে তপস্যায় নিরত রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য বিবেকানন্দের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইল। তিনি সকল গুরুভ্রাতাদিগকে সঙ্গে লইয়া কনখলে ব্রহ্মানন্দের নিকট গমন করিলেন। অনেক দিন পরে পরস্পরের সাক্ষাৎ হওয়ায় সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। বিবেকানন্দ তাঁহাকে বলিলেন, "চল, এখানে আর নয়, আমাদের সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে।" বোধ হয় তাঁহার নিজের রুগ্ন অবস্থা দেখিয়া তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল পাছে কঠোর তপস্যা করিতে করিতে ব্রহ্মানন্দ হঠাৎ এই জনহীন স্থানে তাঁহার মত রোগাক্রান্ত হন। এখানে তাঁহাকে দেখিবার কেহ নাই। ব্রহ্মানন্দ নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। বিবেকানন্দের এই প্রীতির আহ্বান তিনি আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; বিশেষতঃ তাঁহাকে রুগ্ন ও ভগ্নস্বাস্থ্য দেখিয়া ব্রহ্মানন্দও মনে মনে ক্লেশ অনুভব করিতেছিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন তাঁহার চিকিৎসার জন্যই তাঁহারা সকলে মিলিয়া দিল্লী যাইতেছেন সুতরাং উদ্বিগ্নচিত্তে তিনিও তাঁহাদের সঙ্গী হইলেন।

অখণ্ডানন্দ মীরাটে আছেন শুনিয়া ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন; কেন না অনেক দিন তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ নাই। ব্রহ্মানন্দের আগ্রহ দেখিয়া তাঁহারা সকলে মিলিয়া সাহারাণপুর হইতে মীরাটে চলিয়া গেলেন। স্বামিজীর স্বাস্থ্যের জন্য তথায় তাঁহারা কিছুদিন অবস্থান করিলেন। সেখানে ধ্যান ভজন শাস্ত্রপাঠ নিয়মিত ভাবে চলিতে লাগিল। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে বিবেকানন্দ সুস্থবোধ করিয়া একাকী দিল্লী চলিয়া গেলেন। গুরুভ্রাতারাও তাঁহার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া কয়েকদিন পরে তাঁহার নিকট তথায় গমন করিলেন। বিবেকানন্দ তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রীত হইলেন। হঠাৎ একদিন তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, "তোমরা আমার সঙ্গ ত্যাগ কর। আমি ভিতর থেকে ইঙ্গিত পাচ্ছি আমাকে একা থাকতে হবে। তোমরা যাও, যেমন ধ্যান-ভজন তপস্যা করচ—তেমনি কর। প্রভুর ইচ্ছা হলে আবার সকলে মিলিত হব।" বিবেকানন্দ একাকী চলিয়া গেলেন। ইহার প্রায় আট দিন পরে ব্রহ্মানন্দ তুরীয়ানন্দকে (হরি মহারাজ) বলিলেন, "জ্বালামুখী দেখতে ইচ্ছে হয়েছে। যদি আপনি যান তো যাই।" তুরীয়ানন্দ সানন্দে স্বীকৃত হইলেন। তাঁহারা উভয়ে জ্বালামুখী যাত্রা করিলেন। ব্রহ্মানন্দের মনে পড়িল যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে তুরীয়ানন্দের পবিত্র সঙ্গ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তীর্থভ্রমণে তাহা পূর্ণরূপে পালিত হইয়াছিল। তাঁহারা একত্রে প্রায় ছয় বৎসরকাল বিভিন্ন সময়ে বহু স্থানে সাধনভজন ও তীর্থপর্য্যটন করিয়াছিলেন। তুরীয়ানন্দ জ্ঞান-ভক্তির সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি ছিলেন। শাস্ত্রে ইঁহার গভীর জ্ঞান ও

অভিনিবেশ ছিল। একাধারে কঠোর তপস্যা, গভীর ধ্যানতন্ময়তা এবং তীব্র বৈরাগ্য তাঁহার সমগ্র জীবনকে মহিমান্বিত করিয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ তাঁহার সঙ্গলাভে বড়ই আনন্দ পাইতেন।

পাহাড়ের পাদতলে গোপীনাথপুরে জ্বালামুখীর মন্দির অবস্থিত। জ্বালামুখীতে তাঁহারা কিছুকাল বাস করেন। তাঁহাদের কঠোর বৈরাগ্য ও ধ্যাননিষ্ঠা দেখিয়া মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ও স্থানীয় কতিপয় বিশিষ্ট লোক মুগ্ধ হইয়াছিলেন। জ্বালামুখী হইতে তাঁহারা কাংড়া বৈজনাথে গিয়াছিলেন। তথা হইতে তাঁহারা পাঠানকোট, গুজরাণওয়ালা, লাহোর, মণ্টগুমরী, মূলতান ও সক্করের নিকট সাধুবেলায় যান। সাধুবেলার মঠ একটী দ্বীপের উপর অবস্থিত। তথাকার মোহান্ত তাঁহাদের কঠোর বৈরাগ্য ও একান্তভাবে সাধন ভজনে দৃঢ় অনুরাগ দেখিয়া তাঁহাদের বিশেষ যত্ন করেন এবং কিছুদিন তথায় থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তীর্থভ্রমণ কালে তাঁহারা প্রত্যেক তীর্থে দেবমন্দিরে কয়েকদিন করিয়া অবস্থান করিতেন। ব্রহ্মানন্দ যে তীর্থে যাইতেন এবং মন্দিরে যে দেব দেবীর বিগ্রহ দর্শন করিতেন তিনি সেইভাবে তন্ময় হইয়া যাইতেন। প্রত্যেক তীর্থেই একাহারী হইয়া নিষ্ঠার সহিত অহর্নিশ জপধ্যান ও সাধনভজনে নিমগ্ন থাকিতেন। সাধুবেলা হইতে তাঁহারা করাচীতে চলিয়া যান এবং তথা হইতে জাহাজে বোম্বাইনগরে গমন করিলেন।

বোম্বাই সহরে প্যাখেল রোডে (Packell Road) তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগী ভক্ত শ্রীযুত কালীপদ ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তথায় অপ্রত্যাশিতভাবে বিবেকানন্দের

সহিত তাঁহারা মিলিত হন। চিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভায় গমন করিবার উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দ বোম্বাই আসিয়াছিলেন। গুরুভ্রাতাদের নিকট তখন তাঁহার অজ্ঞাতভ্রমণ চলিতেছিল। বহুদিন পরে ব্রহ্মানন্দকে দেখিয়া তিনি যারপরনাই প্রীতিলাভ করিলেন।

এদিকে ক্ষেত্রীর জনৈক রাজকর্ম্মচারী বিবেকানন্দকে ক্ষেত্রীতে লইয়া যাইবার জন্য মান্দ্রাজ হইতে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ক্ষেত্রীর রাজাসাহেবের একান্ত অনুরোধে নবজাত রাজকুমারকে আশীর্ব্বাদ করিতে তিনি বোম্বাই হইতে ক্ষেত্রী অভিমুখে রওনা হইলেন। ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দ আবুরোড ষ্টেসন পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে গমন করেন। তাঁহারা উভয়ে আবুরোড ষ্টেশনে নামিয়া পড়িলেন। কয়েক দিন পরে ফিরিবার সময় বিবেকানন্দের সহিত উভয়ের পুনরায় আবুরোডের ষ্টেশনে সাক্ষাৎ হইল। কারণ তাঁহারা উভয়ে নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য তথায় প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি উভয়কে দেখিয়া উৎফুল্ললোচনে গাড়ী হইতে নামিলেন। তিনি তুরীয়ানন্দকে বলিলেন, "রাজাকে ছেড়ে দাও, সে একলা বেড়াক। তুমি মঠে ফিরে যাও, সেখানে অনেক কাজ আছে।" ট্রেন ছাড়িতেছে দেখিয়া তাঁহারা পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

আবুপাহাড়ে ব্রহ্মানন্দ সাধনভজনে এত তন্ময় হইয়া থাকিতেন যে শরীরের দিকে তাঁহার আদৌ দৃষ্টি থাকিত না। বিবেকানন্দের আদেশ থাকা সত্ত্বেও তুরীয়ানন্দ এই অবস্থায় ব্রহ্মানন্দকে একাকী ফেলিয়া যাইতে পারিলেন না। তুরীয়ানন্দ ভিক্ষা করিয়া ব্রহ্মানন্দকে খাওয়াইতেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি নিজেও কঠোর সাধনভজনে নিরত থাকিতেন। আবুপাহাড়ে

যোধপুরের দেওয়ান শ্রীযুত শরৎ চন্দ্র চৌধুরী তাঁহাদের নিকট যাইতেন এবং বিশেষ যত্ন লইতেন। কিছুদিন পরে তাঁহারা পাহাড় হইতে নামিয়া আবুরোডে চলিয়া আসেন। তাঁহারা সংবাদ পাইলেন যে অখণ্ডানন্দ বোম্বাই সহরে আসিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে তাঁহাদের নিকট আসিবার জন্য পত্র লিখেন। অখণ্ডানন্দ এতদিন পর্য্যন্ত বিবেকানন্দের সন্ধানে তাঁহার অনুসরণ করিতে করিতে অবশেষে বোম্বাই সহরে আগমন করেন। কিন্তু তিনি পৌছিবার কয়েকদিন আগে বিবেকানন্দ মার্কিণ যাত্রা করিয়াছিলেন। এইরূপ আশাভগ্ন হওয়াতে তিনি মনে মনে অতিশয় ক্ষুণ্ণ এবং অবসন্ন বোধ করিতে লাগিলেন। এইরূপ বিষণ্ণ ও অবসন্ন অবস্থায় "রাজার" সাদর আহ্বান পাইয়া তিনি অবিলম্বে তাঁহার নিকট চলিয়া গেলেন। বহুস্থানে পর্য্যটন হেতু ও নানা কঠোরতায় অখণ্ডানন্দকে ভগ্ন স্বাস্থ্য দেখিয়া তিনি দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। তিন চারিদিন তথায় থাকিয়া তাঁহারা তিনজনেই আজমীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আজমীরে ব্রহ্মার মন্দির ও প্রসিদ্ধ সুফী ফকীর চিস্তিসাহেবের দরগা দর্শন করিয়া তাঁহারা জয়পুরে চলিয়া আসিলেন। তথায় তাঁহারা গোবিন-জীর বিগ্রহ এবং অম্বরের মন্দিরে বঙ্গের প্রতাপাদিত্য প্রতিষ্ঠিত যশোরেশ্বরীর দেবীমূর্ত্তি প্রভৃতি দর্শন করিলেন। জয়পুরের সর্দ্দার হরি সিং শুনিতে পাইলেন যে বিবেকানন্দের কয়েকজন গুরুভ্রাতা আজমীরে আছেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার মুখে গুরুভ্রাতাদের পরিচয় শুনিয়াছিলেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাদের নিকট গিয়া সাদরে তাঁহাদিগকে নিজ গৃহে লইয়া আসিলেন। তথায় তাঁহারা মাসাবধি ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ তখন মনে মনে

শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার জন্য ব্যাকুল। ধনী গৃহী সাদর অভ্যর্থনা ও আন্তরিক ভক্তি দেখাইলেও ব্রহ্মানন্দের সাধনানুরাগী মন তথায় তিষ্ঠিতে পারিতেছিল না। অখণ্ডানন্দের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যই তিনি এতদিন তথায় ছিলেন।

অবশেষে একদিন তিনি অখণ্ডানন্দকে অন্তরালে ডাকিয়া স্বাস্থ্যের জন্য কিছুদিন রাজপুতানায় বাস করিতে তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন এবং বিবেকানন্দের ভক্ত ও শিষ্য খেতড়ির রাজার নিকট আপাততঃ তাঁহাকে থাকিতে বলিলেন। তদনুসারে তিনি ক্ষেত্রী চলিয়া গেলেন। অনন্তর ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দ উভয়ে ত্বরায় শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছিয়া তুরীয়ানন্দ ভাবে পূর্ণ হইয়া ব্রহ্মানন্দকে বলিলেন, "আজ ভিক্ষা করতে বেরুব না, দেখি রাধারাণী উপবাসী রাখেন কি না ?" দুইজনেই ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকিলেন। দিন-রাত্রি এইভাবে কাটিয়া গেল, কাহারও ভিতরে ক্ষুধাতৃষ্ণার জন্য কোন চাঞ্চল্য নাই। পরদিন বেলা নয়টার সময় জনৈক ভক্ত শেঠ অযাচিতভাবে তাঁহাদের জন্য প্রচুর খাদ্যসামগ্রী লইয়া আসিলেন। "জয় রাধারাণীর জয়" বলিয়া সানন্দে তাঁহারা আহার করিলেন। কিছুদিন শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া তাঁহারা ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় বহির্গত হইলেন। উভয়ে পদব্রজে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড নন্দগ্রাম বর্ষাণা প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া অবশেষে কুসুমসরোবরে আসিলেন। তথায় তাঁহারা তপস্যার জন্য কিছুদিন বাস করিতে লাগিলেন। কুসুমসরোবরে শ্যামদাস বাবাজী নামক জনৈক বৈষ্ণব সাধুর উদারতায় ও যত্নে তাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে তুরীয়ানন্দ

স্বয়ং ভিক্ষা করিয়া ব্রহ্মানন্দকে খাওয়াইতেন। তাঁহাকে তিনি কখনও ভিক্ষা করিতে দিতেন না। একদিন কুসুমসরোবরে তিনি ভিক্ষায় কয়েকখানা শুষ্ক রুটী পাইয়াছিলেন—অপর কিছু ব্যঞ্জন বা গুড় কিম্বা চিনি পাওয়া যায় নাই। একটী কূপের ধারে ইঁহারা দুইজনে জলে ভিজাইয়া সেই রুটী খাইতেছিলেন। খাইতে খাইতে তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "মহারাজ! আপনাকে ঠাকুর কত আদর যত্ন করতেন। ক্ষীর, সর, ননী খাওয়াতেন আর আজ আপনাকে আমি শুষ্ক রুটী খাওয়াচ্ছি", ইহা বলিতে বলিতে ভাবাবেগে তিনি অশ্রুধারে প্লাবিত হইলেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দের এই সব বিষয়ে কোন দৃষ্টি ছিল না এবং কোন বাহ্য বিষয়ে ক্লেশবোধ করিতেন না। সর্ব্বদা তিনি তন্ময়ভাবে অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেন। যাহা পান তাহাই তিনি উদারভাবে আহার করেন। কুসুমসরোবর তপস্যা ও সাধনার অনুকূল স্থান—ইহারই সন্নিকটে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড। ব্রজবালকেরা বাঙ্গালী তীর্থ-যাত্রীদের নিকট কিছু ভিক্ষা পাইবার আশায় বলিয়া থাকে, "শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন। মধুর মধুর বংশী বাজে এ্যায়সা বৃন্দাবন।" ভক্তি-পিপাসু বৈষ্ণব ভক্তেরা ইহা শুনিয়াই আনন্দ করিয়া থাকেন। ব্রজধামে এই প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাস যেন গগনে পবনে প্রতিনিয়ত মুখরিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দ অহরহ এই অপার্থিব ভাবে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। ব্রহ্মানন্দের তন্ময়তায় কোন বাহ্য বিষয়ে খেয়াল থাকিত না। তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিবার কয়েকমাস পরে মঠে যাইবার জন্য তুরীয়ানন্দের নিকট ঘন ঘন তাগিদ আসিতে লাগিল। মঠের পত্রেই তুরীয়ানন্দ জ্ঞাত হইলেন যে, মার্কিণে চিকাগো

ধর্ম্ম-মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমবেত বুধমণ্ডলীর সম্মুখে জলদমন্দ্রে হিন্দুধর্ম্মের জয়ধ্বনি তুলিয়াছেন, তাঁহার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যায় দিকে দিকে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। নগ্ন কৌপীনধারী গৈরিক বসন পরিহিত গৈরিক উষ্ণীষধারী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের নাম জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতা, অদ্ভুত প্রাঞ্জল ভাবপূর্ণ শব্দলালিত্য, তাঁহার তেজোময় আকৃতি, তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত আকর্ণ-বিস্তৃত নয়ন তথায় সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছে। পাশ্চাত্য জগতে কতিপয় নরনারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আধ্যাত্মিকভাবে জীবনগঠনে প্রয়াসী হইয়াছে। ভারতেও তাহার প্রবল তরঙ্গ আসিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জয়ধ্বনিতে দশদিক পরিপূরিত হইয়াছে। বরাহ-নগর হইতে আলমবাজারে একটী ভাড়াটিয়া বাড়ীতে মঠ এখন স্থানান্তরিত এবং তথায় নানাদিক হইতে ভক্ত সমাগম হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মমহোৎসব সাধারণভাবে যোগানন্দের উদ্যমে ও চেষ্টায় দক্ষিণেশ্বরে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঠের পত্রাদিতে এই সকল সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তুরীয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দকে জানাইলেন। ইহা শুনিয়া ব্রহ্মানন্দ আনন্দে বিগলিত হইলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলা স্মরণ করিয়া তন্ময় হইয়া গেলেন। মঠে যাইবার জন্য তুরীয়ানন্দের নিকট পুনঃ পুনঃ তাগিদ আসায় বিবেকানন্দের আদেশ তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইল। কতদিন ইহা উপেক্ষা করিয়া এখানে তিনি থাকিতে পারিবেন? অথচ ব্রহ্মানন্দকে একাকী ফেলিয়া তিনি কি করিয়া চলিয়া যাইবেন? অবশেষে একদিন ব্রহ্মানন্দকে সবিস্তারে সমুদায় কথা তিনি জ্ঞাপন করিলেন এবং মঠে যাইবার

জন্য অনুমতি চাহিলেন। তিনি সানন্দে ইহাতে সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, "আমার জন্য কোন চিন্তা কর্‌বেন না। আপনার সেখানে অবিলম্বে যাওয়া দরকার। আপনি চলে যান—সেখানে ঠাকুরের কাজে আপনার ডাক পড়েছে!" তাঁহারা জানেন রণে, বনে, দুর্গমে ও সঙ্কটে একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁহাদের ভরসা। তাঁহার নাম স্মরণ করিয়াই দুইজনে পরস্পর বিদায় গ্রহণ করিলেন। ইহার পর প্রায় বৎসরাবধি ব্রহ্মানন্দ ব্রজধামে বাস করিয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবন ধামে ব্রহ্মানন্দ এখন একাকী কঠোর সাধনভজনে নিরত হইয়া থাকিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, মাসের পর মাস কোথা দিয়া চলিয়া যাইত, তাহা তিনি অনেক সময়ে জানিতে পারিতেন না। একাসনে গভীর ধ্যানে তিনি তন্ময় হইয়া থাকিতেন। এই সময় ব্রহ্মানন্দ অজগর-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কোনদিন তাঁহার আহার জুটিত আবার কোনদিন তাহাও দুর্ঘট হইত। একটী ব্রজবাসী ভক্ত শেঠ তাঁহাকে প্রায় প্রত্যহ আহার্য্য দিয়া যাইত। তিনি তৎকালে কাহারও নিকট কোন বিষয়ে যাচ্ঞা করিতেন না। তিনি মৌনভাবেই একাকী বসিয়া থাকিতেন। একদিন কোন শেঠ তাঁহাকে একখানি কম্বল দিয়া চলিয়া গেল, আবার কিছুক্ষণ পরে অপর একজন আসিয়া তাঁহাকে কিছু না বলিয়াই সেই কম্বলখানি লইয়া চলিয়া গেল! ব্রহ্মানন্দ নীরবে সব দেখিতেছিলেন। ইহাও মহামায়ার অদ্ভুত লীলা জানিয়া তিনি মনে মনে হাসিলেন।

একদিন রাসযাত্রা উপলক্ষে ব্রহ্মানন্দ লালাবাবুর কুঞ্জে গিয়া দেখিলেন যে সুসজ্জিত রাসমঞ্চের সম্মুখে ভজনকীর্ত্তন ও নৃত্য

চলিতেছে! বহু নরনারী ভক্তিভাবে প্রণোদিত হইয়া তথায় বসিয়া আছেন। মঞ্চের সম্মুখে আসীন জনৈক বৃদ্ধ বাবাজী তাঁহাকে দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া হস্তদ্বারা ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং সযত্নে তাঁহার পার্শ্বে তাঁহাকে বসাইলেন। বাবাজী নৃত্য ও ভজনাদির মধ্যেও জপে একাগ্রভাবে রত ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ স্থিরভাবে রাসমঞ্চে দেববিগ্রহ দর্শন ও নৃত্যসহ ভজনাদি শ্রবণ করিতে করিতে তন্ময়ভাবে নিমগ্ন হইতেছিলেন এমন সময়ে বাবাজী ঝোলা হইতে মালাসমেত হাত বাহির করিয়া মালার মেরুটী ব্রহ্মানন্দের ললাটে স্পর্শ করাইলেন। স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অপূর্ব্ব পুলকে রোমাঞ্চিত হইল। এইরূপভাবে জপান্তে প্রতিবার বাবাজী তাঁহাকে মেরুস্পর্শ করাইতে লাগিল এবং প্রত্যেক স্পর্শেই তাঁহার সর্ব্বশরীর পুলকে রোমাঞ্চ এবং অন্তরে ভাবের তন্ময়তা আনিয়া দিতে লাগিল। ঈদৃশ কত অতীন্দ্রিয় দর্শন ও অনুভূতি তৎকালে তাঁহার হইত কে তাহা বলিবে?

এইরূপ কঠোর সাধনভজন ও তন্ময়ভাবে থাকিতে থাকিতে একদিন তাঁহার অন্তরলোক সহসা দিব্যালোকে সমুদ্ভাসিত হইয়া আনন্দরসে পরিপ্লাবিত হইয়া উঠিল। মনের যে অশান্তি যে অভাব যে নৈরাশ্যের দুঃখ তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল তাহা যেন কোথায় অন্তর্হিত হইল। গভীর প্রশান্তি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ঝরিয়া পড়িল এবং আনন্দের নির্ঝর নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চারিদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমগ্র বিশ্ব যেন তাঁহার ভাবস্পন্দনে স্পন্দিত হইল। কে বলিবে ইহা কি?

ব্রহ্মানন্দ ব্রজমণ্ডলে দিব্য বিদেহভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। অহর্নিশ নাম জপ করিতে করিতে কখন ধ্যানে তন্ময় হইয়া যাইতেন, কখন তাঁহার অশ্রু রোমাঞ্চ পুলকাদির সঞ্চার হইত আবার কখন দিব্যভাবে পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া বাহ্যসংজ্ঞা সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলিতেন। এইরূপ ভাবে কয়েকদিন অতীত হইলে একদিন তিনি সহসা ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহাই কি তাঁহার প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দ্দেশ, ইঙ্গিত বা আদেশ? ঠাকুরের গতিমুখর লীলাচক্রে তাঁহার আদেশে তাঁহারই শক্তি-মূর্ত্তি বিবেকানন্দ যে মহাকার্য্য প্রবর্ত্তন করিয়াছেন সেই লীলায় সহায়তা করিবার জন্যই কি তিনি তাঁহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন? তাই কি ব্রহ্মানন্দ এতদিন পরে অকস্মাৎ মধুর ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম-কোলাহল মুখরিত কলিকাতা মহানগরীর কর্ম্মকেন্দ্রে চলিয়া গেলেন? এই রহস্যের উদ্ঘাটন কে করিবে?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সঙ্ঘনায়ক

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দকে যথাক্রমে 'স্বামিজী' ও 'মহারাজ' নামে অভিহিত করা হয়। অতঃপর তাঁহাদিগকে সেই নামেই উল্লেখ করা হইবে। মহারাজের গুরুভ্রাতারা প্রায়ই তাঁহাকে 'রাজা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে মহারাজ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার গুরুভ্রাতাদের মধ্যে একটা মহা আনন্দের সাড়া পড়িল। বহুদিন পরে গুরুভ্রাতাদিগকে দেখিয়া মহারাজও অত্যন্ত উৎফুল্ল ও আনন্দিত হইলেন। 'রাজার' শান্ত সুসমাহিত তন্ময় দিব্য আনন্দ-ঘন মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারা সকলে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার আগমনে সমগ্র মঠ যেন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মঠের প্রাত্যহিক কার্য্যপ্রণালী ও নূতন সাধু ব্রহ্মচারীদিগকে দেখিয়া মহারাজ প্রীতিলাভ করিলেন। তিনি সকলের অন্তরে সাধন-ভজন ও অনুরাগের এক দিব্য প্রেরণা দান করিতে লাগিলেন। প্রায় প্রতিদিনই সকলের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গ তুলিয়া তাঁহার অলোকসামান্য জীবন ও তাঁহার অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মভাবপূর্ণ বাণী স্বীয় অনুভূতিলব্ধ অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝাইতেন এবং তাঁহাদিগকে এই নব আলোকসম্পাতে সাধনপথে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হইবার জন্য উৎসাহিত করিতেন। মহারাজের আবিষ্টভাবে প্রদত্ত কথা ও প্রাঞ্জল উপদেশ তীক্ষ্ণ সায়কের মত প্রত্যেকের হৃদয় বিদ্ধ করিত। তাঁহাকে দর্শন

করিলেই সকলের মনে একটা আনন্দ ও উদ্দীপনার ভাব স্বতঃই পরিস্ফুট হইত।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দ্দেশ মতই স্বামিজী ইতিপূর্ব্বে মঠের ভার বা দায়িত্ব মহারাজের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি সকলের নিকট তাঁহাকেই সঙ্ঘনায়ক বলিয়া উল্লেখ করিতেন। এমন কি মার্কিণ যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে খেতড়ী হইতে তিনি জুনাগড় রাজ্যের দেওয়ান শ্রীযুক্ত হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে সুস্পষ্ট ভাবে লিখিয়াছিলেন, "As the other two swamis, they were my *Gurubhais* who went to you last at Junagad, one of them is our leader." "অর্থাৎ অপর দুইজন স্বামিজী যাহারা গতবারে জুনাগড়ে আপনার নিকট গিয়াছিলেন, তাঁহারা আমার গুরুভাই এবং তন্মধ্যে একজন আমাদের নেতা।" এই দুইজনের নাম স্বামী তুরিয়ানন্দ এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ। স্বামিজী আমেরিকায় অবস্থানকালে শুনিতে পাইলেন যে মহারাজ কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া স্বামিজী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। মঠ ও সঙ্ঘের সুপরিচালনা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন। সময় সময় এইসব বিষয়ের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে স্বামিজী তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ মতামত মহারাজকে লিখিয়া পাঠাইতেন। মহারাজ তাহা পাঠ করিয়া যে সমস্ত বিষয়গুলি বাস্তবক্ষেত্রের উপযোগী মনে করিতেন তাহার ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইতেন। মঠে যদি কখন কোন বিষয় লইয়া কোন মতদ্বৈধ, মনোমালিন্য বা অসদ্ভাবের কারণ আসিয়া উপস্থিত হইত মহারাজের সুমিষ্ট প্রাণস্পর্শী উপদেশে তৎক্ষণাৎ তাহা সহজে মিটিয়া যাইত।

তাঁহার ব্যবহারে ও আচরণে এমন একটী প্রশান্ত আনন্দময় আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ পাইত যেখানে মানুষ সহজেই নত হইয়া পড়ে এবং সকল প্রকার জাগতিক বা মানসিক ভাব তুচ্ছ বোধ হয়। তাঁহার অসামান্ত আধ্যাত্মিক শক্তির সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যপূর্ণ বিকাশে মঠের সকলে মুগ্ধ হইতেন এবং তাঁহার আজ্ঞাবহতা একযোগে স্বীকার করিতেন। যে কোন বিষয়ে হউক 'রাজা'র সিদ্ধান্ত কিংবা মীমাংসা সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া লইতেন। এইভাবে মহারাজ মঠকে একটী আধ্যাত্মিক শক্তির কেন্দ্ররূপে গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন।

মহারাজ কলিকাতায় বলরামবাবুর গৃহে মাঝে মাঝে অবস্থান করিতেন। ফুল ফুটিলে যেমন ভ্রমরের দল আপনি আসিয়া জোটে তেমনি প্রশান্তাত্মা ব্রহ্মানন্দকে দেখিয়া লোকে স্বতঃই আকৃষ্ট হইতে লাগিল। যাহারা তাঁহার নিকট আসিত—তাহারা দেখিতে পাইত তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় মৃদুভাবে অনুক্ষণ নড়িতেছে, চক্ষু মাঝে মাঝে ধ্যান-স্তিমিত, দৃষ্টি ফ্যালফেলে, বদনমণ্ডল হাস্যোৎফুল্ল অপরূপ লাবণ্য-জ্যোতিতে মণ্ডিত এবং তাঁহার শরীর ও বাহ্যিক আকৃতি যেন আনন্দময় শান্ত সুষমায় পূর্ণ হইয়া আছে।

ব্রহ্মানন্দ কলিকাতায় আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার চারিদিকেই বেশ আরম্ভ হইয়াছে। দলে দলে শিক্ষিত চরিত্রবান ধর্ম্মানুরাগী ও ঈশ্বরলুব্ধ যুবকেরা আলমবাজার মঠে নিয়মিত-রূপে যাতায়াত করিতেছে এবং তাঁহারা অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য ত্যাগী সন্ন্যাসিবৃন্দের পবিত্রতা, জ্ঞান, প্রেম ও অমায়িকতায় মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াছে। তাহারা প্রথমে কেহ কেহ চিকাগো ধর্ম্মসভায়

রামকৃষ্ণ-শিষ্য জগদ্বরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দের নাম ও তাঁহার বক্তৃতা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া কৌতূহল বশতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্ন্যাসিমণ্ডলীর সহিত পরিচিত হইতে আসিয়াছিলেন আবার কেহ কেহ তাঁহাকে যুগাবতার জ্ঞানে ও বিশ্বাসে আলমবাজার মঠে গমন করিতেন। মহারাজ—তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অলৌকিক সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ যে মহাশক্তির দিব্য তেজ উদ্দীপিত করিয়া গিয়াছেন তাহার তড়িতসঞ্চারী শক্তিকণা জগতের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং তাঁহার স্পন্দনে সমগ্র বিশ্ব আন্দোলিত হইতেছে। ভাবী কালে ইহা বিরাট মানবজাতির হৃদয় এক অভিনব আধ্যাত্মিক আলোক-রেখায় সমুজ্জ্বল করিবে। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিবার কিছুদিন পরে তিনি বলরামের গৃহে একদিন তাঁহার গুরুভ্রাতা যোগানন্দ ও প্রেমানন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি বৃন্দাবনে বেশ ছিলুম। যাতে মঠের ভাইদের ভিতর তাঁর সেই প্রেম ভক্তি ভাব জীবনে বিকাশ পায়, যাতে তাদের দেখে ঠাকুরের কথা সবাই স্মরণ করতে পারে তাই বৃন্দাবন ছেড়ে তাদের সেবা করতে এলুম। এমন সময়, এমন যুগ তো আর সহজে মিলবে না। তোমাদের জীবন, তোমাদের মঠ দেখে জগতের লোক জুড়ুতে আসবে, ঠাকুরের আশ্রয় নিয়ে তারা ত্রিতাপজ্বালা থেকে শান্তি পাবে। তাইতো বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসেছি।" সকলেই স্তব্ধ হইয়া তাঁহার কথাগুলি শুনিলেন। বাস্তবিকই তাঁহাকে দেখিলে এবং তাঁহার কথা শুনিলে মনে হইত তিনি আধ্যাত্মিক রত্নগুলি বিতরণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছেন।

কলিকাতায় বলরামের গৃহে যখন মহারাজ অবস্থান করিতেন তখন তাঁহাকে দর্শন করিতে এবং তাঁহার শান্তিপ্রদ বাণী শুনিতে লোকের সমাগম হইত। কেহ কেহ আবার তাঁহার নিকট নানা বিষয়ের পরামর্শ লইতে আসিত। ইঁহাদের মধ্যে কেহ যুবক, কেহ কিশোর ছাত্র, কেহ চাকরিজীবী প্রৌঢ় এবং কেহ কেহ প্রবীণ বৃদ্ধ। মহারাজ প্রত্যেকের সঙ্গে যেন সমবয়সী হইয়া আলাপ-আলোচনা এবং রহস্য-কৌতুক করিতেন। তাঁহারা দ্বিধাহীন হইয়া অসঙ্কোচে অকপটে তাঁহার নিকট সকল কথা বলিতে পারিতেন। ইহাই ছিল তাঁহার প্রবল আকর্ষণ। মানুষ তাঁহার নিকট উন্মুক্তহৃদয় হইয়া শান্তি লাভ করিত। তাঁহারা বুঝিতেন যে ইনি তাঁহাদের যথার্থ কল্যাণকামী, ইহপরকালের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং অশান্ত হৃদয়ের একমাত্র শান্তিদাতা। তাই তাঁহারা মহারাজের প্রত্যেক উপদেশ বা নির্দ্দেশ গভীর শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া জীবনে পালন করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। সর্ব্বদা অন্তর্মুখী স্থিতপ্রজ্ঞ দিব্যভাবে অবস্থিত মহারাজ এইরূপে জীবহিতকল্পে মানুষের বিশাল অন্তররাজ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। এই অন্তর্জ্জগতের ব্যাপারেই তিনি একচ্ছত্র অধিপতি বা "রাজা" ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন, তাঁহারা ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন।

অনেক সময় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিত। তাহারা মনে করিত যেন মহারাজ তাহাদের ক্রীড়াসঙ্গী। তিনিও তাহাদের সহিত এমনভাবে নানারকম খেলা হাস্যকৌতুকে মত্ত হইতেন যে, তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যেন তিনিও একজন ইহাদের সমবয়সী। মহারাজের বালস্বভাব আজন্ম প্রকৃতি-সিদ্ধ।

বাল্যভাবে তাঁহার আকৃতি এত কোমল ও মধুর হইয়া যাইত যে, বাস্তবিক সময়ে সময়ে তাঁহাকে কাহারও কাহারও বালক বলিয়া ভ্রম হইত। পূজ্যপাদ প্রেমানন্দ স্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুত তুলসীরাম একদিন মহারাজের বাল্যভাবে এত বিস্মৃত ও আত্মহারা হইয়া যান যে তিনি সহসা তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য উঠাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তুলিতে গিয়া তাঁহার ভুল ভাঙ্গিল—তিনি দেখিলেন এ যে দিব্য বালভাবাপন্ন বলিষ্ঠ যুবক মহারাজ!

শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী শিক্ষিত যুবকেরা কেহ কেহ দলবদ্ধ ভাবে সমিতি গঠন করিয়া আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছিলেন, মহারাজ তাহাদের এই সদুদ্দেশ্যে সর্ব্বদা উৎসাহ প্রদান করিতেন এবং সদুপদেশে তাহাদের আধ্যাত্মিক সাধনার উন্নতিকল্পে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইতেন। তাহাদের প্রতি মহারাজের এইরূপ ঐকান্তিক আগ্রহ, যত্ন ও ভালবাসা দেখিয়া তাহারা মুগ্ধ হইত, প্রবল উৎসাহে এবং অদম্য অধ্যবসায়ে সমস্ত বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া তাহাদের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে প্রচুর সাহস সঞ্চয় করিত। ধীর, স্থির, শান্ত ও গম্ভীর আনন্দময় মহারাজ তাহাদিগকে যাহা বলিতেন তাহাতে সাময়িক কোন উত্তেজনা বা উন্মাদনা আনিত না, কিন্তু তাহাদের অন্তরে একনিষ্ঠ অনুরাগের গাঢ়তা এবং সাধনার দৃঢ় সঙ্কল্প ও গভীরতা জাগিয়া উঠিত। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারে মহারাজের ইহাই একটী বৈশিষ্ট্য ছিল।

এই সময়ে শ্রীশ্রীমার স্বাস্থ্য তেমন ভাল যাইতেছে না জানিয়া মহারাজ তাঁহাকে কলিকাতায় আনাইয়া রাখিবার জন্য বাগবাজার

অঞ্চলে গঙ্গার সমীপবর্ত্তী একটী বাড়ী ভাড়া করিলেন। কামারপুকুর ও জয়রামবাটী প্রভৃতি স্থানসমূহ ম্যালেরিয়ার জন্য প্রসিদ্ধ। শ্রীশ্রীমাকে জয়রামবাটী হইতে আনাইয়া মহারাজ উক্ত ভাড়াটিয়া বাড়ীতে তাঁহার বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই বাড়ীটির নিম্নতলে একটী পাটের গুদাম ছিল বলিয়া লোকে উহাকে 'গুদামবাড়ী' বলিত। দ্বিতল ও ত্রিতল বাসোপযোগী ছিল। গোপালের মা ও গোলাপ মা প্রভৃতি স্ত্রীভক্তদের লইয়া মা ত্রিতলে বাস করিতেন; সেখান হইতে বেশ গঙ্গাদর্শন করা যাইত। শ্রীশ্রীমার সেবার ও যত্নের কোন ক্রটী না হয় তজ্জন্য স্বামী যোগানন্দ ও অপর দুই একটী সাধু ব্রহ্মচারী লইয়া মহারাজ স্বয়ং দ্বিতলে বাস করিতে লাগিলেন। এই বাড়ীর দ্বিতলে একটী হল ঘর ছিল, মহারাজ তথায় বসিয়া ভক্তদের সহিত ভগবদ্প্রসঙ্গ করিতেন। এই বাড়ীতে তিনি কাহাকে কাহাকেও দীক্ষা দিয়াছেন। মহারাজের গুরু ও আচার্য্যের ভাব এইরূপে ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে তাঁহার প্রত্যাগমনকাল প্রায় দুই বৎসর অতিক্রম করিলে সংবাদ আসিল স্বামিজী ইংলণ্ড হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেছেন। নানাস্থানে তাঁহার বিরাট অভ্যর্থনা, বক্তৃতা ও মানপত্র প্রদানের বিবরণ সংবাদপত্রে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। স্বামিজীর জন্মভূমি কলিকাতা মহানগরীতে যাহাতে বিপুল সমারোহে অভ্যর্থনা ও মানপত্র প্রদান করা হয় তৎসম্বন্ধে ভক্তমণ্ডলীর বলবতী ইচ্ছা ছিল। তাঁহারা একদিন মহারাজের নিকট উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিয়া উক্ত অভিপ্রায়ে ত্বরায় একটী অভ্যর্থনাসমিতি গঠন করিতে

বলিলেন। এই সমিতি যাহাতে যথার্থ প্রতিনিধিমূলক হয় তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে সমুচিত সদুপদেশ প্রদান করিলেন। মহারাজ সর্ব্বাগ্রে তার পাইলেন যে স্বামিজী ২০শে ফেব্রুয়ারী ষ্টীমারযোগে ডায়মণ্ড হারবারে পৌঁছিবেন। তিনি ইহা পত্রে লিখিয়া জনৈক ভক্তের মারফত অভ্যর্থনা সমিতির প্রধান উদ্যোক্তা ছোট নরেন্দ্রের নিকট পাঠাইলেন। স্বামিজীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে যত্ন লইবার জন্য তিনি স্বামী ত্রিগুণাতীতকেও তথায় পাঠাইয়া দিলেন। বহুদিন পরে আবার তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ ও মিলন হইবে ইহা মনে করিয়া মহারাজের হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের প্রবাহ চলিতেছিল। পরদিন শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে সমগ্র রাজপথে বিপুলভাবে অভ্যর্থিত ও পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত হইয়া স্বামিজী যখন বাগবাজার পশুপতি বসুর প্রাসাদোপম অট্টালিকার দ্বারদেশে উপনীত হইলেন তখন মহারাজ স্বামিজীর কণ্ঠে একটী সুন্দর পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিলেন। স্বামিজী তাঁহার পাদ বন্দনা করিলেন। মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া স্বামিজী সহাস্য বদনে বলিলেন, "গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু।" মহারাজ মৃদুহাস্যে বলিলেন, "জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা।"

দর্শনার্থী লোকের জনতায় এবং পরিচিত বন্ধুবান্ধবের সহিত কথোপকথনে স্বামিজীকে ক্লান্ত দেখিয়া মহারাজ বুঝিলেন তাঁহার বিশ্রাম আবশ্যক। অপরাহ্ণে মহারাজ স্বামিজীকে আলমবাজার মঠে লইয়া গেলেন। বহুদিন পরে গুরুভ্রাতারা স্বামিজীকে মঠে একান্তে পাইয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন। স্বামিজীও দীর্ঘ প্রবাসের পর তাঁহাদিগকে দেখিয়া পরম উৎফুল্ল হইলেন। পাশ্চাত্য দেশ হইত সংগৃহীত অর্থাদি মহারাজের নিকট গচ্ছিত

রাখিয়া স্বামিজী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'এদ্দিন যার জিনিষ বয়ে বেড়িয়েছি—আজ তাকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলুম।' সেদিন মঠে অপূর্ব্ব প্রীতির হিল্লোল বহিল। মহারাজ দেখিলেন যে, স্বামিজী একপ্রকার ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়াই কলিকাতায় আসিয়াছেন। গুরুতর পরিশ্রমে ও দর্শনপ্রার্থী লোকের সমাগমে ক্রমশঃই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তাই কলিকাতায় অভ্যর্থনা সমিতির উদ্যোগে দুইটী বক্তৃতার আয়োজন হইয়াছিল—একটী রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে মানপত্র দান ও স্বামিজীর অভিভাষণ, অপরটী ষ্টার রঙ্গমঞ্চে "বেদান্ত" সম্বন্ধে বক্তৃতা। ইহার পর মহারাজ স্বামিজীকে আর বক্তৃতা করিতে দিলেন না। তিনি স্বামিজীর রীতিমত চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের ব্যবস্থানুসারে জলবায়ু পরিবর্ত্তন এবং একান্ত বিশ্রামের জন্য তাঁহারা দার্জ্জিলিং যাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। স্বামিজী ইহাতে সম্মত হইলেন। তাঁহার শিষ্যসেবক ব্যতীত মহারাজ ও গিরিশবাবুকে সঙ্গে লইয়া স্বামিজী দার্জ্জিলিং যাত্রা করিলেন।

স্বামিজী চাহিতেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার ও সঙ্ঘের বিস্তার। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার ও সঙ্ঘ যাহাতে সুনিবদ্ধ প্রণালীতে স্থায়ী ভাবে পরিচালিত হয়। যাহাতে দেশের জনসাধারণ উন্নত, স্বাধীনতাপ্রিয় এবং আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে পারে এবং যাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণের নবালোকসম্পাতে আধ্যাত্মিক রত্নসমূহ বিতরণ করিয়া ভারত সমগ্র মানব জাতির আচার্য্য পদে বৃত হইয়া শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে—ইহাই

ছিল স্বামিজীর অহর্নিশ চিন্তা। এই বিষয়গুলি মহারাজ ও গিরিশবাবুর সহিত আলোচনা করিবেন বলিয়া স্বামিজী তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিং শৈলশিখরে বসিয়া ইঁহারা মিলিত ভাবে একটী পরিকল্পনা করেন এবং তাঁহার স্থায়ী রূপ দিবার জন্য তিনি কয়েকদিন পরেই কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

১লা মে বলরামের গৃহে ঠাকুরের ভক্তশিষ্যবৃন্দ এবং মঠের সন্ন্যাসিগণ আহূত হইয়া সমবেত হন। স্বামিজী তাঁহার প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া দিলে এবং সভায় গিরিশচন্দ্র তাহা অনুমোদন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হয়। এই ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার সাধারণ সভাপতি স্বামিজী এবং কলিকাতা কেন্দ্রের সভাপতি হইলেন মহারাজ। উক্ত সভায় ইহাও স্থির হইল যে প্রত্যেক রবিবারে মিশনের নিয়মিতরূপে অধিবেশন হইবে। সুতরাং কলিকাতা কেন্দ্রের সভাপতি রূপে মহারাজকেই মিশনের কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথমে অবতীর্ণ হইতে হইল।

মিশন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষ-মোচন কার্য্যের আরম্ভ। মহারাজকে অখণ্ডানন্দ পত্রে লিখিয়া জানাইলেন যে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে দারুণ দুর্ভিক্ষ এবং বহুলোক অনাহারে মরিতেছে। কি প্রণালীতে তিনি দুর্ভিক্ষে সাহায্য করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা সবিস্তারে তৎসঙ্গে মহারাজকে জ্ঞাপন করিলেন। অখণ্ডানন্দের পত্র পাইয়া মহারাজ অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তিনি যথাকালে মঠ হইতে জনৈক সন্ন্যাসী ও একজন ব্রহ্মচারীকে কিছু অর্থসহ পাঠাইয়া দিলেন। দুর্ভিক্ষ মোচন কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে জানিতে পারিয়া মহারাজ অখণ্ডানন্দকে উৎসাহ দিয়া লিখিলেন,

"Heartএর development না হইলে কোন কাজই হয় না। তোমাদের এই প্রকার কার্য্য মহান্ হৃদয়ের পরিচায়ক। 'ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ' এই মহৎ শ্লোকের যথার্থ application তোমাদের কার্য্যে দেখা যাইতেছে। তোমরা আরও দিন দিন উৎসাহের সহিত কার্য্য কর। আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিঃস্বার্থ ভাবে কোন কাজে ব্রতী হইলে স্বয়ং ভগবান তাহার সহায়তা করেন।" রামকৃষ্ণ মিশনের এই সর্ব্বপ্রথম লোকহিতকর অনুষ্ঠানের সুপরিচালনায় মহারাজ এত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন যে অখণ্ডানন্দকে তিনি সোৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া লিখিয়াছিলেন, "তোমাকে কি বলিব খুঁজিয়া পাইতেছি না। তুমি এখানে আসিলে grand reception এবং আমরা কোলে করিয়া নাচিব।" আনন্দময় মহারাজ এইরূপ আনন্দোৎসাহেই কর্ম্মের কঠোরতা ও শুষ্কতাকে সরস করিয়া তুলিতেন এবং যাহারা কর্ম্ম করিতেন তাঁহাদের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব আনন্দের প্রবাহ সঞ্চার করিয়া দিতেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে দিনাজপুরের ভীষণ দুর্ভিক্ষের কথা শুনিয়া মহারাজ ত্রিগুণাতীত স্বামীকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন। এই সময় কলিকাতায়, আলমবাজারে ও দক্ষিণেশ্বরে অনশনক্লিষ্ট অনেক দুঃস্থ ব্যক্তিকেও নিয়মিতভাবে সাহায্য করিতে হইত। সাঁওতাল পরগণায় বৈদ্যনাথ দেওঘরে ভীষণ দুর্ভিক্ষের কথা শুনিয়া তিনি সাহায্য বিতরণের জন্য স্বামী বিরজানন্দকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন মাত্র কয়েকমাস পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু মহারাজের অদ্ভুত কর্ম্মকুশলতায় এবং সাধু ব্রহ্মচারী এবং কর্ম্মিগণের আপ্রাণ চেষ্টায় রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষ মোচনকার্য্যে

একটা সুনাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এমন কি জনসাধারণ এবং সরকার বাহাদুর রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যপ্রণালী ও জাতিনির্ব্বিশেষে সেবাকার্য্য বিস্ময়ে শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে দেখিতে লাগিলেন। সমগ্র জাতির মধ্যে এক নূতন আদর্শ ও প্রেরণা জাগিয়া উঠিল।

নানাস্থানে জনহিতকর অনুষ্ঠানে মিশনের যশঃসৌরভ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মিশনের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন সম্বলিত পত্রাদি মহারাজ পাইতেন। দার্জ্জিলিং পাহাড়ে স্বামিজীর স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি না হওয়ায় চিকিৎসকগণের পরামর্শানুসারে তাঁহাকে আলমোড়ায় যাইতে হইল। মঠ ও মিশনের সমুদায় বিবরণ প্রতি সপ্তাহে মহারাজ তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতেন। প্রয়োজনীয় চিঠিপত্রাদির উত্তর স্বামিজীর নির্দ্দেশানুসারে তিনি লিখিয়া পাঠাইতেন। এই সময়, মহারাজের অসাধারণ কর্ম্মশক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল। মিশনের নিয়মিত সাপ্তাহিক অধিবেশন, দুর্ভিক্ষ মোচনাদি যাবতীয় সেবাকার্য্যের জন্য অর্থসংগ্রহ ও ব্যবস্থা, স্বামিজীর প্রবর্ত্তিত নিয়মানুযায়ী মঠের পরিচালনা, মঠ ও মিশনের চিঠিপত্র ও বাহিরের লোকের চিঠিপত্রে নানা প্রশ্নের উত্তর প্রেরণ, প্রস্তাবিত মিশনের মুখপত্রস্বরূপ বাংলা পাক্ষিক পত্রিকার প্রকাশ সম্বন্ধে সহায়তা, স্বামিজীর চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় ডাক্তারদের সহিত পরামর্শ করিয়া ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা পাঠান, যোগানন্দের চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার বন্দোবস্ত ও তত্ত্বাবধান, পাশ্চাত্য অতিথিদের যথোচিত সৎকার ও সম্বর্দ্ধনা, শ্রীশ্রীমার সেবা পরিচালনা, ঠাকুরের গৃহস্থ ও নবাগত ভক্তদের প্রতি যথাযোগ্য সপ্রেম ব্যবহার, তরুণ যুবকদের মধ্যে আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে প্রেরণা ও সাহায্যদান এবং বিভিন্ন স্থানে

প্রচারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি নানাবিষয়ক ব্যাপারে তিনি যেন শতহস্ত হইয়া কাজ করিতেন। তাঁহার এই অপূর্ব্ব কার্য্যদক্ষতায় স্বামিজী বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, যে, "এই আট ন' মাস তুমি যে কাজ করেছ—খুব বাহাদুরি দেখিয়েছ।" কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত না যে তিনি এতগুলি কার্য্যে জড়িত আছেন। বাহিরে তাঁহার প্রশান্ত সহাস্য মূর্ত্তি, কর্ম্মজনিত কোন উদ্বেগ বা চিন্তার রেখা তাঁহার বদনমণ্ডলে দেখা যাইত না—সেখানে আশার মাদকতা বা নিরাশার হতাশ চিহ্ন কখনও ফুটিয়া উঠিত না। কর্ম্মতরঙ্গের কোন বাহ্যিক চাঞ্চল্যই স্ফূর্ত্তি পাইত না। তাঁহার কথায় কোন আবেগের ভাষা বা তাড়না নাই, নেতৃত্বের কোন অভিমান নাই, কর্ত্তৃত্ব প্রকাশের চেষ্টা নাই। কিন্তু কর্ত্তব্য পালনে ছিলেন তিনি অটল ও নির্ভীক এবং কার্য্য পরিচালনায় তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং গভীর শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় অনুরাগ প্রকাশ পাইত। কর্ম্মের ঘোর আবর্ত্তের মধ্যে থাকিয়াও তিনি ছিলেন প্রশান্ত, সমাহিত, অন্তর্মুখী ও তন্ময়। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ একটা স্নিগ্ধ আধ্যাত্মিক লাবণ্য-মাধুর্য্যে উদ্ভাসিত থাকিত। কর্ম্ম বা কোন বিষয়েই তাঁহার দিব্য অন্তরকে স্পর্শ করিতে পারিত না। জগতের হিতকল্পে তিনি কাজ করিয়া যাইতেন, কিন্তু কাজের ভিতরে তিনি অবস্থান করিতেন না। তাই কর্ম্ম করিয়াও কখন কর্ম্মে লিপ্ত বা আসক্ত হইতেন না। লোকহিতের জন্য তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বত্র বিচরণ করিলেও বসন্তবায়ুর ন্যায় নির্লিপ্ত থাকিতেন। শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় নিত্যমুক্তের কাজ অনায়াসে নিষ্পন্ন হইয়া যায়।

এই সকল কাজকর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও মহারাজ আলমবাজার

মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের জ্বলন্ত আদর্শ ও তাহার বাণী সমবেত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দের সম্মুখে প্রাণস্পর্শী ভাষায় বলিতেন। সামান্য ছোট ছোট কথায় বলিলেও তাহা অগ্নিকণার ন্যায় অন্তরের সমস্ত সংশয় ও মলিনতাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিত। তিনি আবিষ্ট ও তন্ময় হইয়া তাঁহাদিগকে আধ্যাত্মিকভাবে উদ্দীপিত করিয়া বলিতেন, "যখন কোন বক্তৃতা দিবে তখন পরমহংসদেবের কথা যত বলতে পার দিবে, কারণ উহা অতি সহজ ব্যাখ্যা।" শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের আলোক-সম্পাতে এবং তাঁহার সরল সহজ কথায় শাস্ত্র ও দর্শনাদির মর্ম্ম যে জনসাধারণের অনায়াসে বোধগম্য হইবে ইহাই তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য। যুগাবতারের যুগবাণী সহজেই লোকের অন্তর স্পর্শ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে কোন রকম গোঁড়ামি না প্রবেশ করে তাই সতর্ক করিয়া ঠাকুরের কথা তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া মহারাজ বলিলেন, "তিনি বলতেন, 'আমি খোসামোদ চাইনে। যে তাঁকে (ঈশ্বরকে) প্রকৃত ভাবে ডাকে তাকে আমি ভালবাসি। তাঁকে ডাকলে কোথায় সব দোষ চলে যায়।' সরল ভাবের লোককে তিনি ভালবাসতেন। বক্তৃতায় ঠাকুরের শুধু উচ্চ প্রশংসা বা স্তবগান করিলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন না, তিনি চান প্রকৃত সরল ঈশ্বরানুরাগী মন।" মহারাজ ঠাকুরের জীবন উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "বাজে কথা তিনি মোটে বলতে পারতেন না। তিনি রাত্রে আধঘণ্টার অধিক প্রায় ঘুমুতেন না। কখনও সমাধিতে থাকতেন, কখন সংকীর্ত্তন, কখন হরিনাম। তিনি বলতেন, অনুরাগ আবশ্যক। অনুরাগ কি প্রকার? ঋষি খ্রীষ্ট যেমন এক বৃদ্ধকে আকণ্ঠ জলমগ্ন করে তার ব্যাকুলতা দেখিয়ে সেই ব্যাকুলতা ঈশ্বরের জন্য করতে বলেন। তাঁকে দেখেছি প্রায়

এক বা দেড় ঘণ্টা সমাধি হয়ে গিয়েছে। কখন কখন সেই অবস্থায় কথা বলবার চেষ্টা করেও কথা কইতে পারতেন না। বলতেন, 'কথার ঘর—আমার কখন বন্ধ হয় খুঁজে পাইনে'।" ঈশ্বরোদ্দেশে কিরূপ ব্যাকুল হইতে হইবে তাহা তিনি ঠাকুরের কথায় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ভগবানের জন্য কিরূপ প্রেম চাই? যেমন পাগলা কুকুরের মাথায় ঘা হলে ছট ফট করে।" ইহা বলিতে বলিতে তিনি ভাবাবেগে সতেজে বলিয়া উঠিলেন, "তিনি বারম্বার আমাদের মনে বিশেষ করে ধারণা করে দিয়েছেন যে বৈষয়িক জ্ঞান অতি তুচ্ছ, অধ্যাত্মজ্ঞান, ভক্তি এবং অনুরাগই সাধন করতে হবে।" মঠের সাধুদের মধ্যে কেহ তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ, ঠাকুরের সমাধি কিরূপ হত?" ইহার উত্তরে মহারাজ বলিলেন, "তাঁর বিভিন্ন প্রকার সমাধি হত। কোন অবস্থায় তাঁর সমস্ত শরীর কাঠের ন্যায় শক্ত হয়ে যেত এবং এ অবস্থা থেকে তিনি সহজে বেশ সাধারণ অবস্থায় আসতেন। কিন্তু যখন তিনি ভাবসমাধিতে মগ্ন হতেন তখন ভাব সম্বরণের পরও কিছু কাল যেন মাতালের মত কথাবার্ত্তা বলতেন।" ঠাকুরের সমাধি প্রসঙ্গে মহারাজের অন্তরে যেন ব্রহ্মচৈতন্যের ভাব স্ফূর্ত্তি পাইল। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই ভাবেই মাতোয়ারা হইয়া মহারাজ সমবেত সাধু ব্রহ্মচারীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তাঁর বিষয়ে অনেক ব্যাপার আছে। একজন সাধু রামলালা নামে এক মূর্ত্তি তাঁকে দেন, তিনি গঙ্গায় স্নানকালে ঐ মূর্ত্তি সঙ্গে নিয়ে যেতেন এবং সেই মূর্ত্তি জলে সাঁতার কাটত একথা তিনি নিজেই বলেছেন। এরূপ অবস্থায় জড় এবং চৈতন্যের বিভাগ কি ভাবে করতে পার?"

ঠাকুরের প্রসঙ্গে মহারাজ একেবারে দিব্যভাবে তন্ময় হইয়া

যাইতেন। সেই অবস্থায় কেহ প্রশ্ন করিলেন, 'মহারাজ, কালী কৃষ্ণ প্রভৃতি রূপ যথার্থ কি ?' গম্ভীরভাবে তিনি উত্তর করিলেন, "হাঁ"। এইসব ভাবের কথায় তিনি কোন অতল সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেন, যাঁহারা শুনিতেন তাঁহারা শুধু আভাসে বুঝিতে পারিতেন যে এই আশ্চর্য্য বক্তা অতীন্দ্রিয় ভাবে আবিষ্ট হইয়া অস্ফুট ও অব্যক্তকে ব্যক্ত করিতে চাহিতেছেন। ছোট ছোট সহজ কথায় তিনি বলিতেন বটে কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে যখন ইহা বাহির হইত তখন শ্রোতাকেও কোন এক অজ্ঞাত ভাবরাজ্যে লইয়া যাইত। কোন রচনা কিংবা বর্ণনা তাহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ লিখিয়াছিলেন, "দেবদেবীর বিষয়ে তিনি (মহারাজ) বলিতেন যে তাঁহারা সত্য সত্যই আছেন। কল্পনার কথা নহে। তিনি সাক্ষাৎ দর্শন করিতেন ও তাঁহাদের সহিত কথা বলিতেন ও তাঁহাদের প্রত্যুত্তর শুনিতেন।"

মহারাজের এইসব আলাপ আলোচনা সংক্ষিপ্ত ভাবে আলমবাজার মঠের দৈনিক লিপিতে কিছু লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু তন্ময়চিত্ত শ্রীমহারাজের মুখ হইতে যাহারা না শুনিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার সেই কথাগুলির তেজ ও শক্তি সহজে কল্পনায় আনিতে পারিবেন না।

১৮৯৮ ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে বেলুড়ে জমি কিনিবার বায়না হইবার পর আলমবাজার হইতে গঙ্গার পশ্চিম তীরে নীলাম্বর বাবুর বাড়ী ভাড়া লইয়া মঠ স্থানান্তরিত হইল। মঠ গৃহ নির্ম্মাণের যাবতীয় কাজ মহারাজকে দেখিতে হইত। ইতিপূর্ব্বে বিজ্ঞানানন্দ স্বামী ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি ত্যাগ করিয়া আলমবাজার মঠে যোগদান

করিয়াছিলেন। মঠগৃহের প্ল্যান ও তাহার নির্ম্মাণের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইল। কিন্তু মহারাজ তাহা পরিদর্শন করিয়া আয় ব্যায়ের সমুদায় হিসাব রাখিতেন। ১৮৯৮ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার স্বহস্ত লিখিত পাঁচখানি ডায়েরী দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে বিভিন্ন হিসাব ও বিশেষ বিশেষ কার্য্যের তালিকাদি লিপিবদ্ধ আছে। প্রত্যেক খুঁটিনাটি কার্য্য পর্য্যন্ত তিনি সুচারুভাবে করিতেন। মঠ ও মিশনের কার্য্য কিরূপ ভাবে করিতে হইবে তাহার আদর্শপথ তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন।

স্বামিজীর স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় প্রায়ই তিনি জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ তাঁহাকে সর্ব্বদা মঠ ও মিশনের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ নিয়মিতভাবে জানাইতেন। স্বামিজী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহা দেখিয়া লইতেন এবং কোন কার্য্যে সামান্য ত্রুটী বা শিথিলতা বিবেচনা করিলে তিনি রূঢ় ভাষায় মহারাজকেই তিরস্কার করিতেন। সঙ্ঘ যে ভাবে গড়িয়া উঠিতেছিল তাহার গঠন যাহাতে দৃঢ় ও স্থায়ী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় এই ছিল তাঁহার অহর্নিশ চিন্তা। তাই তিনি মহারাজকে স্পষ্টভাবে কোন পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আমার কেবল ভয় এই যে এখন ত একরকম খাড়া করা গেল, অতঃপর আমরা চলেগেলে যাতে কাজ চলে এবং বেড়ে যায় তাহাই দিনরাত আমার চিন্তা।" স্বামিজী বারংবার এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া মহারাজকে মঠ ও মিশনকে গড়িয়া তুলিতে বলিলেন। এইরূপ স্থির লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে প্রত্যেক কার্য্য সুসম্পন্ন হয় ইহাই ছিল স্বামিজীর আন্তরিক আগ্রহ ও প্রবল ইচ্ছা। এইজন্য তিনি মহারাজকে তাঁহার পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতা লব্ধ মতামত গুলি

জানাইয়া রাখিতেন। আমাদের দেশে কোন কোন প্রতিষ্ঠান স্থায়ী রূপে গড়িয়া উঠিতে পারেনা তাহা চিঠিপত্রে ও কথাবার্ত্তায় তাঁহাকে বিশদরূপে বুঝাইতেন। তিনি মহারাজকে লিখিয়াছিলেন, "আমাদের Indiaর ত্রুটী great defect we cannot make a permanent organisation and the reason is because we never like to share power with others and never think of what will come after we are gone—অর্থাৎ আমাদের ভারতের একটী মহৎ দোষ যে আমরা কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়িতে পারি না, তার কারণ আমরা কখন অন্যান্য ব্যক্তিদের সহযোগে ক্ষমতার ভাগ লইতে চাহিনা এবং আমাদের মৃত্যুর পর কি হইবে সে সম্বন্ধে কখন চিন্তা করিনা।" আমাদের বর্ত্তমান ভারতবাসীর চরিত্র বিবেচনা করিয়াই স্বামিজী এইরূপ আশঙ্কান্বিত হইয়াছিলেন এবং পাছে কোন দোষ বা ত্রুটীতে সঙ্ঘের দৃঢ়মূল শিথিল হয় তাই কঠোর ভাবে প্রত্যেক কার্য্যের দোষগুণ বিচার করিতেন। স্বামিজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এই সঙ্ঘকে স্থায়ী রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে মহারাজই একমাত্র সক্ষম। স্বামিজী তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন যে, "এমন machineটী খাড়া কর যে আপনি আপনি চলে যায়—যে মরে বা যে বাঁচে।" জীবন ক্ষণভঙ্গুর। ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া স্বামিজী তাঁহার পরিকল্পনার স্থায়ী রূপ দেখিবার জন্য ব্যাকুল ও চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। মহারাজ ক্ষিপ্র গতিতে সঙ্ঘকে পরিপূর্ণ ভাবে গড়িয়া তুলেন ইহাই ছিল স্বামিজীর একান্ত আগ্রহ। তিনি মহারাজকে সঙ্ঘের বিস্তার এবং উহার যথাযথ পরিচালনার নিমিত্ত নানাবিধ কার্য্যপ্রণালীর

উপদেশ দিতেন। কিন্তু মহারাজ ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া উহা যতটা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং ধীরে ধীরে স্বামিজীর পরিকল্পনাটীকে কেমন করিয়া স্থায়ী আকারে গঠন করিতে পারা যায় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বাস্তবক্ষেত্রে কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতেন। স্বামিজী তাঁহার উপদেশ ও পরিকল্পিত কার্য্যপ্রণালী পুরাপুরি ভাবে প্রতিপালিত হইতেছে না দেখিয়া মহারাজকে রুষ্ট হইয়া নানা কটু ও রূঢ় বাক্যে তিরস্কার করিতেন। কিন্তু পরক্ষণেই জানাইতেন, "তোমাদের উপর অত্যন্ত কটু ব্যবহার করেছি বুঝতে পারছি, তবে তুমি আমার সব সহ্য করবে আমি জানি, ও মঠে আর কেউ নেই যে সইবে।" মহারাজের সুবিবেচনার উপর স্বামিজীর এতটা নির্ভরতা ছিল যে গালাগালি ও নানা কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করিয়া তাঁহার মতামত জানাইতেন এবং পরে বলিতেন বা লিখিতেন যে, "তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে।"

অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী দর্শনের পরে স্বামিজীর স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। তিনি কোন সংবাদ না দিয়া মঠে চলিয়া আসেন। মহারাজ তাঁহার চেহারা দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং স্বামিজী অল্পক্ষণ পরেই শয্যাগ্রহণ করিলেন। প্রাতঃকাল হইতে অপরাহ্নকাল এই ভাবেই কাটিয়া গেল। গিরিশবাবু প্রমুখ ভক্তেরা সংবাদ পাইয়া বৈকালে মঠে স্বামিজীর সংবাদ লইতে আসিলেন। সকলেই তাঁহার শারীরিক অবস্থার কথা শুনিয়া চিন্তান্বিত হইলেন। প্রায় সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে স্বামিজী ধীরে ধীরে বাহিরে বসিবার ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গিরিশবাবু তাঁহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "এ কি স্বামিজী! তুমি

নীচে নেমে এলে যে! শুনলুম, তোমার বড় অসুখ?" স্বামিজী মৃদুস্বরে তাঁহাকে বলিলেন, "কি করি বল? শুয়ে শুয়ে যতবার চোখ মেলেছি, দেখি 'রাজা' প্যাঁচার মত মুখ করে বসে আছে। তার মুখখানার সেই ভাব দেখে আর শুয়ে থাকতে পারলুম না— আস্তে আস্তে উঠে এলুম। আমি হাঁটছি, বেড়াচ্ছি দেখে 'রাজা'র মুখে যদি হাসি বেরোয়।" গিরিশবাবু অমনি তাঁহাকে বলিলেন, "রাজার মুখ ভার হবে না ত আর কার হবে?" এই সব কথাবার্ত্তার অল্পক্ষণ পরেই মহারাজ ব্যস্তভাবে আসিয়া স্বামিজীকে বলিলেন, "তুমি উঠে এলে যে! শরীর কিছু ভাল বোধ হচ্ছে?" স্বামিজী গিরিশবাবুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "রাজা শালা, আমাকে রোগী করে রাখতে চায়! রোগ-ফোগ কি? যা, আমি এখন বেশ ভাল আছি।" নানা প্রসঙ্গের পর মঠ ও মিশনের কথা উঠিল। স্বামিজী গিরিশবাবুকে বলিলেন, "রাজার কাজ দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। কি সুন্দরভাবে মঠ-মিশনের কাজ চালাচ্ছে! 'রাজা'র রাজবুদ্ধির তারিফ করতে হয়। ঠাকুর বলতেন, 'রাখালের রাজবুদ্ধি একটা প্রকাণ্ড রাজ্য চালাতে পারে'। তা ঠিক।" গিরিশবাবু বলিলেন, "তাঁর ত ছেলে, হবে না কেন?" স্বামিজী ইহা শুনিয়া আনন্দে বিগলিত হইয়া বলিলেন, "রাজার spirituality আঁকড়ে পাওয়া যায় না। ঠাকুর যাকে ছেলে বলে কোলে করতেন, আদর করে খাওয়াতেন, এক সঙ্গে শয়ন করতেন! তার কি তুলনা হয়? রাজা আমাদের মঠের প্রাণ—আমাদের রাজা!"

স্বামিজী কিছুদিন পরে অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিলেন। একদিন অপরাহ্লে জনৈক ধর্ম্মপিপাসু বিলাত-প্রত্যাগত একটী সাহেব মঠে

আসিয়া উপস্থিত হন। মহারাজ তখন একাকী গঙ্গার ধারে বসিয়া ছিলেন। সাহেব তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কয়েকটী প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চাহিলে তিনি তাঁহাকে স্বামিজীর নিকট পাঠাইয়া দেন। স্বামিজী তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া উক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর পাইবার জন্য মহারাজের নিকট যাইতে বলেন। সাহেব পুনরায় তাঁহার নিকট আসিয়া প্রশ্নগুলির উত্তর চাহিলে মহারাজ অনেক বুঝাইয়া স্বামিজীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ভদ্রলোকটী পুনরায় ফিরিয়া আসিলে স্বামিজী তাঁহাকে বলিলেন, 'ব্রহ্মানন্দ তোমার এই প্রশ্নগুলির সুন্দর সমাধান করিয়া দিবেন।' ইহা বলিয়া তিনি সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "There is a dynamo working and we are all under him." সাহেবের ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া মহারাজ সাহেবের প্রশ্নগুলির উত্তর দিলেন। মহারাজের কথা শুনিয়া সাহেবের সমুদায় সংশয় ছিন্ন হইল—তিনি আনন্দিত হইলেন। উপযুক্ত ব্যক্তিকে দেখাইয়া দেওয়ায় সাহেব স্বামিজীর নিকট পুনরায় আসিয়া তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইলেন যে, তাঁহার ভারতবর্ষে আগমন সার্থক হইয়াছে।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের প্রারম্ভে বেলুড় মঠের গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়া গেল। ৯ই ডিসেম্বর শুভদিন দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠার দিন ধার্য্য হইল। উক্ত দিবসে স্বামিজী ও মহারাজ এবং তাঁহাদের অন্যান্য গুরুভ্রাতারা মঠে প্রবেশ করিলেন। ১২ই নভেম্বর শ্রীশ্রীকালীপূজার দিনে শ্রীশ্রীমা মহিলাভক্তদের সঙ্গে লইয়া নূতন মঠ ও

ঠাকুর ঘর দেখিতে আসিয়াছিলেন। নীলাম্বর বাবুর বাড়ীতে তখনও মঠ ছিল—তথায় অন্যান্য সাধু ব্রহ্মচারীরা থাকিতেন। তথা হইতে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের ছবি নূতন মঠে আনা হইল এবং মা সেইদিন সেইখানে ঠাকুরের পূজা করিয়া ভোগ নিবেদন করিলেন। সকলেই পরম তৃপ্তি সহকারে সানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

এই শুভদিনে বোস পাড়ায় নিবেদিতার প্রস্তাবিত বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে নিবেদিতা মহারাজের সহিত কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইহা নিবেদিতার উপর স্বামিজীর নির্দ্দেশ ছিল।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ২রা জানুয়ারী নীলাম্বর বাবুর বাড়ী ত্যাগ করিয়া মঠ বেলুড়ের নূতন গৃহে উঠিয়া আসিল। স্বামিজী পরে একদিন মহারাজকে ষোড়শোপচারে ভোজন করাইয়া যুক্তকরে বলিলেন, "রাজা, তোর আদর তিনিই জানতেন—আমরা কি জানি যে তোর আদর করব?"

এই বৎসরে বেলুড় মঠে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মমহোৎসব সম্পন্ন হইল।

কিছুদিন পরে পীড়িত যোগানন্দ স্বামীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় স্বামিজীপ্রমুখ গুরুভ্রাতাগণ উদ্বিগ্ন হইলেন। মহারাজ অধিকাংশ সময়ে কলিকাতায় বলরাম-গৃহে থাকিয়া তাঁহার চিকিৎসা এবং সাধু ও ভক্ত যুবকদিগের দ্বারা তাঁহার দিনরাত্রি যথাযথ সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিলেন। যোগানন্দ তখন বোসপাড়ায় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর বাড়ীর নিম্নতলস্থ প্রকোষ্ঠে থাকিতেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মহাসমাধিতে লীন হইলেন। স্বামিজী শোকার্ত্ত হইয়া বলিয়াছিলেন,

"আমাদের ইমারতের একখানি ইট খসল।" যোগানন্দের দেহত্যাগে মহারাজ অধিকাংশ সময় গম্ভীর ও মৌন হইয়া থাকিতেন এবং চারি মাস পর্য্যন্ত নিরামিষ আহার করিয়াছিলেন। গুরুভ্রাতাদের উপর তাঁহার যে কিরূপ অগাধ প্রীতি ছিল ইহা তাহারই নিদর্শন।

এদিকে স্বামিজীর স্বাস্থ্য পুনরায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে দেখিয়া মহারাজ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। যথারীতি চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষায় তাঁহার শারীরিক উন্নতি হইতেছে না দেখিয়া চিকিৎসকদের পরামর্শানুসারে মহারাজ স্বামিজীকে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে পুনরায় যাইতে অনুরোধ করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে সমুদ্রযাত্রায় তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে। স্বামিজীও ইহাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে একাকী পাঠাইতে মহারাজের সাহস হইল না। অবশেষে স্থির হইল তুরিয়ানন্দ স্বামী এবং নিবেদিতা তাঁহার সঙ্গে যাইবেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ২০শে জুন স্বামিজী ইঁহাদের সমভিব্যাহারে মার্কিণ যাত্রা করিলেন।

মঠ ও মিশনের কার্য্য ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়া পূর্ণ উদ্যমে চলিতে লাগিল। কয়েক মাস পরেই ৯ই ডিসেম্বর রাত্রিতে স্বামিজী আমেরিকা ও ইউরোপ পর্য্যটন করিয়া বিনা সংবাদে হঠাৎ বেলুড়মঠে উপনীত হইলেন। তাঁহাকে আকস্মিকভাবে আসিতে দেখিয়া মঠের সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। স্বামিজী একদিন মহারাজ প্রমুখ অন্তরঙ্গ গুরুভ্রাতাদিগকে বলিয়াছিলেন, "প্রথম বারে পাশ্চাত্য দেশে ওদের সঙ্ঘবদ্ধতা দেখে বড় ভাল লেগেছিল। কিন্তু এবার দেখলুম তাদের সব প্রতিষ্ঠানের ভিতর সব ব্যবসাদারী বুদ্ধি আর নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে ভরে রয়েছে। স্ব স্ব প্রাধান্য আর ক্ষমতা-

লোভে যেন সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। গরীব দুর্ব্বলদের পিষে ফেলে ধনীরা নিজেদের সুখ সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের যোগাড় করে নিচ্ছে। এই দেখে এবার জ্ঞান হল ওসব যেন সাক্ষাৎ নরক।" অকপট হৃদয়ে নিঃস্বার্থ প্রেমকে ভিত্তি করিয়া যে মঠ ও মিশনের কার্য্য পরিচালনা হইতেছে ইহা দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। মঠে আসিয়া কয়েকদিন পরে তিনি কাপ্তেন সোভিয়ারের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া মায়াবতী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মহারাজ এখন স্বামিজীর স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইলেন। মঠ মিশনের কার্য্যের জন্য তাঁহাকে কোন প্রকার উদ্বেগ পাইতে না হয় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া মহারাজ সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিসে স্বামিজীর নষ্ট-স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, কিসে তাঁহাকে কোন বিষয়ে চিন্তা না করিতে হয়, কিসে তাঁহার পরদুঃখ-কাতর মহান উদার মনকে পরিহিতকর কার্য্যের দ্বারা শান্ত রাখা যায়, ইহাই ছিল মহারাজের অহর্নিশ চিন্তা। প্লেগের সময় সেবাকার্য্যে অর্থ সংগ্রহের প্রশ্ন উঠিলে স্বামিজী মঠের জমি বিক্রয় করিয়াও তাহা চালাইতে বলিয়াছিলেন, দরিদ্র অসহায়দিগের দুঃখ কষ্ট দেখিয়া কখন কখন তিনি তাহাদের সেবার উদ্দেশে মঠ প্রভৃতি সব বিক্রয় করিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। মহারাজ সেই সময়ে নানাস্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই সব কার্য্য এমনভাবে চালাইতে লাগিলেন যে মঠ বা জমি বিক্রয়ের প্রশ্নই উঠিত না। মহারাজ মঠ ও সঙ্ঘকে শ্রীরামকৃষ্ণের নিজস্ব বলিয়াই জ্ঞান করিতেন, তাই স্বামিজীর বিশাল হৃদয়ের আবেগোচ্ছ্বাসে তাহার কোন হানি না হয় সে সম্বন্ধে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। বিহঙ্গ যেমন

পক্ষপুটে তাহার শাবককে সর্ব্বদা রক্ষা করে, মহারাজ সেইরূপে নানা জনহিতকর কার্য্যের দ্বারা স্বামিজীর সাধ পূর্ণ করিয়া সঙ্ঘ ও মঠকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সব কার্য্যের দ্বারাই মিশন ও মঠ লোকচিত্তের উপর দৃঢ়প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম পরিভ্রমণ করিবার পর স্বামিজীর স্বাস্থ্য আশঙ্কাজনক হইয়া পড়িল। ডাক্তার স্যাণ্ডার্স কোনপ্রকার দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে তাঁহাকে নিষেধ করিলেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই স্বামিজী মঠ ও মিশনের সাধারণ সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়া সমুদায় ভার মহারাজের উপর অর্পণ করিলেন। সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে এখন তিনি সঙ্ঘনায়করূপে পরিচিত হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

স্বামিজী ও মহারাজ

স্বামিজী ও মহারাজ দুইজন প্রায় সমবয়স্ক। বয়সের হিসাবে স্বামিজী মহারাজের অপেক্ষা নয় দিনের বড়। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বে কিশোরকাল হইতেই ইঁহারা ছিলেন ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ বন্ধু। কিন্তু দুইজনের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন ধরণের। স্বামিজী ছিলেন দৃপ্তসিংহের মত তেজস্বী, সাগরের মত অপার গভীর, জ্ঞান বৈরাগ্য বিদ্যা বুদ্ধির আধার, তারুণ্যশক্তির দুকূলপ্লাবী উত্তাল উদ্বেল তরঙ্গে সতত চঞ্চল; মহারাজ ছিলেন ধীর প্রশান্ত অচঞ্চল আকাশের মত উদার, অপরিমেয়, অসীম ভাবতন্ময়, কমনীয় বালস্বভাবের মাধুর্য্যে কোমল। একজন ছিলেন প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক কর্ম্মশক্তির দীপ্যমান ভাস্কর, অপরে ছিলেন অন্তর্মুখী-ভাবদ্যুতির বিমল স্নিগ্ধ জ্যোতি! একজনের বাণী প্রাণস্পর্শী বিদ্যুদ্বাহী শক্তিকণা, অপরের অন্তঃসলিলা মন্দাকিনীর পূত প্রবাহ। একজনের বিশাল আকর্ণবিস্তৃত নয়নে বিশ্বগ্রাসী প্রেমপূর্ণ প্রখর দিব্যতেজ, অপরের ধ্যানস্তিমিত লোচনে সকরুণ, অপার্থিব,—ঠাকুরের কথায় "ফ্যালফেলে দৃষ্টি যেন ডিমে তা দিচ্চে"। এই দুই বিরাট পুরুষের পরস্পরের হৃদয় এক অটুট অপরিচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। উভয়ে উভয়ের প্রতি অগাধ বিশ্বাস, অপরিসীম ভালবাসা ও গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার সঙ্ঘ ইঁহাদের ছিল ধ্যান জ্ঞান ও প্রাণ।

উহার প্রচারে ও বিস্তারে ইঁহারা আধ্যাত্মিক ভাণ্ডারের অপূর্ব্ব রত্ন-সমূহ জগতের হিতকল্পে এবং ত্রিতাপদগ্ধ জীবের প্রতি প্রবল অনুকম্পায় দুইহস্তে অকুণ্ঠিতভাবে বিতরণ করিয়াছেন। সমগ্র মনুষ্য-জাতিকে ইহা দিবার জন্য ইঁহারা ব্যাকুল হইয়া বেড়াইয়াছেন।

স্বামিজী ও মহারাজের পরস্পরের আচরণ ও ব্যবহার অত্যন্ত মাধুর্য্য মিশ্রিত ছিল। ইঁহাদের হাস্য পরিহাস যেমন কৌতুকপ্রদ আবার প্রেমকলহ বা স্বামিজীর রূঢ় ভাষায় ভৎ´সনা তেমনি এক মধুর রসে অনুরঞ্জিত থাকিত। এই সকলের অন্তরালে উভয়ের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন গভীর প্রেম ও দিব্যভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিত।

স্বামিজী ব্যঙ্গ করিয়া মহারাজকে একবার লিখিয়াছিলেন, "তুমি ত রাজা হে, তোমার মন্ত্রিবর্গ হচ্ছে ন্যাংটা চার বৎসরের বাগবাজারের ছেলেগুলো, আমার তোমা অপেক্ষাও যত কাপুরুষ দল।" এই রঙ্গ রহস্য ছাড়া কারণে অকারণে স্বামিজীর অনেক রূঢ় ও কটু কথা মহারাজকে শুনিতে হইত তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এখানে তাহার দুই চারিটী ঘটনা উল্লেখ করিলে তন্মধ্যে যে কিরূপ মাধুর্য্য ও গভীর ভালবাসা নিহিত ছিল তাহা কতকটা বুঝা যাইবে।

বলরাম বাবুর গৃহে যখন স্বামিজী ও মহারাজ একসঙ্গে ছিলেন, তখন একদিন স্বামিজীর বাড়ী হইতে তাঁহাদের পুরাতন দাসী আসিয়া তথায় উপস্থিত হয়। স্বামিজী সেই সময়ে বহুমূত্র রোগে অত্যন্ত পীড়িত, এবং প্রায় সমস্ত রাত্রি তাঁহার অনিদ্রায় কাটিত। মহারাজ অতি সতর্ক হইয়া তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেন। দাসী আসিয়া মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিল, "নরেন কোথায়?" মহারাজ দ্বারের পার্শ্বে উঁকি মারিয়া দেখিলেন স্বামিজী নিদ্রা যাইতেছেন।

তাঁহার এই অসুস্থ অবস্থায় তিনি তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করা অনুচিত মনে করিলেন। দাসীকে তাহা বুঝাইয়া বলিলে সে চলিয়া গেল। স্বামিজী ঘুম হইতে উঠিলে মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "তোমাদের পুরানো ঝি এসেছিল। তুমি ঘুমুচ্ছ শুনে চলে গেল।" ইহা শুনিয়া ক্রোধে স্বামিজীর মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল। তিনি অতি কর্কশ বাক্যে মহারাজকে তিরস্কার করিলেন। মাতৃভক্ত স্বামিজী ভাবিলেন বোধ হয় তাঁহার মাতা বিশেষ কোন কারণে তাঁহাদের ঝিকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। বৃথা তাহাকে 'রাজা' ফিরাইয়া দিয়াছেন। স্বামিজী গম্ভীর মুখে তৎক্ষণাৎ একটী গাড়ী আনাইয়া তাঁহাদের বাড়ীতে গমন করিলেন। তাঁহার মাতার নিকট গিয়া স্বামিজী ব্যস্তভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি ঝিকে কেন পাঠিয়েছিলে?" মা সবিস্ময়ে স্বামিজীকে বলিলেন, "না, ঝিকে তো আমি তোর কাছে পাঠাইনি।" স্বামিজী অমনি তাঁহার পুরাতন দাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যারে, তুই আমার কাছে গিয়েছিলি কেন?" সে উত্তরে বলিল, "আমি বাগবাজার চিৎপুর অঞ্চলে বেড়াতে গিয়েছিলুম—ভাবলুম একবার নরেনকে দেখে আসি। রাখাল আমাকে বল্লে তুমি ঘুমুচ্ছ তাই ফিরে চলে এলাম।" বৃদ্ধার কথা শুনিয়া স্বামিজীর চক্ষু হইতে অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল। তিনি সজল নয়নে তাঁহার মাতাকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন এবং তাঁহার নাম করিয়া রাখালকে গাড়ী পাঠাইয়া ডাকিয়া আনিতে অনুরোধ করিলেন। মাতা পুত্রের কথামত গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। স্বামিজী মহারাজের আসার প্রতীক্ষায় সেই বাড়ীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহারাজ উপস্থিত হইলে স্বামিজী ব্যথিত ও অনুতপ্ত

কণ্ঠে তাঁহাকে বলিলেন, "রাজা, বড় অন্যায় করেছি। তোকে শুধু শুধু গালাগাল দিয়েছি। কেবল তুই বলেই আমি ওরকম কটু কথা বলতে পেরেছি।" মহারাজ হাসিয়া সব উড়াইয়া দিলেন এবং সরল বাক্যে স্বামিজীকে উৎফুল্ল করিতে লাগিলেন।

এইরূপ আর একটী ঘটনার কথা পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ উল্লেখ করিয়াছেন। বেলুড় মঠে গঙ্গার ধারে কতকাংশে পোস্তা বাঁধিয়া একটী ঘাট নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা স্বামিজীর হইয়াছিল। তিনি তাঁহাকে একটী প্ল্যান ও খরচ পত্রাদির একটী আনুমানিক এষ্টিমেট করিতে বলেন। বিজ্ঞানানন্দ (তখন হরিপ্রসন্ন) প্ল্যান-সহ ভয়ে ভয়ে কম করিয়া তিন হাজার টাকা ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব তৈয়ার করিয়া স্বামিজীর নিকট দিলেন। স্বামিজী অত্যন্ত খুশি হইয়া মহারাজকে ডাকিয়া বলিলেন, "কি বল রাজা, এই সামনাটাতে একটা ঘাট ও পোস্তা হলে বেশ হবে। 'পেসন' তো বলছে যে তিন হাজার টাকায় হয়ে যাবে। তুমি বলত কাজ সুরু হতে পারে।" মহারাজ উত্তরে বলিলেন, "তিন হাজার টাকায় হয় তো—তা যোগাড় হয়ে যাবে।" স্বামিজীর ইচ্ছানুযায়ী মহারাজ ভিত্তি স্থাপন করিলেন। মহারাজ অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া নির্ম্মাণ-কার্য্য পরিদর্শন করিয়া রীতিমত হিসাবপত্র রাখিতেন। বিজ্ঞানানন্দ দেখিলেন তিনি যে এষ্টিমেট দিয়াছিলেন তার অনেক বেশী খরচ হইবে। তিনি ভয়ে ভয়ে মহারাজকে তাহা জানাইলেন। মহারাজ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তার আর কি করা যাবে? কাজে যখন হাত দেওয়া হয়েছে, যে করেই হোক শেষ করতেই হবে। তুমি তার জন্য ভেবনা। কাজ যাতে ভালভাবে হয়, তাই

তুমি কর।” একদিন স্বামিজী মহারাজের নিকট হিসাব দেখিতে গিয়া দেখিলেন যে, তিন হাজারের ঢের বেশী টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে ; অথচ কাজ শেষ হইতে এখনও অনেক বাকি। স্বামিজী অকথ্য ভাষায় মহারাজকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। গালি দিবার সময় স্বামিজীর কথার কোন বাঁধন থাকিত না। মহারাজ নীরবে গম্ভীর হইয়া সব গালাগালি শুনিয়া যাইতে লাগিলেন। স্বামিজী চলিয়া যাইবার পর মহারাজ তাঁহার স্বীয় কক্ষে গিয়া দরজা বন্ধ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামিজী বিজ্ঞানানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, “দেখত পেসন, রাজা কি করছে ?” তিনি মহারাজের ঘরের কাছে গিয়া দেখিলেন যে দরজা জানলা সব বন্ধ। দুই একবার “মহারাজ” “মহারাজ” বলিয়া ডাকিলেন—কোন সাড়া না পাইয়া তিনি স্বামিজীকে তাহা জানাইলেন। স্বামিজী খুব উত্তেজিত হইয়া বিজ্ঞানানন্দকে ধমক দিয়া বলিলেন, “তুই ত ভারি বোকা ! তোকে বললুম দেখতে যে রাজা কি করছে ! আর তুই কিনা এসে বলছিস তার ঘরের জানলা দরজা সব বন্ধ ! দেখ শিগ্‌গির, রাজা কি করছে ?” বিজ্ঞানানন্দ তাড়াতাড়ি মহারাজের ঘরের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া কোন সাড়া পাইলেন না। আস্তে আস্তে তিনি দরজা খুলিয়া দেখেন যে মহারাজ বিছানার উপর বালিসে মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছেন। তিনি ধীরে ধীরে মহারাজের নিকটে আসিয়া বলিলেন, “মহারাজ, আপনি আমার জন্য এত কষ্ট পেলেন !” মহারাজ তখনও কাঁদিতেছিলেন। আস্তে আস্তে মুখ তুলিয়া তিনি বিজ্ঞানানন্দকে বলিলেন, “দেখত হরিপ্রসন্ন, আমার কি দোষ বল ত ? অথচ এক এক সময় এমন কড়া কথা বলে যে তা আর সহ্য হয়

না। এক একবার মনে হয় সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে যাই পাহাড়ে।”

বিজ্ঞানানন্দ স্বামিজীকে জানাইলেন যে মহারাজ বিছানায় শুইয়া কাঁদিতেছেন। শুনিবামাত্র স্বামিজী উন্মত্তের মত দৌড়াইয়া মহারাজের ঘরের দিকে গেলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়াই স্বামিজী মহারাজকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, “রাজা, রাজা, আমায় ক্ষমা কর। আমি কি অন্যায় না করেছি! তোমায় গালাগাল করেছি—আমায় ক্ষমা কর।” স্বামিজীর কান্না দেখিয়া মহারাজ একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন। তিনি স্বামিজীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, “তুমি অমন করছ কেন? আমায় গালাগাল দিয়েছ—তাতে হয়েছ কি? তুমি ভালবাস তাইত এইসব বলেছ।” স্বামিজী তখনও মহারাজকে বুকে জড়াইয়া আছেন। মহারাজের এই সান্ত্বনাবাক্য শুনিয়াও তিনি বলিলেন, “না, না, তুমি আমায় ক্ষমা কর। তোমায় ঠাকুর কত আদর করতেন, কখন তোমায় তিনি একটা কড়া কথা বলেন নি। আর আমি কি না ছাই কাজের জন্য তোমায় গালাগাল করলুম—তোমার মনে কষ্ট দিলুম। আমি আর তোমাদের সঙ্গে থাকবার যোগ্য নই। চলে যাই হিমালয়ে—কোথাও গিয়ে নির্জ্জনে থাকব।”

মহারাজ অমনি বলিয়া উঠিলেন, “সে কি, তোমার গালাগাল যে আমাদের আশীর্ব্বাদ। তুমি কোথায় চলে যাবে? তুমি আমাদের মাথা। তুমি চলে গেলে আমরা কি নিয়ে থাকব?”

এই রকমভাবে দুই বন্ধুতে পরস্পর পরস্পরকে সান্ত্বনা দিতে দিতে শান্ত হইলেন। ইঁহাদের গভীর প্রেমের কি তুলনা আছে?

মহারাজ জানিতেন স্বামিজী রূঢ় বা কটু কথা বলিয়া গালাগালি দিলেও তাঁহার অন্তরে অগাধ ভালবাসা। স্বামিজী স্বয়ং তাঁহাকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, "You know my heart, whatever my lips may say—অর্থাৎ আমি মুখে যাই বলি না কেন তুমি আমার অন্তর জান।" স্বামিজী তাঁহার আকৈশোর বন্ধু এবং সর্ব্বোপরি ঠাকুরের সহস্রদলকমল! পক্ষান্তরে স্বামিজীও জানিতেন যে মহারাজ তাঁহার বাল্যকাল হইতে অকপট বন্ধু, আজীবন অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ এবং অসাধারণ ধৈর্য্য ও সহ্য-শক্তির প্রতীক। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমাস্পদ ঠাকুরের সে যে বড় আদরের মানসপুত্র। তাই স্বামিজী সকলের সম্মুখে মুক্ত কণ্ঠে বলিতেন, "আমাকে সবাই ত্যাগ করতে পারে কিন্তু আমি জানি রাজা আমাকে কখন ছাড়বে না। আর দুনিয়ায় যদি কেউ আমার গালাগাল সহ্য করে থাকে—সে একমাত্র রাজা।"

অন্য একদিন স্বামিজীর কোন কার্য্য মনঃপূত না হওয়াতে তিনি মহারাজকে যথেষ্ট কটুকাটব্য করিলেন। মহারাজ সবই নীরবে সহ্য করিলেন। তিনি স্বামিজীর সহিত কোন বাদানুবাদ বা তর্ক করিতেন না—ইহার কারণ স্বামিজীর স্বাস্থ্য। কোনরূপ উত্তেজনা বা দুশ্চিন্তা স্বামিজীর স্বাস্থ্যের উন্নতির পক্ষে অন্তরায় ইহা মনে করিয়া তিনি সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া চলিতেন। তাঁহার গালাগালি বা তিরস্কার অঙ্গের ভূষণ বলিয়া মহারাজ মনে করিতেন। যদি কখন কোন রূঢ়বাক্য বা ব্যবহার তাঁহাকে আঘাত করিত তবে তিনি নিঃশব্দে কোথাও বসিয়া থাকিতেন বা অশ্রুমোচন করিয়া তাহা সহ্য করিয়া লইতেন। স্বামিজীর স্বভাব, তাঁহার গভীর

প্রাণঢালা ভালবাসা, তাঁহার অকৃত্রিম সৌহৃদ্য এবং তাঁহার মেজাজ ও ভাষা মহারাজ কৈশোর বয়স হইতেই জানিতেন। মহারাজ তাহাতে বিচলিত হইতেন না। কিন্তু তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলেন পীড়ার জন্যই স্বামিজীকে রুক্ষ ও খিটখিটে করিয়া তুলিয়াছে। যাহা হউক, সেদিনকার তিরস্কারের পর মহারাজকে কার্য্যানুরোধে কলিকাতায় গিয়া কয়েকদিন বলরাম-বাবুর গৃহে থাকিতে হইয়াছিল। এদিকে স্বামিজী রাজাকে মঠে না দেখিতে পাইয়া অস্থির হইলেন। বিশেষ তাঁহাকে রূঢ়ভাষায় গালাগালি দিবার পর স্বামিজীর মনে অনুতাপ হইতেছিল। মহারাজ মঠে আসিতেছেন না দেখিয়া তিনি কলিকাতায় গমন করিলেন এবং পথে খাবারের দোকান হইতে উৎকৃষ্ট মিষ্টদ্রব্য কিনিয়া বলরামবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় মহারাজকে দেখিয়াই সোল্লাসে স্বামিজী উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "রাজা— তোর জন্য এই খাবার নিয়ে এয়েছি—তুই খা।" মহারাজ এই প্রীতি উপহার সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা হাস্য কৌতুক রঙ্গে সেদিন কাটাইয়া পরদিনই উভয়ে মঠে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপ প্রীতি—শুধু প্রীতি নয়—গভীর অগাধ অকপট প্রেম জগতে দুর্লভ।

একবার স্বামিজী বিশেষ ভাবে কোন রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করায় মহারাজ ক্ষুণ্ণমনে মঠ হইতে চলিয়া যাইবার জন্য ফটকের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু বেলতলা দেখিয়া তথায় বসিয়া পড়িলেন। মহারাজ কিছুকাল ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিবার পর তাঁহার অন্তর প্রসন্ন হইল—যে বিষাদমেঘ পুঞ্জীভূত হইতেছিল তাহা কোথায় ভাসিয়া

গেল! এই মঠ, সঙ্ঘ সব যে ঠাকুরের—তিনি যে স্বয়ং এখানে আছেন—ইহা ফেলিয়া তিনি কোথায় যাইবেন? তখন তাঁহার মনে হইল—স্বামিজীর বকাবকিতে কি আসে যায়? "সে বকেছে তো হয়েছে কি?" হাস্যমুখে তিনি মঠ গৃহে প্রবেশ করিলেন। স্বামিজীর উষ্ণ মেজাজে গালাগালি, ও মহারাজের সহ্য-শক্তি এবং তাঁহাদের উভয়ের হৃদয়ভরা ভালবাসা বা সখ্যপ্রীতি যেমন অদ্ভুত তেমনি অতুলনীয়।

স্বামিজীর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাওয়াতে মহারাজ কোন কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে সতর্ক হইয়া যাইতেন। এমন কি তাঁহাকে দেখিলে স্বামিজী আবার ঐ সব বিষয়ের প্রসঙ্গ নিজেই উত্থাপন করেন, তাই আশঙ্কায় অনেক সময় তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন না বা তাঁহাকে এড়াইয়া চলিতেন। যাইবার সময় শিষ্য-সেবকদের প্রায়ই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, "এখন স্বামিজীর মেজাজ কেমন?" ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন যে মহারাজ বোধ হয় স্বামিজীর গালাগালির ভয়ে তাঁহার নিকটে যাইতে সাহসী হইতেন না। কিন্তু স্বামিজীর শারীরিক অবস্থা দেখিয়াই তিনি এইরূপ করিতেন। তাঁহার মত নীরবে স্বামিজীর তিরস্কার সহ্য করিয়াছে কে? যেখানে ভালবাসা অতি গভীর সেইখানে ভাষার কোন বাঁধন থাকে না—আলগা হইয়া যায়। মহারাজ ও তিনি একাত্মা, কৈশোর সহচর এবং অভিন্ন-হৃদয়। স্বামিজী চিঠিপত্রে তাঁহাকেই "অভিন্নহৃদয়েষু" বলিয়াই লিখিতেন। ইহা বাহ্যিক সম্বোধন নয়—সম্পূর্ণ সত্য। পীড়াতে ভুগিতে ভুগিতে এবং অনবরত গুরুতর কঠোর মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে স্বামিজীর অবস্থা এমন হইয়াছিল যে তিনি যাহা

বলিতেন বা আদেশ করিতেন তাহা তৎক্ষণাৎ প্রতি বর্ণে পালিত না হইলে একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেন। সে সময়ে তাঁহার যাহা মুখে আসিত তাহাই বলিতেন। কিন্তু এইরূপ উত্তেজনায় তাঁহার শরীর আরও ভাঙ্গিয়া পড়িত। ইহা ব্যাধির একটী লক্ষণ। নতুবা স্বামিজীর মত প্রেমভরা হৃদয়ের কি তুলনা হয়? মহারাজের কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা তাঁহার তিরস্কার-লাভের সৌভাগ্য পাইয়াছেন—তাঁহারা অন্তরে অন্তরে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেন যে ইহা তাঁহার অগাধ প্রেমেরই একটা বাহ্য আকার। ইহা গালাগালি নহে—প্রেমের পূর্ণ অভিব্যক্তি। মহারাজ তাহা জানিতেন বলিয়াই তাঁহার সেরূপ কোন মানসিক বিকার বা চাঞ্চল্য হইত না। সময়ে সময়ে অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় সামান্ত ক্ষুব্ধ হইলেও স্বামিজীর অতলস্পর্শ প্রেম ও হৃদয়ের অনন্ত উদারতা তিনি স্মরণ করিয়া সহজেই শান্ত হইয়া যাইতেন। মহারাজ সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন কিসে স্বামিজীর নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরায় স্বাভাবিক হয় এবং কিসে তিনি এই অসুস্থ শরীরে নিরুদ্বেগে শান্তচিত্তে আনন্দময় হইয়া বিচরণ করিতে পারেন। কিন্তু স্বামিজী দেহের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল জীবহিতকল্পে চিন্তা করিতেন এবং সকলের দুঃখ মোচন করিতে পারিতেছেন না বলিয়াই উত্তেজিত হইতেন এবং তাঁহার মানসিক দুঃখ উত্তেজিত হইয়া ক্রোধের আকারে বাহির হইয়া পড়িত। সর্ব্বাপেক্ষা যিনি প্রিয়তম বন্ধু ও সুহৃদ—তাঁহাকেই ইহা সহ্য করিতে হইত। তাই স্বামিজী মহারাজকে লিখিয়াছিলেন যে, "তবে তুমি আমার সব সহ্য করবে আমি জানি, ও মঠে আর কেউ নেই যে সইবে!"

স্বামিজী ও মহারাজ

১৯০১ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার চার পাঁচ দিন পূর্ব্বে মহারাজ মঠে গঙ্গার তীরে বসিয়া সহসা দেখিলেন, যেন মা দুর্গা দক্ষিণেশ্বরের দিক হইতে গঙ্গাবক্ষে চলিয়া মঠের বিল্বতলায় গিয়া উঠিলেন। এই সময়ে কলিকাতা হইতে স্বামিজী নৌকা করিয়া মঠে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা কোথায়?" মহারাজকে দেখিতে পাইয়াই বলিলেন, "এবার প্রতিমা আনিয়া মঠে দুর্গাপূজা করতে হবে, সব আয়োজন কর।" মহারাজ বলিলেন, "তোমাকে দুদিন পরে কথা দেব—এখন প্রতিমা পাওয়া যায় কি না দেখতে হবে—সময় একেবারে সংক্ষেপ। দুটো দিন সময় দাও।" স্বামিজী তাঁহাকে তখন বলিলেন যে তিনি ভাবচক্ষে দেখিয়াছেন যে মঠে দুর্গোৎসব হইতেছে এবং প্রতিমায় মার পূজা হইতেছে। মহারাজও তাঁহাকে তাঁহার নিজ দর্শনের কথা সবিস্তারে বলিলেন। মঠে ইহা শুনিয়া হৈ চৈ পড়িয়া গেল। ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলালকে মহারাজ প্রতিমার সন্ধানে কলিকাতায় কুমারটুলীতে পাঠাইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় কৃষ্ণলাল তথায় গিয়া দেখিলেন যে একটী মাত্র সুন্দর প্রতিমা তৈয়ারী হইয়া রহিয়াছে। তিনি কারিগরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে যিনি উহা তাহাকে নির্ম্মাণ করিতে দিয়াছিলেন তিনি কোন কারণে এখন পর্য্যন্ত ইহা লইতে পারেন নাই। কৃষ্ণলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই প্রতিমাটী আমাদিগকে দিতে পার কি না?" কারিগর বলিল, "কাল আপনাকে বলব।" ইহা শুনিয়া কৃষ্ণলাল মহারাজ ও স্বামিজীকে সমুদায় বৃত্তান্ত বলিলেন। স্বামিজী কৃষ্ণলালকে বলিলেন, "যেমন করেই হোক প্রতিমাখানি নিয়ে আসবে।" আশ্চর্য্যের বিষয় যিনি ফরমাশ দিয়াছিলেন তিনি প্রতিমা লইতে

আসিলেন না। প্রতিমা পাওয়া যাইবে শুনিয়া স্বামিজী মহারাজকে পূজার সমুদায় আয়োজন ও ব্যবস্থা করিতে বলিলেন।

পূজ্যপাদ প্রেমানন্দ স্বামী ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলালকে লইয়া কলিকাতায় সর্ব্বাগ্রে শ্রীশ্রীমার নিকট গিয়া তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি সানন্দচিত্তে অনুমতি দিলেন। প্রেমানন্দ উক্ত প্রতিমার বায়না দিয়া কথাবার্ত্তা স্থির করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই মহারাজ যথা-বিধি পূজার আয়োজন ও প্রচুর দ্রব্য সম্ভারের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন। রামকৃষ্ণানন্দের পিতৃদেব সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিকসাধক ঈশ্বরচন্দ্র তন্ত্রধারকের কাজ করিলেন। ষষ্ঠীর দিন কলিকাতা হইতে প্রতিমা আনিয়া মঠের বিল্বমূলে বোধন হইল। মহাসমারোহে দুর্গোৎসবের চারিদিন কাটিয়া গেল। হাজার হাজার নর নারী মঠে পূজা দর্শন করিয়া প্রসাদ ধারণ করিলেন। পূজার কয়েকদিন শ্রীশ্রীমা মঠের সন্নিকট নীলাম্বর বাবুর বাড়ীতে রহিলেন। তাঁহার নামেই সংকল্প করিয়া পূজা হইল এবং তাঁহার আদেশে পূজায় ছাগবলি হইল না। শ্রীশ্রীবিজয়া দশমীর দিন বিসর্জ্জনের জন্য যখন প্রতিমা নৌকায় উঠান হইল এবং ব্যাণ্ড প্রভৃতি নানাবিধ বাজনা বাজিতে লাগিল, মহারাজ তখন একটী বৃন্দাবনী চাদরের গাঁতি বাঁধিয়া সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন। প্রতিমার সম্মুখে ভাবে বিভোর হইয়া তিনি তালে তালে মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই অপূর্ব্ব ভাব ও মনোরম নৃত্য দেখিয়া সকলে বিমুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া থাকিলেন। অসুস্থদেহে স্বামিজী মঠের উপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া পরমানন্দে অপলক নেত্রে তন্ময়ভাবে মহারাজের সেই অদ্ভুত মধুর নৃত্য দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ভাববিহ্বল মাতোয়ারা নৃত্যে চারিদিকে এক অপার্থিব

আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। দর্শকদিগের বোধ হইল যেন শ্রীশ্রীমহামায়ার সম্মুখে সত্য সত্যই ব্রজের রাখালরাজ পরমপুলকে আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতেছে!

পূজা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইলে স্বামিজী সকলের সম্মুখে নিখুঁত ব্যবস্থা ও বিরাট আয়োজনের জন্য মুক্তকণ্ঠে "রাজার" ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে সেই বৎসরে মঠে প্রতিমা আনিয়া শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা এবং শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজার আয়োজন হইয়াছিল। এই সব অনুষ্ঠানে মঠে আনন্দময় মহাপুরুষদের সংস্রবে একটা অপূর্ব্ব আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হইত। যাঁহারা সে পূজা দেখিয়াছেন তাঁহারা কৃতার্থ বোধ করিয়াছেন। সে স্বর্গীয় ভাবের আনন্দোচ্ছ্বাস আর কোথাও সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না।

এই সব পূজার্চ্চনার পর অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে স্বামিজী অত্যন্ত গুরুতরভাবে পীড়িত হইয়া পড়েন। ব্যাধির বিশেষ উপশম হইলে তিনি ৺কাশীধামে কিছুদিন বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তথায় 'গোপাল ভিলা' নামক একটী বাড়ী স্বামিজীর বাস করিবার জন্য স্থির করা হইল। এই সময়ে প্রসিদ্ধ জাপানী ওকাকুরা স্বামিজীকে একসঙ্গে বুদ্ধগয়ায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনিও তাহাতে সম্মত হইলেন। স্বামিজী বলিলেন যে বুদ্ধগয়া হইয়া ৺কাশীধামে কয়েকদিন তিনি বাস করিবেন। মহারাজ তাঁহার সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

পূর্ব্ব হইতেই স্বামিজীর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বারাণসীধামে কয়েকজন যুবক "কাশী দরিদ্র দুঃখপ্রতিকার সমিতি or Benares Poor Men's Relief Association" নামে একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপন

করিয়া রুগ্ন ও আর্ত্তের সেবা করিত। তাঁহারা স্বামিজীর বাসভবন গোপাল ভিলায় গিয়া তাহাদের কার্য্যপ্রণালী সমুদায় তাঁহাকে জানাইল। স্বামিজী উক্ত নাম পরিবর্ত্তন করিয়া Benares Home Of Service রাখিতে বলিলেন। তিনি ইহাদের উৎসাহ, উদ্যম এবং কার্য্যের বিবরণ শুনিয়া এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে বেলুড় মঠে মহারাজকে এই বিষয়ে সমুদায় জানাইয়া বলেছিলেন, "রাজা, এই প্রতিষ্ঠানটীর উপর তোমার দৃষ্টি রেখো।" ইহাই পরে মহারাজের যত্নে ও চেষ্টায় সুবিখ্যাত "কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম" নামে সর্ব্বত্র বিদিত হইয়াছে।

কাশীধামে স্বামিজী পুনরায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন কিছু সুস্থ হইলে নিরঞ্জনানন্দ ও শিবানন্দ তাঁহাকে অতি যত্নে মঠে লইয়া আসিলেন। তাঁহার দেহে শোথের প্রাবল্য দেখিয়া কবিরাজী চিকিৎসা হইল। এই সময়ে মহারাজ তাঁহার গুরুভ্রাতাদের সহিত অন্যান্য সেবকদের মত দিবারাত্রি নিয়মিতভাবে স্বামিজীর সেবা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পরে অনেকের নিকট বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরেরও এত সেবা করি নাই।" স্বামিজীর পীড়া অনেকটা উপশম হইলে মহারাজের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

এই সময়ে একদিন স্বামিজী অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের সম্মুখে মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মাধুকরীর অন্ন অতি পবিত্র. মাধুকরী করে খেতে ইচ্ছে হচ্চে।" স্বামিজীর কথা শুনিয়া তাঁহারা সকলেই মাধুকরী ভিক্ষায় বাহির হইলেন। মহারাজ পশ্চিমের সাধুদের মত গাঁতি বাঁধিয়া বেলুড়ের নিকটবর্ত্তী মাড়োয়াড়ীদের

গৃহে ভিক্ষা করিতে গেলেন। তাঁহার সৌম্য প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা নানাবিধ সুমিষ্ট খাদ্য দান করিল। মহারাজ ও অন্যান্য গুরুভ্রাতারা তাঁহাদের ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী স্বামিজীর সম্মুখে রাখিলেন। স্বামিজী পরম আনন্দ সহকারে সকলের ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিলেন। পরে তাঁহাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, "মাঝে মাঝে এই রকম মাধুকরী ভিক্ষা করতে তোমরা ভুলো না।"

মহারাজের বাল্যকাল হইতে ফল ফুল বৃক্ষ লতার দিকে অত্যন্ত প্রীতি ছিল। তিনি মঠের বাগানে ফল ফুল শাক সবজির সম্বন্ধে আগ্রহের সহিত তত্ত্বাবধারণ করিতেন। আবার এদিকে স্বামিজীও ছেলে বেলায় জীবজন্তু প্রভৃতি ভালবাসিতেন। এই সময়ে তিনি মঠে গাভী, হাঁস, কুকুর, ছাগল, সারস ও হরিণ আনিয়া রাখিয়া ছিলেন। তিনি বাঘা, মটরু, হংসী প্রভৃতি নামে তাহাদিগকে ডাকিতেন। তিনি পাঁচ বৎসরের বালকের ন্যায় তাহাদের সহিত খেলা ও দৌড়াদৌড়ি করিতেন। মঠের বাগানের পার্শ্বে খোলা মাঠভূমিতে স্বামিজীর গাভী, ছাগল প্রভৃতি চরিয়া বেড়াইত। তাঁহারা দুইজনে এই মাঠের ও বাগানের একটী সীমা বিভাগ করিয়া লইয়া ছিলেন। যদি স্বামিজীর গাভী, ছাগল প্রভৃতি উক্ত সীমা অতিক্রম করিয়া বাগানে আসিত তবে মহারাজ অনধিকার প্রবেশ লইয়া প্রবল আপত্তি তুলিতেন। ইহা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে তুমুল প্রেম কলহ উপস্থিত হইত। তাঁহাদের পরস্পরের এই অদ্ভুত বালকবৎ আচরণে মঠের সাধু ব্রহ্মচারীরা এবং তাঁহাদের গুরুভ্রাতারা আনন্দে আপ্লুত হইতেন। মনে হইত যেন দুইটি দিব্যভাবাপন্ন বালক অপরূপ খেলায় মত্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

একজন বিশ্ব বিজয়ী আচার্য্যশ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যজন মঠ মিশনের সঙ্ঘনায়ক স্বামী ব্রহ্মানন্দ। দুইজনেই প্রায় প্রৌঢ়-সীমায় উপনীত! অথচ ইঁহাদের দুইজনের বালকের মত বাহ্যিক প্রীতি-কলহের অন্তরালে কি গভীর প্রেম প্রকাশ পাইত! কিন্তু এই মাধুর্য্যময় ক্রীড়া বেশী দিন স্থায়ী হইল না!

১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জুলাই তারিখে শুক্রবার রাত্রিতে স্বামিজী অকস্মাৎ মহাসমাধিতে লীন হইলেন। সেদিন কার্য্যানুরোধে মহারাজ কলিকাতায় বলরামমন্দিরে ছিলেন। এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ গভীর রাত্রিতে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। অশ্রুনিরুদ্ধ চক্ষে মহারাজ দেখিলেন—তাঁহাদের আরাধ্যতম নেতা, শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা সহচর—তাঁহার কথিত সপ্তর্ষি মণ্ডলের ঋষি সাক্ষাৎ নরনারায়ণ মহাপ্রাণ মহাশক্তি স্থূলদৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইলেন। এই বিরহ তৎকালে তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। স্বামিজীর বক্ষের উপর মহারাজ ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ অতি কষ্টে তাঁহাকে ধীরে ধীরে তুলিয়া উঠাইয়া আনিলেন। বাষ্পগদগদ কণ্ঠে মহারাজ বলিলেন, "সামনে থেকে যেন হিমালয় পাহাড় অদৃশ্য হয়ে গেল!"



স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীত, স্বামী প্রেমানন্দ,
স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দ

বেলুড়মঠে গৃহীত ফটো

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সঙ্ঘের বিস্তার

স্বামিজীর বিরহের আবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের কার্য্যে দৃঢ়ভাবে মনোনিবেশ করিলেন। সঙ্ঘের সংরক্ষণ, পুষ্টি এবং বিস্তার করার গুরুতর দায়িত্বভার তাঁহার উপর অর্পিত রহিয়াছে। এই মহাকার্য্য সাধনই যে তাঁহার জীবনের মুখ্য ব্রত। ইহার জন্যই তিনি ঠাকুরের লীলাসহচর—মানসপুত্র রূপে জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি যে সঙ্ঘনায়ক।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অর্থ কি? ইহা কি একটী সংহতিবদ্ধ দল না সম্প্রদায় বিশেষ? সাধারণতঃ মানব অভিধানে এইরূপ অর্থই বুঝায়। কিন্তু রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ প্রকৃতপক্ষে সেরূপ কোন বিশিষ্ট দল বা সম্প্রদায় নহে। একটী জীবন্ত আধ্যাত্মিক মহাশক্তির স্ফুরিতাধারের রক্ষিবৃন্দ—এই সঙ্ঘ। যে পারমার্থিক মহাশক্তি লোক-কল্যাণের নিমিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে প্রকাশ পাইয়াছিলেন, অধ্যাত্ম জগতে যে পরমতত্ত্ব সেই অপূর্ব্ব লীলায় উদ্ঘাটিত হইয়াছিল এবং যে মহারত্নের দিব্যদ্যুতিতে মানুষের অন্তরলোক আনন্দধারায় দিব্যভাবে উদ্ভাসিত হয় সেই মহাশক্তি, সেই পরমতত্ত্ব সেই মহারত্ন যে সম্পুটে রক্ষিত আছে—সে সম্পুটের ন্যাস-রক্ষকেরাই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ।

বিবেক, বৈরাগ্য, ত্যাগ, তপস্যা ও কঠোর সংযমের সাধনায়

সিদ্ধিলাভ না করিলে কেহ অধ্যাত্ম শক্তিকে ধারণ করিতে পারে না। ঈশ্বরানুভূতিই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—চরম লক্ষ্য। যুগে যুগে মহাপুরুষেরা এই মহান্ সত্য প্রচার করিয়া যান। তাঁহারা তাঁহাদের জীবনের দিব্যালোকে সেই অমৃতকেই লোকসমক্ষে প্রচার করেন। জীবজগতকে এই অমৃতের সন্ধান দিবার জন্যই মহারাজ ব্যাকুল হইয়া বেড়াইয়াছেন। তিনি জীবের দুঃখে বিগলিত হইয়া কতবার বলিয়াছেন যে, "প্রথমে অমৃতের সন্ধান করে নে, অমর হয়ে যা—তারপর যা হয় হবে। ওরে পরশমণি ছুঁয়ে একবার সোনা হয়ে গেলে আর ভাবনা নাই। ঠাকুর বলতেন, 'অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই কর।' তার মানে কি ? জ্ঞান ভক্তি লাভ করে তাঁকে জেনে নিয়ে, যে কোন কাজ করনা কেন, তাতে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তখন বেচালে পা পড়ে না।" তিনি জানিতেন যে নিয়ত সাধনাই সঙ্ঘের প্রকৃত প্রাণস্পন্দন। সাধনায় সিদ্ধি লাভেই সঙ্ঘের বিস্তার। সঙ্ঘই যে অধ্যাত্মশক্তির বিকাশ! পরমার্থকে জীবনে প্রতিষ্ঠা না করিলে কোন কর্ম্ম বা প্রতিষ্ঠান প্রকৃত লোক কল্যাণ সাধন করিতে পারে না, ভারতে অনাদি কাল হইতে এই সত্য প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। এই সুপ্ত পারমার্থিক বোধকে উদ্বোধিত করিতে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ও তাঁহার প্রেমপূর্ণ সমন্বয়বাণী স্বামিজী বজ্রনির্ঘোষে জগত-সমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি ঠাকুরের মূর্ত্ত বাণীরূপেই প্রকাশ পাইয়াছিলেন ; তজ্জন্য স্বামিজী তাঁহার নিজের পরিচয় দিয়াছিলেন, "I am a voice without body" অর্থাৎ আমি অশরীরী বাণী। এই বাণীরই সচলরূপ দিয়াছিলেন মহারাজ। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘকে তিনি শুধু সংরক্ষণ

করেন নাই, ইহাকে সংহত ও সুনিবদ্ধ করিয়া পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। এই সংগঠন কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল। ইহা লক্ষ্য করিয়াই স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "আমার চেয়ে রাখালের spirituality (আধ্যাত্মিকতা) বেশী।" এই পারমার্থিক শক্তি মহারাজের মধ্যে থাকাতেই স্বামিজী তাঁহার কার্য্যের পরিকল্পনা বাস্তবক্ষেত্রে পরিণত করিবার জন্য মহারাজের উপর আস্থা ও নির্ভর করিতেন। স্বামিজী এই ভাবেই প্রণোদিত হইয়া পূজ্যপাদ তুরীয়ানন্দকে বলিয়াছিলেন, "রাখাল হচ্চে spiritual giant আমার চেয়ে। রাখালের কথা আলাদা।"

ঠাকুরের লীলায় তাঁহার অন্তরঙ্গদের প্রত্যেকেরই একটী বিশেষ নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। স্বামিজী ইহা বুঝিয়া মহারাজ সম্বন্ধে তাঁহার গুরুভ্রাতাদের বলিতেন, "সে যতকাল বেঁচে থাকবে ততকাল প্রেসিডেণ্ট হয়েই থাকবে।" পূজ্যপাদ সারদানন্দ এই কথা অধিকতর স্পষ্ট ও বিশদভাবে লিখিয়া গিয়াছেন, "Indeed, if the Swami Vivekananda was loved and cherished by the Master as the instrument by which to proclaim to the world his great Mission in the realm of religion—the Swami Brahmananda was no less regarded by him as the person to fill in an important and very responsible place in the scheme of his religious organisation. অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ যদি ধর্ম্মরাজ্যে তাঁহার গুরুদেবের মহতী বাণী জগতে ঘোষণার পরম যন্ত্রস্বরূপে তাঁহার বিশেষ আদর ও স্নেহের পাত্র হইয়া থাকেন,

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও তাঁহার পরিকল্পিত ধর্ম্ম-সঙ্ঘে অতি প্রয়োজনীয় ও দায়িত্বপূর্ণ স্থান পূরণের যোগ্য বলিয়া তাঁহার কম স্নেহভাজন ছিলেন না।" মহারাজের ভিতরে শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার গুরুভ্রাতারা ঠাকুরের এই মানসপুত্রকে তাঁহার উপযুক্ত প্রতিনিধি জ্ঞানে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন।

ঠাকুর মহারাজকে বলিতেন, "বর্ণচোরা আম।" তাঁহাকে বাহিরে দেখিলে মানুষ সহজে বুঝিতে পারিত না যে তিনি এতটা পারমার্থিক শক্তির আধার। তাঁহার সদানন্দ ভাব, হাস্যপরিহাস, অমায়িক ব্যবহার এবং সাধারণ মানুষের মত বাহ্যিক আচরণ দেখিয়া কে বুঝিবে যে ইনি নরোত্তম লোকপূজ্য মানুষ? কিন্তু যাহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিত, যাহারা সরল ব্যাকুল চিত্তে তাঁহার পুণ্যসঙ্গলাভে ব্যগ্র হইত, যাহারা অশান্তির দাবদাহে দগ্ধ হইয়া অধীরভাবে তাঁহার আশ্রয় লইত—তাহারা প্রাণে প্রাণে বুঝিত—ইঁহার দিব্য তড়িন্ময়ী শক্তি, অলৌকিক অনুপম মাধুর্য্য এবং অফুরন্ত শান্তশীতল স্নেহ। যাহারা তাহার বিন্দুমাত্র আস্বাদ পাইয়াছে তাহারা সে মিষ্টতা, সে মধুররস জীবনে কখন ভুলিতে পারিবে না।

দিন দিন কার্য্যক্ষেত্র যেমন প্রসারিত হইতে লাগিল, মহারাজ তেমনি সঙ্ঘকে অধ্যাত্ম শক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া ইহার সমুদায় কর্ম্মপ্রবাহকে পরমার্থের অভিমুখী করিলেন। এই পরমার্থ শক্তি যাহাতে সঙ্ঘমধ্যে সঞ্চিত থাকে এবং কোনরূপে তাহার অপব্যয় না হয় তজ্জন্য সকলের দৃষ্টি সেদিকে তিনি আকর্ষণ করিতেন।

অহর্নিশ যদিও তিনি ভাবতন্ময় হইয়া থাকিতেন, তবু জগতের কল্যাণের জন্য তিনি স্বামিজীর পরিকল্পনানুযায়ী কার্য্যগুলিকে সতত প্রাণবন্ত রাখিতে প্রয়াস পাইতেন। Work and Worship (কর্ম্ম ও উপাসনা) স্বামিজীর এই বাণীকে তিনি এমন একটী আধ্যাত্মিক প্রেরণায় রূপায়িত করিতেন যে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত-সাধকের অন্তর এক দিব্যচেতনা ও অপূর্ব্ব শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইত।

কলিকাতার মঠ ও মিশনের কার্য্যগুলিকে দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত করিয়া তিনি মঠের সাধু ব্রহ্মচারীদিগকে ঠাকুর ও স্বামিজীর কার্য্যে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। স্বামিজীর অভাবজনিত শোক ও বিষাদ অপসারিত করিয়া তাঁহাদিগকে অধ্যাত্মবলে বলীয়ান্ করিয়া তুলিলেন এবং প্রবল তেজে ও বিপুল উদ্যমে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য পথে সহায়তা করিতে লাগিলেন। তখন কলিকাতার কেন্দ্র ছাড়া মান্দ্রাজ ও মায়াবতী আশ্রম অনেকটা স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বামিজীর দেহত্যাগের অত্যল্পকাল পূর্ব্বে কাশীধামে অদ্বৈতাশ্রম স্থাপিত হয়। কনখলে ও কাশীধামে সেবাশ্রমের সূত্রপাত হইয়াছিল। মঠ ও মিশনের কার্য্যের প্রসারতা দেখিয়া মহারাজের সহায়তার জন্য স্বামিজীর আদেশে ইতঃপূর্ব্বে সারদানন্দ মার্কিণ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত হইয়া রেঙ্গুনে পৌঁছিয়াই শুনিলেন যে স্বামিজী মহাসমাধিতে লীন হইয়াছেন।

এদিকে বাঙ্গলা দেশে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার বেশ প্রবল ভাবেই

চলিতেছিল। গত ১৯০২ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে এলবার্ট হলে স্বামিজীর স্মৃতিসভায় যুবকদের দ্বারা 'বিবেকানন্দ সমিতি' গঠিত হইল। লোক কল্যাণের জন্য স্বামিজী যে কার্য্য প্রণালীর আদর্শ বঙ্গের যুবকদিগের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গলার ছাত্রদের ও তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ত্যাগী সাধুদের সাহায্যে প্রচার করাই সমিতির উদ্দেশ্য। মহারাজ এই সমিতির যুবকদের সংকল্পিত কার্য্যে উৎসাহ এবং সৎপরামর্শ দান করিয়া তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক জীবনলাভে সহায়তা করিতেন। মান্দ্রাজের বিভিন্ন অঞ্চলে, বোম্বাই এবং রেঙ্গুনে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল এবং তথাকার উদ্যোক্তারা শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামিজীর বাণী শুনিবার উদ্দেশ্যে মঠের সাধুদিগকে আহ্বান করিলেন। কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে শ্রীরামকৃষ্ণ কিম্বা বিবেকানন্দ নাম সংযোগে নানা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। তথাকার উদ্যোক্তা ও সদস্যেরা অনেকেই তাঁহার নিকট যাতায়াত করিত। তিনি তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রেরণা দিতেন এবং এই সকল সভা সমিতি এবং কার্য্যপ্রণালী শুধু একটা হুজুগ বা বৃথা আন্দোলনে পর্য্যবসিত না হয় সেদিকে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। তাহাদিগকে সর্ব্বদা মঠে যাতায়াত করিয়া সাধুসঙ্গ ও সাধন ভজনের উপদেশ দিতে লাগিলেন। ঠাকুরের কোন কোন অন্তরঙ্গ গৃহস্থ ভক্তের গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব অনুষ্ঠিত হইত। মহারাজ সে সব উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া এমন আধ্যাত্মিক ভাবতরঙ্গের আবেষ্টন সৃজন করিতেন যে অনেকেই তাঁহার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিত। দুইবৎসর পরে মহারাজ মঠ ও মিশনের সাধারণ কার্য্যভার সারদানন্দকে

এবং বেলুড় মঠের অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রেমানন্দকে অর্পণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে কাশীধামে যাত্রা করিলেন।

কাশীধামে পূজ্যপাদ শিবানন্দ "অদ্বৈতাশ্রমে"র কার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। মহারাজ তথায় গিয়া দেখিলেন সেখানে কার্য্য করিবার লোকাভাব, অর্থাভাব এবং সময়ে সময়ে ভিক্ষারও অভাব। দিনের পর দিন এইরূপ ক্লেশে ও কঠোরতায় যাপন করিয়া ধৈর্য্য-সহকারে পূজ্যপাদ শিবানন্দ ঠাকুরের প্রচারকার্য্য চালাইতেছিলেন। কাশীর যুবকদের প্রতিষ্ঠিত 'সেবাশ্রমে'র প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য স্বামিজী মহারাজকে বলিয়াছিলেন—সে কথা তাঁহার স্মরণ পথে উদিত হইল। একটী কমিটি তখন উক্ত সেবাশ্রমের কার্য্য পরিচালনা করিতেছিল। মহারাজ তথায় উপস্থিত হইলে উক্ত কমিটির অধিকাংশ সদস্যের মতে রামকৃষ্ণ মিশনের হস্তে উহার পরিচালনার ভার অর্পিত হইল। সেবকেরা অনেকেই প্রায় স্বামিজীর প্রদর্শিত সেবাধর্ম্মের আদর্শে বা ভাবে অনুপ্রাণিত এবং কেহ কেহ তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্য। মহারাজ তাঁহাদিগকে এই মহৎ কার্য্য পরিচালনে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিলেন। তিনি বলিতেন যে, "স্বামিজীর কথা ও ঠাকুরের বাণী অভিন্ন। জগতে তিনি স্বামিজীর ভিতর দিয়াই প্রকাশ পাইয়াছেন এবং স্বামিজী যদি ঠাকুরকে সাধারণ মানুষের উপযোগী করিয়া লোকসমক্ষে না ধরিতেন তবে সাধারণ মানুষের মন দিয়া তাঁহাকে কেহ বুঝিতে পারিত না। শ্রীরামকৃষ্ণ এত বড় মহাশক্তির আধার ছিলেন।" এইরূপ উপদেশে এবং তাঁহার সতেজ আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ বাক্যে তাঁহারা দ্বিগুণতর উৎসাহে শিবজ্ঞানে জীব সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। একমাসকাল তথায় থাকিয়া

তিনি অদ্বৈত-আশ্রম ও সেবাশ্রমকে স্থায়ী আকারে স্থাপিত করিলেন। পরে কলিকাতা ইটালী নিবাসী পরলোকগত উপেন্দ্রনাথ দেব মহাশয় ৺কাশীধামে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের জন্য জমি খরিদ করিতে এককালীন চারি হাজার টাকা দান করিলেন। সেবকদের সেবাকার্য্য দেখিয়া অনেকেই মুগ্ধ হইল এবং ঈদৃশ মহদনুষ্ঠানে সহায়তা করিতে ক্রমশঃ তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সময়ে অদ্বৈতা-শ্রমের অভাবও মহারাজ কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব করিয়াছিলেন এবং তাহার কার্য্যও দিন দিন বিস্তৃত হইয়া পড়িল। অনেক ধর্ম্ম-পিপাসু ভক্তেরা ইহার প্রতি আকৃষ্ট হওয়াতে সমুদায় অভাব ধীরে ধীরে দূরীভূত এবং সেবাশ্রমের জমির সঙ্গে অদ্বৈতাশ্রমের জমিও ক্রীত হইল।

কাশীধাম হইতে মহারাজ হরিদ্বারে কনখল সেবাশ্রমে গমন করিলেন। তথায় স্বামিজীর শিষ্য কল্যাণানন্দ আর্ত্ত ও পীড়িত সাধুদের জন্য এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তখন তিনটী মাত্র চালাঘর ছিল—তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা একটী ছোট অংশে মহারাজ অবস্থান করিতেন। সেই পবিত্র তপস্যাপূত তীর্থে হিমালয়ের ক্রোড়ে বসিয়া মহারাজ প্রায় দিনরাত ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। ইহার প্রায় বর্ষাধিক পরে কোন সহৃদয় ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি মহারাজের নিকট কনখল সেবাশ্রমের জন্য দুই কিস্তিতে আঠার শত টাকা দিয়াছিলেন। ইহাতে উক্ত আশ্রমের কার্য্য সুন্দরভাবে চলিতে লাগিল এবং স্থায়ী আকারে গৃহনির্ম্মাণেরও সূত্রপাত হইল।

মহারাজ হরিদ্বার হইতে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। এখানে স্বামী তুরীয়ানন্দ তপস্যা করিতেছিলেন। স্বামিজীর আকস্মিক

দেহত্যাগে তাঁহার অদর্শনজনিত দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে বিশেষ ভাবেই আঘাত করিয়াছিল। মহারাজ শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার সহিত একসঙ্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন মঠের সাধুব্রহ্মচারীদিগের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে মহারাজ তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। তুরীয়ানন্দ তাহাতে সম্মত হইলেন না।

শ্রীবৃন্দাবনে একটী ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া তাঁহারা কয়েকদিন বাস করিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্ব্বে তুরীয়ানন্দের সঙ্গে ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল ছিল। ঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রীযুত নবগোপাল সপরিবারে সে সময়ে বৃন্দাবনে শ্রীযুত বলরামবাবুর কালাকুঞ্জে বাস করিতে-ছিলেন। তাঁহার পুত্র নীরোদ (অম্বিকানন্দ) প্রায়ই তাঁহাদের দর্শন করিতে আসিত। পূর্ব্ব হইতে পরিচয় থাকায় তুরীয়ানন্দের সহিত তাহার বেশী সঙ্গ হইত। মহারাজকে গম্ভীর প্রকৃতি দেখিয়া তাঁহার নিকট যাইতে তাহার তত সাহস হইত না, দরজার সম্মুখে প্রণাম করিয়াই চলিয়া যাইত। তুরীয়ানন্দ ইহা লক্ষ্য করিয়া তাহাকে বলিলেন, "কিরে, তুই ভিতরে গিয়ে মহারাজের পাদস্পর্শ করে প্রণাম কর। বাইরে থেকে ও রকম করে চলে আসিস কেন?" নীরোদ তুরীয়ানন্দের আদেশে ভয়ে ভয়ে মহারাজের ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রণাম করিলে মহারাজ তাহাকে বলিলেন, "ভয় কি বাবা।" এই বলিয়া তিনি নীরোদের পিঠে ও মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। সেই স্পর্শে নীরোদের হৃদয় হইতে সকল ভয় চলিয়া গিয়া এক অদ্ভুত আনন্দ বোধ হইতে লাগিল। পরদিন হইতে নীরোদ মহারাজকে প্রণাম করিয়া অধিকাংশ সময় তাঁহার নিকট অতিবাহিত করিত। ক্রমশঃ নীরোদ এতদূর আকৃষ্ট

হইল যে তুরীয়ানন্দের নিকটে প্রায় পূর্ব্বের মত বসিতই না। ইহাতে একদিন মহারাজ হাসিতে হাসিতে তুরীয়ানন্দকে বলিলেন, "মশায়, আপনার চেলা যে বিগড়ে গেল!" তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বেশ হয়েছে।"

এই সময়ে মহারাজ রাত্রি ১২টার সময় উঠিয়া প্রত্যহ ধ্যান জপ করিতেন, প্রায় প্রতি রাত্রেই দেখিতে পাইতেন একটী বৈষ্ণব বাবাজী তাঁহার ঘরের মধ্যে জপের মালা হাতে দাঁড়াইয়া আছেন। একদিন রাত্রি ১২টার পূর্ব্বে মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই দেখিয়া কে যেন তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া উঠাইয়া দিলেন। নিদ্রা ভাঙ্গিলে তিনি চাহিয়া দেখেন যে সেই বাবাজী দাঁড়াইয়া আছেন—এবং জপাদি করিবার জন্য হাত দিয়া ইঙ্গিত করিতেছেন। তখন নহবৎ বাজিয়া ওঠায় তিনি বুঝিলেন যে রাত্রি ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি পরে কাহাকেও কাহাকেও বলিয়াছিলেন যে, "বৈষ্ণব সাধুরা বৃন্দাবনে নিত্যলীলা দর্শন করিবার জন্য সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থান করেন।"

নীরোদ সুন্দর গান গাহিতে পারিত। মহারাজ প্রায়ই তাহার গান শুনিতেন। একদিন মহারাজ তাহাকে লইয়া শ্রীশ্রীরাধারমণ জীর মন্দির দর্শন করিতে গেলেন—সেখানে তিনি ধ্যান তন্ময়ভাবে ভজন শুনিতে লাগিলেন। নীরোদও কয়েকটী ভজন গাহিল। তাঁহারা মন্দির হইতে চলিয়া আসিতেছেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এক চেঙ্গারী হাতে নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রসাদ লইয়া আসিয়া নীরোদের হাতে দিল। মহারাজ রহস্য করিয়া কিশোর বালক নীরোদকে বলিলেন যে, "তোকে আগে বলেছিলুম ওরা সব ভাল ভাল ভোগ ঠাকুরকে দেয়—ঠাকুর দর্শন করবি, প্রসাদ পাবি। দেখলি, এই হ্যাথ কত প্রসাদ দিয়েছে।"

মহারাজ কলিকাতায় ফিরিবার পথে এলাহাবাদে ব্রহ্মবাদিন ক্লাবে পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দের নিকট উঠিলেন। একদিন মাত্র তথায় থাকিয়া বিন্ধ্যাচলে মহারাজ নীরোদকে লইয়া চলিয়া গেলেন। তথায় শ্রীযুত যোগীন্দ্র নাথ সেন নামক জনৈক ঠাকুরের সময়কার ভক্তের গৃহে মহারাজ অবস্থান করিলেন। একদিন অমাবস্যা তিথিতে রাত্রিকালে তিনি নীরোদের গাত্র স্পর্শ করিয়া জাগাইয়া তুলিলেন এবং বলিলেন, "তোর সব গরম জামা কাপড় বেশ করে পরে নে।" তখন শীত কাল। পশ্চিমের সেই প্রচণ্ড শীতে মহারাজ পশ্চিমের সাধুদের মত শুধু গাঁতি বাঁধিয়া কাপড় পরিলেন এবং সর্ব্বাঙ্গে একটী কম্বল জড়াইয়া লইলেন। হাতে লাঠী লইয়া মহারাজ নীরোদের হাতে একটী লণ্ঠন দিয়া বলিলেন, "চল, মহামায়াকে দর্শন করে আসি।" মন্দির পথ অতিশয় অসমতল ছিল বলিয়া তিনি নীরোদের হাত ধরিয়া বলিলেন, "দেখিস, সাবধানে চলিস।"

মহারাজ মন্দিরসম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন বহু লোক বসিয়া আছে, কেহ জপ করিতেছে আবার কেহ স্তোত্র পাঠ করিতেছে। শ্রীশ্রীমহামায়ার মন্দিরের দরজা তখনও বন্ধ। কিয়ৎক্ষণ পরে দ্বার খুলিলে সকলেই অগ্রে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু পাণ্ডারা মহারাজের তেজপূর্ণ প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকেই দর্শন করিবার জন্য সাদরে সর্ব্বাগ্রে প্রবেশ করিতে দিল। তিনি নীরোদকেও হাত ধরিয়া সঙ্গে লইয়া গেলেন। দেবীর শ্রীমূর্ত্তি সুন্দর পুষ্পমাল্যে সুশোভিতা হইয়া বিরাজ করিতেছিল। ভাবোন্মত্ত মহারাজ নীরোদকে বলিলেন, "কৃপাময়ী কালকামিনী গানটা গা।"

নীরোদ তাঁহার আদেশ মত গাহিল—

"কৃপাময়ী কালকামিনী ঘোর কালভয়-নিবারিণী,
কালী মহাকাল বক্ষঃ বিহারিণী,
করালী ঘনবরণা শিবানী শবাসনা
নরমুণ্ড বিভূষণা,
শ্মশান শোভনা প্রসীদ প্রিয় কামিনী।"

মা জগদম্বার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই ভজন গীত হইল। গান শুনিতে শুনিতে "আহা! আহা! মা জগদম্বে, ব্রহ্মময়ী, দয়াময়ী" ইত্যাদি বলিয়া মহারাজ বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে ধ্যানে তন্ময় হইলেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার দেহে পুলক কম্পনাদি প্রকাশ পাইল। তাঁহার সেই দিব্যভাবের অবস্থা দেখিয়া পাণ্ডারা সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল এবং শ্রদ্ধাভরে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল যাহাতে অপর যাত্রীরা তাঁহার উপর না আসিয়া পড়ে। গান বন্ধ হইবার কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া "মা" "মা" রব উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

বিন্ধ্যাচলে মহারাজ ত্রিরাত্র থাকিবার সংকল্প করিয়াছিলেন কিন্তু যোগেন বাবুর একান্ত আগ্রহে ও যত্নে তাঁহাকে আরও কিছুদিন থাকিতে হইল। একদিন পাহাড়ের উপর যে স্থানে শ্রীশ্রীঅষ্টভুজা দেবীর মূর্ত্তি আছে তথায় সকলে মিলিয়া বনভোজন করিবে ইহা স্থির করিয়া যোগেন বাবু মহারাজকে জানাইলেন। তিনি সানন্দে সম্মতি দিলেন। রন্ধনের সমস্ত উপকরণসহ একটী হারমনিয়াম সঙ্গে লইয়া সকলে তথায় যাত্রা করিলেন। আমোদ আহ্লাদ করিতে করিতে উদ্যোক্তারা রন্ধনের ব্যবস্থায় ব্যস্ত থাকিলেন। ইত্যবসরে

মহারাজ নীরোদকে সঙ্গে লইয়া একটী গুহার ভিতরে শ্রীঅষ্টভুজা দেবীকে দর্শন করিতে গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি দেবীর সম্মুখে প্রণত হইলেন। স্থানটী অতি নির্জ্জন এবং তথায় কোন জন-প্রাণী সে সময়ে ছিল না। মহারাজ নীরোদকে বলিলেন, "জানি না কি বলে ডাকি তোরে, গানটী গা।"

তাঁহার আদেশ শুনিয়া নীরোদ গাহিল,

"জানিনা কি বলে ডাকি তোরে (শ্যামা মা)
কখন শঙ্কর বামে কভু হর-হৃদি পরে,
কখন বিশ্বরূপিণী কভু বা মা উলঙ্গিনী,
কভু শ্যাম সোহাগিনী—কভু রাধার পায়ে ধরে।
যে যা বলে শুনিব না,
(আমার) মা নামের নাই তুলনা,
তাই ভেবে ডাকি "মা" "মা" বলে
ঐ অভয় পদ পাবার তরে!

গান শুনিতে শুনিতে মহারাজের প্রেমবিগলিত অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল,—সমগ্র শরীরে কম্পন পুলকাদি হইতে হইতে একেবারে তিনি স্থির নিস্পন্দ হইয়া গেলেন। গান থামিয়া গেল—তথাপি তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা নাই। কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইলে নীরোদকে তিনি বলিলেন, "চল, আর এক জায়গায় যাই।" পাহাড়ের শীর্ষদেশে আরোহণ করিয়া একটী কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ স্থান নির্ব্বাচন করিয়া মহারাজ পুনরায় ধ্যান করিতে বসিলেন। নীরোদ স্থির ভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল; পরে বালস্বভাববশতঃ সে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মহারাজের ধ্যান ভঙ্গের পর তিনি

গাত্রোত্থান করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, নীরোদ নানা বর্ণের বনফুল চয়ন করিয়া আঘ্রাণ করিতেছে। তিনি ধমক দিয়া তাহাকে বলিলেন, "খবরদার যা তা শুকিস নি, কিসে কি হয় জানিস?" দুইজনে তখন বনভোজনের স্থানে ফিরিয়া আসিলেন এবং আহারান্তে আনন্দ করিতে করিতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এইরূপে পরমানন্দে কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়া তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া মহারাজ মঠ ও মিশনের কার্য্য সুচারুরূপে পরিদর্শন ও পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কার্য্যক্ষেত্র যেমন দিন দিন অধিকতর বিস্তৃত হইতে লাগিল তেমনি কোন বিষয়ে লোক ও অর্থেরও অভাব হইল না। শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া ত্যাগ ও বৈরাগ্যের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইল। মান্দ্রাজ ও বাঙ্গালোর কেন্দ্রে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের নিকট সাধু ব্রহ্মচারী প্রেরিত হইল। মান্দ্রাজে তাঁহার নিকট থাকিয়া কেহ শিক্ষালাভ ও কার্য্যের সহায়তা করিতে লাগিলেন এবং কেহ বা তাঁহার উপদেশানুসারে বাঙ্গালোরে কার্য্য পরিচালনা করিতেন। ৺কাশীধামেও সেবাশ্রমের জন্য সাধু ও ব্রহ্মচারী মহারাজ পাঠাইলেন। বাঙ্গলা দেশে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে দুর্ভিক্ষ বন্যা বা অগ্নিদাহ প্রভৃতি কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে দুঃখকষ্ট প্রপীড়িত লোকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য মিশন হইতে সাধু ব্রহ্মচারী প্রেরিত হইত। মুর্শিদাবাদে অখণ্ডানন্দ একটী অনাথ আশ্রম স্থাপন করিলে তথায় তাঁহার কার্য্যের সুবিধার জন্য মঠ হইতে সাহায্য প্রেরিত হইত। মার্কিণ কেন্দ্রের কার্য্য

সুপরিচালিত ভাবে চালাইবার জন্য এবং তথায় প্রচারের প্রসারতার জন্য একে একে ত্রিগুণাতীত, নির্ম্মলানন্দ, বোধানন্দ এবং প্রকাশানন্দকে মহারাজ পাঠাইয়া দিলেন। মঠে নিয়মিত জপ ধ্যান ও শাস্ত্রালোচনা চলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে তিনি সমবেত ভাবে সাধু ব্রহ্মচারিগণের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের ও স্বামিজীর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ও বাক্য উত্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভের জন্য সাধনভজনে উৎসাহিত করিতেন। চিত্তশুদ্ধির জন্য মাত্র কর্ম্মের প্রয়োজন কিন্তু কর্ম্মই জীবনের লক্ষ্য নহে ইহা দৃঢ়ভাবে তাহাদের হৃদয়ে জাগরূক করিয়া দিতেন। তিনি তাহাদিগকে বলিতেন, "বার আনা ভগবান লাভের জন্য সাধনভজনে মন রাখিয়া চারি আনা কর্ম্মের দিকে রাখিলেই যথেষ্ট। দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া যদি ভগবান লাভের চেষ্টা না হয় তবে সে মনুষ্যত্ব বৃথা। নিয়ম নিষ্ঠা করিয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য জপ ধ্যান করিতে হয়। খুঁটি পাকড়াও—তাতে শরীর যাক আর থাক। দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া অগ্রসর হইলে নিশ্চয়ই বস্তুলাভ হয়।" এইভাবে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই ভগবচ্চিন্তা করিবার জন্য মহারাজ বারম্বার উপদেশ প্রদান করিতেন। নিজের চিত্ত-শুদ্ধির জন্য বহুলোকের হিতার্থে কর্ম্ম করার প্রয়োজনীয়তা মহারাজ বুঝাইয়া দিতেন। জপ ধ্যানের ব্যপদেশে যাহাতে অলসতার প্রশ্রয় না পায়, তাই তিনি তাঁহাদিগকে বলিতেন, "দিনরাত কয়জন জপ ধ্যান করতে পারে? বাজে নানাপ্রকার অসচ্চিন্তা না করে, ভাল কাজ করা কি ভাল নয়? স্বামিজী আমাদের বলতেন, 'ওরে বহুজনহিতায় যদি একটা জন্ম বৃথাই গেল এরূপ মনে করিস—তা গেলই বা। কত জন্ম তো আলস্যে বৃথা গেছে, একটা জন্ম না হয়

জগতের কল্যাণের জন্যই গেলে, ভয় কি?' আর ভয়েরও কারণ নেই। গীতায় আছে নিষ্কাম কর্ম্ম করলে ভগবান লাভ হয়। 'Work and Worship' স্বামিজীর মুখে শোনা যেত। কাজও কর, ধ্যান জপও কর।" এই মন্ত্রেই মঠের সাধু ব্রহ্মচারীদিগকে তিনি অনুপ্রাণিত করিতেন। তাঁহার নিজের জীবনও এই ধর্ম্মকর্ম্ম সমন্বিত ও সে ভাবের আদর্শ। অহর্নিশ তিনি তন্ময়, সর্ব্বদা অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করিতেছেন আবার লোক-কল্যাণের জন্য সমুদায় কর্ম্ম করিতেছেন। শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় সহজেই ইহা সম্পন্ন হইতেছে। এই জন্য তাঁহার কথাগুলি শ্রোতার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিত এবং হৃদয়ের সংশয় স্বতঃই তিরোহিত হইত।

কখনও কখনও তিনি মঠে ঠাকুরের ভোগে কোন্ তরকারি কিভাবে রাঁধিতে হইবে এবং কোন তরকারির কি গুণ তাহাও বলিয়া দিতেন। খুঁটিনাটি কোন জিনিষের ব্যতিক্রম দেখিলে তিনি কঠোর ভাবে শাসন করিতেন। যিনি সর্ব্বদা ঈশ্বরভাবে তন্ময়, তিনি আবার এই সব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, ইহার তত্ত্ব কে নির্ণয় করিবে?

যে সকল গৃহস্থ ভক্তেরা তাঁহার নিকট আসিত—তিনি তাঁহাদের সংসার এবং কাজকর্ম্ম ও আয়ব্যয়ের আনুপূর্ব্বিক সংবাদ লইতেন। এমন কি কোন কোন ধর্ম্মপ্রাণ তরুণ যুবক বেকার ভাবে বসিয়া অর্থকষ্ট পাইতেছে কিম্বা তাহাদের সংসারে অভাব অনটন চলিতেছে, জানিতে পারিলে তিনি সহৃদয় হইয়া কাহাকেও বলিয়া তাহাদের কাজ-কর্ম্মের সুবিধা করিয়া দিতেন। তাঁহার হৃদয় এত মহৎ ছিল যে, দরিদ্র গৃহস্থেরা তাঁহার সন্নিধানে আসিলে তিনি যেন তাঁহাদের মত চিন্তিত হইয়া নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। অথচ এই আলোচনায়

তাহারা যেমন সান্ত্বনা লাভ করিত, তেমনি দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানও পাইত। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমনি এই দিব্য-পুরুষ তাঁহার বিরাট হৃদয়ের প্রেম ও সহৃদয়তায় সাধারণ লোককে আকর্ষণ করিতেন। অথচ তিনি তাহাদের মধ্যে অধিকারী অনুযায়ী সাধনভজনের উপদেশ দিতেন। অনেকে তাঁহাকে শুধু ইহকালের উপদেষ্টা বা পরকালের গুরু বলিয়া মনে করিত না—ইহপরকালের সর্ব্বস্ব বলিয়া জ্ঞান করিত। এইজন্য তিনি কলিকাতায় আসিলে ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র উপেক্ষা করিয়া, সহস্র কাজকর্ম্ম তুচ্ছ করিয়া এবং নানা বিপদ আপদকে অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা দলে দলে তাঁহার নিকট আসিত। তাহাদের বিশ্বাস যে তাঁহার নিকট গেলে সব অশান্তির শান্তি হইবে।

মহারাজ অকস্মাৎ টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হইলেন। চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করিতেছে, সেবকেরা সেবা-শুশ্রূষায় নিরত রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে দর্শনমাত্রেই সকলের অন্তর যেন এক দিব্যভাবে আনন্দময় হইয়া উঠিত। যাহা হউক ধীরে ধীরে রোগমুক্ত হইলে মহারাজ বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য সিমুলতলায় গমন করিলেন। প্রায় মাসাধিক তথায় থাকিয়া পুনরায় বেলুড় মঠে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। পরে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন তারিখে তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য প্রেমানন্দ ও জনৈক সেবকসহ তিনি ভদ্রক হইয়া পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পুণ্যধাম নীলাচলে মহারাজের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে লাগিল। তিনিও তন্ময় হইয়া বেশ আনন্দে থাকিতেন। তীর্থসমূহের মধ্যে পুরী, শ্রীবৃন্দাবন ও কাশীধাম তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। তিনি

বলিতেন যে, শ্রীবৃন্দাবনে মহানিশায় আধ্যাত্মিক তরঙ্গের প্রবাহ চলিতে থাকে, সেই সময়ে সেখানে ধ্যান জপ করিলে প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায়। কাশীধামে রাত্রি ৪টার সময় ধ্যান করিতে বসিলে সাধক গভীর তন্ময়তা লাভ করিতে পারে—এমনি স্থানের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা। নীলাচলে মহাপ্রসাদকে তিনি বিশেষ ভক্তি করিতেন।

এই সময়ে বহুকাল পরে অভেদানন্দ আমেরিকা হইতে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতার পথে তিনি রামকৃষ্ণানন্দ ও পরমানন্দ সমভিব্যাহারে নীলাচলে মহারাজকে দর্শন করিতে আসিলেন। ইতিপূর্ব্বে শিবানন্দ, প্রেমানন্দ এবং অখণ্ডানন্দ পুরীতে মহারাজের নিকট অবস্থান করিতেছিলেন। মহারাজ গুরু-ভ্রাতাদের দেখিয়া অত্যন্ত উৎফুল্ল হইলেন। সাধু ও ভক্তদের সমাবেশে শশী-নিকেতনে নিত্য আনন্দোৎসব চলিতে লাগিল।

টাইফয়েডের পর হইতেই বেলুড় মঠের কার্য্যপরিচালনার ভার সম্পূর্ণভাবে প্রেমানন্দের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন এবং মিশনের ও অন্যান্য মঠসমূহের কার্য্যাদির ব্যবস্থার জন্য সারদানন্দের উপর তিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে লাগিলেন। ইঁহারা প্রয়োজনীয় বিষয়ে মহারাজের পরামর্শ ও অনুমতি লইয়া কাজ করিতেন। মঠ ও মিশনের কোন বিষয়ই তাঁহার নিকট গোপন রাখা হইত না। তাঁহারা প্রত্যেক বিষয়টী তাঁহার গোচরে আনিতেন। পুরী হইতে তিনি এইভাবে মঠ ও মিশনের কাজ চালাইতেন। তাঁহার গুরু-ভ্রাতারা সাধ্যমত তাঁহাকে কোন বিষয়ে ব্যস্ত করিয়া তুলিতেন না। মহারাজ যাহাতে সুস্থদেহে ও মনের আনন্দে থাকেন ইহাই ছিল

তাঁহাদের একান্ত কামনা। পুরী হইতে সকলে মিলিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ৭ই মে তিনি কলিকাতা হইতে পুনরায় পুরীধামে শশী-নিকেতনে আসেন। মাঝে প্রায় মাসখানেক তিনি কোঠারে ছিলেন। মহারাজ তথায় নানাবিধ ফলফুল ও কপির চাষ করাইয়াছিলেন। গৃহস্বামী পরমভক্ত রামকৃষ্ণ বাবু (শ্রীযুত বলরামবাবুর পুত্র) দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তাঁহার ২৯শে নবেম্বরের ডায়েরীতে লিখিয়াছিলেন, "পুরীর বাটীর চারিদিকে ঘুরিয়া পরম সুখ পাই। দেদার কপি হইয়াছে। মহারাজ যেন যোগবলে করিয়াছেন।" রামবাবুর বিস্মিত হইবার কারণ, ইতঃপূর্ব্বে বালুরাশির উপর কেহ কপির চাষ করে নাই।

বাস্তবিকই ফলফুল শাকসবজি সম্বন্ধে মহারাজ এত বেশী জানিতেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বৃক্ষলতা সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল এবং তাঁহার ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতার ফলেই তিনি ঐ বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। একবার কোন একজন প্রবাসী যুবক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলে কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যেখানে আছ—সেখানে খাবার দাবার তরিতরকারি কেমন পাওয়া যায়?" যুবকটী প্রত্যুত্তরে বলিল, "মহারাজ! স্থানটীর চারিদিকে পাহাড় জঙ্গল, হাট-বাজার অনেক দূরে—আর হাটেও তরিতরকারি কিছু মেলে না।" মহারাজ গম্ভীরভাবে আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে বাড়ীতে থাক সেখানে উঠান বা খালি জায়গা পড়িয়া নাই?" সে বলিল, "বাড়ীটীতে প্রায় দু-তিন বিঘে জমির উপর মাঠের মত খালি জায়গা

পড়ে রয়েছে।” মহারাজ তাহাকে ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন, “তোমার মত আহাম্মক তুনিয়ায় নেই। এত জায়গা, সেখানে তুটো তরকারির গাছ লাগাতে পার না? কেবল কুঁড়েমি করে কষ্ট পাবে তা আর কি বলবো? বেগুন, কুমড়ো, শাক, কপি, সিম, বরবটী আর কত রকম তরকারির বীজ এনে লাগাতে পার। শুধু তুবেলা একটু জল দেওয়া আর দেখা! এইটুকু কষ্ট করলে তরকারি এত হতে পারে যে পাঁচজনকে বিলিয়ে নিজে যথেষ্ট খেতে পার। অপর লোকও তা দেখে শেখে। এতে নিজের আর পরের উপকার তুই-ই হতে পারে। গাছপালা ফলফুল তরকারির বাগান করলে মনও ভাল থাকে আর টাটকা জিনিষ খেয়ে শরীরও সুস্থ থাকে।” তিনি প্রায়ই বলিতেন, “গাছপালার যত্ন ও সেবা করলে তারা মানুষের মত নেমকহারামি করে না। তারা ফলফুল ছায়া দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে। মনকেও আনন্দে রাখে।” মহারাজ যখন যেখানে থাকিতেন—সেইখানে গাছপালার দিকে আগে দৃষ্টি পড়িত। যে মঠে বা আশ্রমে তিনি বাস করিতেন সেইস্থানকেই ফলফুল বৃক্ষলতায় শোভিত করিতেন। স্বহস্তে কখন কখন বৃক্ষমূলে জল সেচন করিতে করিতে বলিতেন, “বৃক্ষ সেবা।” নানাজাতীয় ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে দেখিয়া তিনি কখনও কখনও বলিতেন, “আহা, যেন দেবকন্যারা হাসছেন।” ফল ফুল বৃক্ষলতাকে তিনি চৈতন্যময় দেখিতেন এবং তাহার অযত্ন দেখিলে তিনি তুঃখিত হইতেন। এমনকি পূজার জন্য গাছ হইতে কেহ ডাল ভাঙ্গিয়া ফুল ছিঁড়িয়া লইলে তিনি তিরস্কার করিতেন। যাহাতে গাছের শোভা নষ্ট হয় কিম্বা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া যায়—তাহা নিষেধ করিয়া দিতেন। বৃক্ষে বৃক্ষে কুসুমস্তবক ফুটিয়া

আছে দেখিয়া তিনি তন্ময় হইয়া বলিতেন, "বিরাটের পূজো হচ্চে।"

১৯০৮ সালের ৭ই এপ্রেল তিনি কলিকাতা হইতে কাশীধামে সেবাশ্রমের ভিত্তিস্থাপন করিতে গমন করিয়াছিলেন এবং ১৬ই এপ্রেল বেলা নয়টার সময় নূতন জমিতে ভিত্তি-স্থাপনা হইয়াছিল। সেবাশ্রমের এক একটী ওয়ার্ড বা ঘরের সম্পূর্ণ ব্যয়-বহনকারী দাতার নাম বা স্মৃতি-রক্ষার উদ্দেশে তাঁহার কোন প্রিয়জনের নাম পাথরে ক্ষোদিত থাকিবে ইহা বলিয়া মহারাজ কোন কোন ভক্তদের নিকট হইতে গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে অচলানন্দ যখন কোঠারে ছিলেন মহারাজ তাঁহাকে বলিয়া পাঠান যে কাশীর কাযের দিকে যেন মন থাকে। পরে তিনি সেবাশ্রমের কয়েকটী স্মৃতিভবন নির্ম্মাণ করাইতে তাঁহাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। কাশী সেবাশ্রমের স্মৃতি-ভবনগুলি মহারাজেরই কল্পনা-প্রসূত। মহারাজের এই ভাবটী অতঃপর ভারতের নানাস্থানে সেবাশ্রম ও শিক্ষায়তন নির্ম্মাণে—অনুসৃত হইতেছে।

তাঁহার হৃদয়ের অগাধ প্রেম এবং অসীম উদারতা নানা কার্য্যে ভাবভাবে ও লোকব্যবহারে কখন কখন জ্বলন্তভাবে প্রকাশ পাইত। কাশী সেবাশ্রমের প্রারম্ভে জনৈক কর্ম্মী হঠাৎ কোন প্রলোভনে পড়িয়া পথভ্রষ্ট হওয়াতে রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত তাঁহার সকল সংস্রব ছিন্ন হইয়াছিল। কিছুদিন পরে—মিশনের কর্ত্তৃপক্ষ শুনিতে পাইলেন যে, কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের নাম করিয়া সে অনেক সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিতেছে। এইরূপ ভাবে প্রবঞ্চনা করিতে করিতে একদিন সে বগুড়ায় ধরা পড়িল। আদালতে

মঠ ও মিশনের নামে প্রবঞ্চনা করার কথা একেবারে সে অস্বীকার করিল। সুতরাং মঠ ও মিশনের সভাপতি ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে সাক্ষ্য দিতে বগুড়ায় যাইতে হইল। কিন্তু সাক্ষীর কাঠগড়ায় মহারাজকে দেখিয়াই আসামী কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের সমুদয় অপরাধ স্বীকার করিল। অনুতপ্ত অশ্রুধারা দেখিয়া মহারাজ ব্যথিত হইলেন এবং দণ্ডহ্রাসের চেষ্টা করিলেন। তরুণ বয়সে প্রথম অপরাধ বিবেচনায় হাকিম তাহাকে বিনাশ্রমে তিনমাস কারাদণ্ড দিলেন। কারামুক্তির পর মহারাজের সহিত অকস্মাৎ তাহার সাক্ষাৎ হয়। মহারাজ স্নেহভরে তাহাকে আবার মঠে যাইতে বলিলেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে সে সদ্ভাবে জীবনকে পরিচালিত করিতে পারে তজ্জন্য অনেক সদুপদেশ দিলেন। ভাগ্যদোষে বা লজ্জাবশতঃই হউক সে আর মঠে ফিরিয়া গেল না। মহারাজ অনেক সেবক বা কর্ম্মীকে গুরুতর অপরাধেও ক্ষমা করিতেন। বাস্তবিকই তিনি অদোষদর্শী ছিলেন এবং বলিতেন, "তাঁহার কৃপা কটাক্ষে কোটী জন্মার্জ্জিত পাপ মুহূর্ত্তে নষ্ট হইয়া যায়।"

মঠ ও মিশনের জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের বিস্তার প্রকৃতপক্ষে সঙ্ঘের একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ইহা তাহার প্রাণ বা মূল শক্তি নহে। এইসব কার্য্যের প্রসারতা মুখ্য নয়, গৌণ। মহারাজ এইসব বিষয়ে বারম্বার সাধু ব্রহ্মচারীদিগকে সতর্ক করিয়া বলিতেন, "এই জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ। মনুষ্য জীবন যখন পেয়েছিস, তখন পৃথিবীর সব ভোগ সুখকে তুচ্ছ করে তাঁকে পাবার জন্য, সত্য উপলব্ধি করবার জন্য, দৃঢ় সংকল্প কর—প্রাণ যায় আর থাক। তা যদি না করবি তবে ঠাকুরের নাম করে, বাপ মাকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে এসেছিস কেন?" আবার কখন তিনি তাঁহাদিগকে

বলিতেন, "জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ। কর্ম্ম জীবনের উদ্দেশ্য নয়। তবে নিষ্কাম কর্ম্ম একটা উপায় মাত্র। সাধন করে এগিয়ে পড়। সাধন করতে করতে এগিয়ে গেলে শেষে জানতে পারবি যে ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। একটু জপতপ করে সামান্য কিছু উদ্দীপন হয়েছে বলে মনে করিস নে যে, যা হবার তা হয়ে গেছে। আরও এগিয়ে যেতে হবে। তবে তাঁকে লাভ করতে পারবি, তাঁর দর্শন পেয়ে ধন্য হয়ে যাবি—ক্রমে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ও আলাপ হবে।" এই অভয় বাণী তিনি প্রতিনিয়ত তাঁহাদিগকে শুনাইয়া সাধন ভজনের জন্য প্রেরণা দিতেন। এই তপঃশক্তি, ঈশ্বরানুভূতি ও তন্ময় ভাবের সাধনাই প্রকৃত সঙ্ঘের বিস্তার। ইহাই সকল জনহিতকর কার্য্যের মূল প্রাণ। ইহার অভাব হইলেই বিরাট সঙ্ঘ, বৃহৎ আশ্রম এবং প্রাসাদোপম মঠ-গৃহ জীর্ণ হইয়া ধ্বংসে পরিণত হয়। কর্ম্ম অনেক সময়ে কামনার প্রকাশমূর্ত্তি, মন প্রতারিত হইয়া কর্ম্মে আসক্ত হয়, এবং ভাবে ইহা বুঝি নিষ্কাম। এই সঙ্কট হইতে রক্ষা করিতে মহারাজ গুরু, আচার্য্য ও নেতারূপে পরমার্থ সত্যকে প্রত্যেকের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। মহারাজ বলিতেন, "ভগবান লাভ করতেই হবে, এই জীবনেই করতে হবে। যদি এই দেহে ভগবান লাভ না হল, যদি এই মন দ্বারা তাঁকে লাভ না করা যায় তবে কাজ কি এই শরীর দিয়ে? কি হবে এই মন দিয়ে? এ শরীর মন ধ্বংস হলেই বা আমার ক্ষতি কি? যে রকমেই হক আমায় ভগবান লাভ করতে হবে।" এই দৃঢ়তা ও এই ব্যাকুলতার ভাব তিনি সঙ্ঘের মধ্যে উদ্দীপিত করিয়া তুলিলেন। কখনও ভাবে তন্ময় হইয়া মহারাজ সাধু ব্রহ্মচারীদিগকে অগ্নিগর্ভ-

বাক্যে শুনাইতেন, "ঠাকুরের আশ্রয়ে যখন এসে পড়েছ, তখন তাঁর কৃপা নিশ্চয় পেয়েছ জানবে। তাঁর কৃপার সদ্ব্যবহার কর। কৃপাময়ের কৃপা পেয়ে যদি ধারণা করতে না পার, আনন্দ না পাও, জীবন মরণের রহস্য ভেদ করে তাঁর নিত্য সঙ্গী না হতে পার, তা হলে তোমার মত হতভাগ্য জগতে আর কে আছে? এ যুগের মানুষ তোমরা—যুগের হাওয়া গায়ে লেগেছে, তার সুযোগ নিতে ছেড় না। এত সোজা ও সহজভাবে রাস্তার খবর কোন যুগে কেও বলে নি—এ সুবিধা যদি হেলায় হারাও তবে অনেক কাল ভুগতে হবে।"

ঠাকুরের সেই সোজা ও সহজভাবের রাস্তার খবর তিনি শুধু কথায় দিয়া যান নাই—তাঁহার জীবনের প্রতি কার্য্যে, প্রতি পদে ও প্রতি নিঃশ্বাসে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। এই অধ্যাত্ম রত্নই তিনি বিলাইবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন—এই অধ্যাত্ম শক্তির বিস্তারেই তিনি সঙ্ঘের বিস্তার সাধন করিয়াছেন। দলে দলে তরুণ শিক্ষিত যুবকেরা যৌবনের প্রারম্ভে ভোগ সুখ গৃহ পিতামাতা এবং আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করিয়া তাঁহার পদতলে এই অধ্যাত্ম শক্তি লাভ করিতে আসিয়াছে—ইহাই সঙ্ঘের বিস্তার।

দেশের যুবশক্তি যখন রাষ্ট্রচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া পাশ্চাত্য আদর্শে রাজনৈতিক বিপ্লব আনিবার জন্য উন্মত্ত হইয়াছিল, যখন তাহারা জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতার আশায় ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া প্রতীচ্য বৈপ্লবিকদের আদর্শে কোন দুষ্কর ও দুষ্কৃত কার্য্য করিতে ইতস্ততঃ বা দ্বিধা করিত না, যখন তাহারা সকল প্রকার নির্য্যাতন ও বিরুদ্ধ শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া তাহাদের আদর্শকে

কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উগ্র ও অধীর হইয়াছিল, তখন সেই যুবশক্তির রাষ্ট্রচেতনাকে পরমার্থ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়া তাহাদের দেশাত্মবোধ ও দেশপ্রেমকে স্বামিজীর সুনির্দ্দিষ্ট পথে জাতির কল্যাণার্থে মঠ ও মিশনের গঠনমূলক কার্য্যে পরিচালিত করিয়াছিলেন। যখন রাজরোষে নিপতিত এই নির্য্যাতিত যুবকদিগকে কেহ সামান্য আশ্রয় দিতেও সাহসী হইত না, যখন আত্মীয়-স্বজন তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, যখন তাহাদের সহিত কোনরূপ ব্যবহার ও আলাপ পরিচয় করিতে লোকে ভীত ও সঙ্কুচিত হইত তখন তাহারা মহারাজের পদতলে বসিয়া কেহ কেহ মঠ ও মিশনের বিশাল ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়াছে। তিনি দেখিয়াই তাহাদের প্রকৃতি বুঝিতে পারিতেন। যাহারা প্রকৃত সরল, সদ্‌গুণবিশিষ্ট ও দৃঢ়চরিত্র, যাহারা সত্যবাক, সত্যনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধাপরায়ণ, যাহারা যথার্থ পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে বদ্ধপরিকর সেইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুবকদিগকে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের সততা ও সত্যনিষ্ঠার উপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখিয়াই মহারাজ নির্ভীক হৃদয়ে তাহাদিগকে সঙ্ঘে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে শাসক-সম্প্রদায়ের সন্দেহ-চক্ষু মঠ ও মিশনের প্রতি সাময়িকভাবে পতিত হইলেও তিনি বিচলিত হন নাই। কারণ ইহাতে কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিল না এবং এই মঠ ও মিশনের জনকল্যাণ কার্য্যে একদিন তাহাদের এই ভ্রান্ত সংশয় তিরোহিত হইবে—ইহা তাঁহার নিশ্চিত ধারণা ছিল। এই সকল যুবকেরা পারমার্থিক দৃষ্টিলাভ করিয়া সন্ন্যাস এবং ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণপূর্ব্বক মঠ ও মিশনের কার্য্যে

আত্মনিয়োগ করেন। ভারতের ঘরে ঘরে তখন মঠ ও মিশনের উপর অগাধ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল এবং তাহারা অনেকেই আধ্যাত্মিক জীবনলাভের জন্য মহারাজের কৃপা পাইয়া ধন্য হইয়াছেন।

মহারাজ বলিতেন, "অনেকে বলে দেশের ও দশের কাজ করবে। আমার মনে হয়, এভাব ইংরাজী-শিক্ষার বদহজম। নিজের চরিত্র তৈরী না হলে, তার দ্বারা অপরের কল্যাণ কখনও সম্ভব হয় না। যারা তাঁকে ঠিক ঠিক আশ্রয় করেছে, তাঁর কৃপালাভ করেছে, তাদের কখনও বেচাল হয় না। তাদের কাজকর্ম্ম, কথাবার্ত্তা, চালচলন দেশের ও দশের মঙ্গলের কারণ হয়।"

একবার কোন প্রকাণ্ড ব্যবসায়ী ধনী ব্যক্তি তাঁহার পত্নী বিয়োগের পর মঠে আসিয়া তাঁহার লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা মিশনের কার্য্যে দান করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সরল প্রার্থনা ও কাতর আবেদনে কোমল হৃদয় প্রেমানন্দ উহা গ্রহণ করিবার জন্য মহারাজের নিকট প্রস্তাব করেন। মহারাজ দূরদৃষ্টি সহায়ে বুঝিতে পারিলেন যে শোকোচ্ছ্বাসে তাঁহার সাময়িক বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে। তিনি অমনি জোড়হাত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "বাবুরাম দা, ঐ লোকটী সাধু সঙ্গ করে তার মনে বৈরাগ্যের উদয় হল, আর আমরা কিনা তার সঙ্গ করে আমাদের বিষয় বুদ্ধি হবে?" মহারাজের এই বৈরাগ্যপূর্ণ বাণী শুনিয়া পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ নীরব হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

যদি মহারাজ সঙ্ঘকে শুধু কর্ম্মের উপর স্থাপিত করিতে চাহিতেন তাহা হইলে সানন্দে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতেন। তিনি দেখিলেন ইহার মধ্যে মৃত্যুর বা ধ্বংসের বীজ নিহিত। ইহা সঙ্ঘকে দিন দিন

প্রাণহীন করিয়া ফেলিবে। তাই তিনি বলিবামাত্র উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন।

অন্য সময়ে কোন ভক্ত মঠের নামে চাউলের জন্য আবাদী জমী দান করিতে চাহিয়াছিল। মহারাজ উহা শুনিবামাত্র যুক্তকরে প্রেমানন্দকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা সিদ্ধসংকল্প পুরুষ, তোমরা যা মনে করবে তা ফলবে। ঐরূপ সংকল্প ছেড়ে দাও।" এইরূপ আধ্যাত্মিক দূরদর্শিতার সহায়ে তিনি মঠ ও মিশনের কার্য্যে সঙ্ঘকে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে মহারাজ বলিতেন যে, "তিনপুরুষ পরে কিরূপ দাঁড়াবে ভেবে তবে এসব কাজ করতে হয়।" তিনি সভাপতিরূপে ভারতের মঠ ও মিশনের নানা কেন্দ্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এই ভ্রমণে কোন কাজকর্ম্ম কিম্বা হিসাবনিকাশ বুঝিবার তাঁহার কোন সংস্রব ছিল না। বহু পূর্ব্ব হইতেই পূজ্যপাদ সারদানন্দ স্বামীর উপর সে সমুদায় ভার তিনি ন্যস্ত করিয়াছিলেন। যদি কেহ তাঁহার নিকট কোন কার্য্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিত তবে তিনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ বলিতেন, "শরৎ মহারাজের কাছে গিয়ে বল। তিনি যেমন বলবেন তেমন করবে।" প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে সারদানন্দ তাঁহার উপদেশ বা মত লইয়া কাজ করিতেন। তিনি প্রত্যেক কেন্দ্রে গিয়া দেখিতেন, কিরূপ আধ্যাত্মিক ভাবের স্ফূর্ত্তি হইতেছে এবং সঙ্ঘের আদর্শানুযায়ী সাধু ব্রহ্মচারীরা কিভাবে চলিতেছে। তিনি যখন যে কেন্দ্রে বা আশ্রমে যাইতেন তথায় সাধু ব্রহ্মচারী, ভক্ত এবং সাধনেচ্ছু ব্যক্তিগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া নিবিড় পারমার্থিক ভাবে আচ্ছন্ন হইতেন। তাঁহার পাদমূলে বসিয়া তাঁহারা যখন তাঁহার নিকট আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ

শুনিতেন তখন তাঁহাদের মনে ঈশ্বরলাভের জন্য সাধনার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত। এমনিই একটী অপূর্ব্ব ভাবের আবেষ্টন তাঁহার আগমনে এবং তাঁহার সামীপ্যে সমুজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইত। ইহা লক্ষ্য করিয়া পূজ্যপাদ তুরীয়ানন্দ বলিতেন, "মহারাজ যেখানে থাকেন, তার চতুষ্পার্শ্বে তিনি এমন একটী আবহাওয়া সৃষ্টি করে বসেন, তার মধ্যে যে কেহ যাবে তাকে সে ভাবেই ভাবিত হতে হবে।" যাঁহারা সাধক বা সাধন ভজনে নিরত থাকিত, তাহাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে তিনি বিশেষ সহায়তা করিতেন। যে যেমন অধিকারী, যাহার যেমন ভাব তাহা বুঝিয়া তিনি সাধনার ব্যবস্থা করিতেন।

লোক চিনিবার ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ ছিল। তিনি দৃষ্টি-মাত্রেই বুঝিতে পারিতেন, কে কি ভাবের লোক এবং কে কোন চরিত্রের মানুষ। নাক, মুখ, চোখ প্রভৃতির লক্ষণ দেখিয়া কোন কোন সময়ে কাহার কিরূপ প্রকৃতি তাহা অনায়াসে বলিয়া দিতেন। কাহারও হাত ওজন করিয়া তিনি বলিতেন, "তোমার হবে"। আবার কাহারও সম্বন্ধে নীরব থাকিতেন। একবার বেলুড় মঠে কোন ভদ্র যুবক মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাইয়া রাত্রিকালে মঠে অবস্থান করিবার জন্য পূজ্যপাদ প্রেমানন্দ স্বামীকে অনুরোধ করিল। তিনি বলিলেন, "মহারাজ আছেন—তিনি যদি বলেন তবে থাকতে পার।" এই বলিয়া তিনি তাহাকে মহারাজের নিকট আনিলেন। মহারাজ তখন মঠে গঙ্গার ধারে বৈকালে বেড়াইতেছিলেন। তিনি প্রেমানন্দ স্বামীর মুখে সব শুনিয়া যুবকটীকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া লইলেন। পরে তিনি তাহাকে বলিলেন, "না, এখানে তোমার রাত্রিতে থাকা চলবে না।" সে অনেক অনুনয় করিয়া

মহারাজকে বলায় তিনি বলিলেন, "না, বাপু, তুমি বড় অসংযত চরিত্রের লোক—তোমার গায়ের হাওয়া লাগলে ভাল লোকের অনিষ্ট হবে। মঠে যেখানে সাধু ব্রহ্মচারীরা থাকে সেখানে তোমার থাকা চলতে পারে না।" লোকটী মাথা নত করিয়া চলিয়া গেল।

গিরিশবাবু মহারাজের আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রসঙ্গে বলিতেন, "রাখাল-টাখাল আমার কাছে ছেলেমানুষ। কালকের ছোকরা। ঠাকুরের কাছে আমি যখন যেতাম, তখন আর ওদের বয়স কত? এই রাখালকে আমি ঠাকুরের মানস পুত্র বলে জানি। তা কি শুধু শুধুই মানি? যখন আমার প্রথম হাঁপানী আরম্ভ হল, তখন খুব জ্বর, খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়লুম। এখানে তো শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ হচ্ছে। এদিকে আমার মনে এক সর্ব্বনেশে ভাবের উদয় হল—ঠাকুর একজন মানুষ, একজন সাধুপুরুষ ছিলেন। তখনি মনে হল—গুরুতে মানুষ জ্ঞান, মানুষ-বুদ্ধি আমি বেটা তো গেছি। মনে দারুণ অশান্তি, কিছুতেই ঠাকুরের উপর ভগবদ্-বুদ্ধি এল না। অনেককে বললাম, যেসব ত্যাগী গুরু-ভাইরা আমাকে দেখতে আসত—সবাইকে বলতাম। কিন্তু সবাই শুনে চুপ করে থাকত। আমার. মনে দিন দিন দারুণ অশান্তি বৃদ্ধি পেতে লাগল। মনের সঙ্গে সর্ব্বদা লড়াই করছি, তবু ঠাকুরের উপর মানুষ-বুদ্ধি যায় না। এই সময় হঠাৎ একদিন রাখাল দেখতে এল্ল। সামনে বসে জিজ্ঞেস করলে, 'কেমন আছেন, মশায়?' নানা কথার পর আমি তাকে কাতরভাবে বললেম, 'ভাই! আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। এত গীতাপাঠ, চণ্ডীপাঠ শুনছি,—ভগবানকে দিনরাত ডাকচি অথচ ঠাকুরের উপর মানুষ বুদ্ধি হল। কিছুতেই এটা

যাচ্ছে না—আমার নরক যন্ত্রণা উপস্থিত হয়েছে। এ কি হল? উপায় কি?' রাখাল আমার কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল। হেসে বললে, 'ও আর কি? ঢেউ যেমন হুস করে উঁচু হয় আবার তখনি নীচু হয়ে নেমে যায়, মনটাও তেমনি। ভাববেন না, শীঘ্রই আধ্যাত্মিক অনুভূতির একটা উচ্চস্তরে আপনাকে নিয়ে যাবে তাই মন এমনি হচ্চে। কিছু চিন্তা করবেন না।' রাখালের কথা শেষ হতে না হতে ন'দিদি তাঁকে খাবার এনে দিলে। রাখাল খেয়ে উঠে গেল। যাবার সময় হেসে বল্লে, 'ব্যস্ত হবেন না, কোন ভয় নেই, মন আবার তড়াক করে লাফ দিয়ে কোথায় চলে যাবে।' এই বলে যেই আমার বাড়ীর সামনের গলি পার হয়ে অন্য গলিতে মোড় ফিরলে, অমনি আমার কাঁধের উপর থেকে ভূতটা যেন চলে গেল—ঠাকুরের উপর আবার অমনি সেই ভগবদ্‌বুদ্ধি এল। সাধ করে কি ওকে মানি? রাখাল পেছন ফিরলে অনেক সময় ঠাকুর বলে আমারই ভুল হয়। ঠিক সেই রকম হাব ভাব কথাবার্ত্তা কতক কতক পেয়েছে।"

এইরূপ দিব্য পরমহংসের ন্যায় বিরাজ করিয়াই তিনি সঙ্ঘের বিস্তার করিয়াছিলেন। মঠের সমুদায় সাধুব্রহ্মচারিগণ তাঁহার এই দিব্যভাবের স্পর্শ পাইয়াই অলৌকিক আধ্যাত্মিক রসের আস্বাদ করিতেন এবং তাঁহাদের স্ব স্ব জীবনের সাধনায় তাহা অনুরঞ্জিত করিতে লাগিলেন। লোকের দুঃখ দুর্দ্দশা মোচন, দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, অগ্নিদাহে এবং অন্যান্য জাগতিক কল্যাণ কার্য্য তাঁহাদের সেই আধ্যাত্মিক ভাবরসে পুষ্ট চিত্ত হইতে স্বতঃই উত্থিত হইত এবং মহারাজের অনুমতি লইয়া তাঁহারা সমবেতভাবে তাঁহাদের পরিকল্পনানুযায়ী তাহা করিতেন। মহারাজ পরমানন্দে তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিয়া আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের

প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে বলিতেন। তিনি তৎকালে সস্নেহে তাহাদের স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ দিতেন এবং যাহাতে কোনরকম অনিয়ম, অনাচার, কদাচার বা অত্যাচার না হয় তজ্জন্য বারংবার সতর্ক করিতেন। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, বাজার হইতে দুগ্ধ, দধি, খাবার কিনিয়া না খাওয়া, পানীয় জল ফুটাইয়া পান করা প্রভৃতি সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মগুলিও আবশ্যক মত বিশেষভাবে বলিয়া দিতেন। মহারাজের এই স্নেহ ও প্রীতিপূর্ণ উপদেশ তাঁহাদের রক্ষা-কবচের মত কাজ করিত।

মহারাজের অসীম প্রেম ও বিরাট হৃদয়ের স্পর্শ পাইয়াই দলে দলে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বংশের যুবকেরা সমস্ত জাগতিক ভোগসুখ ও প্রবৃত্তিমুখী বাসনা ত্যাগপূর্ব্বক জ্বলন্ত বৈরাগ্যকে অবলম্বন করিয়া-ছিলেন। তাঁহারা তাঁহারই উপদেশে ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মঠ ও মিশনের পতাকাতলে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন দেশে আর্ত্ত, রুগ্ন, দরিদ্র, অনাহারী বা অর্দ্ধাহারী খুঁজিয়া জাতিনির্ব্বিশেষে তাহাদের সেবা করিয়াছেন। যেখানে দুর্ভিক্ষের করালমূর্ত্তি, যেখানে মহামারী মৃত্যুর বিভীষিকা, যেখানে জলপ্লাবন, অগ্নিদাহ, গৃহদাহ এবং ভূমিকম্পে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা তাঁহারা শরীরের দিকে দৃকপাত না করিয়া এমন কি মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া প্রাণপণে ক্লিষ্ট নরনারীদিগের সেবা, যত্ন ও সহায়তা করিয়াছেন। মহারাজের প্রাণঢালা ভালবাসার ইঙ্গিতে এই সব কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। তাঁহারই প্রীতি বা তুষ্টির জন্যই যেন সর্ব্বত্যাগী যুবক সাধুর দল কোন ক্লেশকেই ক্লেশ বোধ করিত না, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও বিশ্রাম সময়ে সময়ে ভুলিয়া যাইত এবং তাঁহারই প্রেমমাখা বাণীতে ঠাকুর

ও স্বামিজীর আদর্শে ও নামে তাঁহাদের প্রতিধমনীতে তড়িত-প্রবাহ সঞ্চারিত হইত। তাঁহারা বুঝিতেন না বা বুঝিতে চেষ্টা করিতেন না যে, তাঁহারা কোন মহৎ কার্য্য করিতেছেন। এই সকল কার্য্যের প্রেরণার মূল ছিল আনন্দময় মহারাজের ভালবাসা ও তাঁহার প্রীতিসাধন। মহারাজের কোন আদেশ পালন করিতে পারিলেই তাঁহারা আপনাদিগকে ভাগ্যবান ও কৃতার্থ বোধ করিতেন।

তিনি সকল প্রকার কাজকর্ম্ম ও জাগতিক ব্যাপারের ঊর্দ্ধে অতীন্দ্রিয় উচ্চ ভাবভূমিতে নিয়ত অবস্থান করিয়াও সঙ্ঘকে দৃঢ় ও শক্তি সম্পন্ন করিলেন এবং আধ্যাত্মিক ভাবস্ফুরণে তাহার বিস্তার সাধন করিয়াছেন। মঠ ও মিশনের যাবতীয় সদনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান এবং জনহিতকর প্রেরণার মূলে থাকিয়াও তিনি ছিলেন অনাসক্ত, একক, নির্দ্বন্দ্ব এবং সমাহিত। বালকবৎ কোমল, সরল ও আনন্দময় হইয়াও তিনি ছিলেন প্রশান্ত, অচঞ্চল এবং গম্ভীর। এই অপূর্ব্ব দিব্যভাবেই আধ্যাত্মিক তরঙ্গের প্রবাহে তিনি নীরবে সঙ্ঘের সম্প্রসারণ করিয়াছিলেন। দিব্য কর্ম্মময় জীবনের তিনি ছিলেন জীবন্ত আদর্শ। এই দিব্য কর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন ঃ—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জন॥

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! যে আমার এইরূপ অলৌকিকজন্ম এবং কর্ম্ম যথার্থরূপে জানে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, সে আমাকে লাভ করে।"



স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

(দণ্ডায়মান) স্বামী অম্বিকানন্দ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ

রামকৃষ্ণানন্দের একান্ত অনুরোধে ও আগ্রহে মহারাজ ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ২৭শে অক্টোবর তারিখে পুরী হইতে মান্দ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহারাজ এই সময়ে সর্ব্বদা উচ্চ ভাবভূমিতে বিচরণ করিতেন। অহর্নিশ তন্ময়, প্রশান্তমূর্ত্তি এবং বদনমণ্ডল আনন্দে পরিপূর্ণ। মহারাজ মান্দ্রাজে পৌছিলে রামকৃষ্ণানন্দ মান্দ্রাজী ভক্ত-মণ্ডলীর সহিত ষ্টেশনে গিয়া তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া বিপুল আনন্দে তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। রামকৃষ্ণানন্দ অনেক মান্দ্রাজী ভক্তদিগকে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরক্ত তথাকার স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্র ব্যক্তিগণকে বলিতেন, "তোমরা ত শ্রীগুরু মহারাজকে দর্শন কর নাই, মহারাজকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হও।" মহারাজকে দলে দলে তাঁহারা সকলে দর্শন করিতে আসিত। তাঁহার ভাবতন্ময় দিব্য আকৃতি ও মধুর উপদেশ শুনিয়া তাহারা পরম তৃপ্তি ও শান্তিলাভ করিত। দেবমাতা নাম্নী জনৈক শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত মার্কিণ মহিলা সেই সময়ে মান্দ্রাজে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার Days In An Indian Monastery (ভারতীয় মঠে দিবসগুলি) নামক গ্রন্থে মহারাজ সম্বন্ধে যাহা তিনি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নিম্নে তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত হইল।

"One evening while he was at Madras he went

into Samadhi (the Super-Conscious state) during Arati. He sat on the rug at the end of the hall, his body motion less, his eyes closed, a smile of ecstacy playing about his lips" অর্থাৎ যখন তিনি (মহারাজ) মান্দ্রাজে ছিলেন তখন একদিন সন্ধ্যারতির সময় আরতি দেখিতে দেখিতে সমাধিমগ্ন হইলেন। হলঘরের এক প্রান্তে কম্বলের উপরে তিনি বসিয়াছিলেন, তাঁহার শরীর স্থির, নয়নযুগল মুদিত এবং তাঁহার অধরে আনন্দময় হাসি ক্রীড়া করিতেছিল।

বড়দিনের সময় শ্রীমহারাজ দেবমাতাকে তাঁহার বাসগৃহে পাশ্চাত্য প্রথায় খৃষ্ট-সম্প্রদায়ের রীতি অনুসারে যীশুখৃষ্টের জন্মোৎসব পালন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। দেবমাতা তাঁহার আজ্ঞানুযায়ী সাধ্যমত উৎসবের সমুদয় আয়োজন করিলেন। ঠিক অপরাহ্ণ বেলা চারটার সময় রামকৃষ্ণানন্দ ও কতিপয় নিষ্ঠাবান মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ-ভক্তদের সঙ্গে মহারাজ তাঁহার গৃহে উপনীত হইলেন। উৎসবস্থলে উপস্থিত হইয়া বাইবেল গ্রন্থ হইতে যীশুখৃষ্টের জন্মকথা সমবেত সকলকে পড়িয়া শুনাইতে তিনি দেবমাতাকে আদেশ করিলেন। দেবমাতা তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, "When I had finished reading the intense stillness in the air led me to look towards Swami Brahmananda. His eyes were open and fixed on the altar, there was a smile on his lips, but it was evident that his consciousness had gone to a higher plane. No one moved or spoke. At the end of twenty minutes or more the

look of immediate seeing returned to his eyes and he motioned to us to continue the service. অর্থাৎ যখন আমার পাঠ সমাপ্ত হইল তখন নিবিড় নিস্তব্ধতার ভাব দেখিয়া আমার দৃষ্টি পতিত হইল স্বামী ব্রহ্মানন্দের দিকে। তাঁহার উন্মীলিত নয়নদ্বয় স্থিরভাবে বেদীর উপর নিবদ্ধ, তাঁহার অধরে হাসি এবং তাঁহার মন কোন ভাবভূমিতে বিচরণ করিতেছে ইহা স্বতঃই প্রতীয়মান হইল। সকলেই নিশ্চল ও নির্বাকভাবে বসিয়াছিল। কুড়ি মিনিট কিম্বা তাহার অধিককাল পরে তাঁহার চক্ষুদ্বয়ে বাহ্যদৃষ্টি ফিরিয়া আসিল এবং আমাদিগকে অনুষ্ঠান চালাইতে ইঙ্গিত করিলেন।

সেদিনকার উৎসবানুষ্ঠান সমাপ্তি এবং প্রসাদাদি বিতরণের পর একে একে ভক্ত দর্শকেরা চলিয়া যাইলে মহারাজ প্রসাদ ধারণ করিতে বসিলেন। দেবমাতা লিখিতেছেন, "As he was eating he remarked to me, "I have been very much blessed in coming to your house today, sister." I answered quickly, "Swamiji, it is I who have been blessed in having you to come." "You do not understand" he replied, "I have had a great blessing here this afternoon. As you are reading the Bible, Christ suddenly stood before the altar dressed in a long blue cloak. He talked to me for some time. It was a very blessed moment." "অর্থাৎ তিনি আহার করিতে করিতে বলিলেন, সিষ্টার, তোমার গৃহে আসিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। আমি অমনি বলিয়া উঠিলাম, 'সে কি স্বামীজি, আপনার

আগমনে আমিই ধন্যবোধ করিতেছি।' উত্তরে তিনি বলিলেন, 'তুমি আমার কথা বুঝিলে না। যখন তুমি বাইবেল পাঠ করিতেছিলে, তখন সহসা নীলবর্ণের লম্বা আলখাল্লা পরিয়া যীশুখৃষ্ট বেদীর উপরে দণ্ডায়মান হইলেন।, তিনি কিছুক্ষণ আমার সহিত কথাবার্ত্তা বলিলেন। সে মুহূর্ত্তগুলি পবিত্রময়'।"

দেবমাতা তাঁহার উক্ত গ্রন্থে মহারাজ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিয়াছেন।

মান্দ্রাজ মঠে অবস্থানকাল মহারাজের একদিন কিছু ফল খাইবার ইচ্ছা হইল। তখন উক্ত মঠের ভাণ্ডারে কোন ফল নাই দেখিয়া রামকৃষ্ণানন্দ চিন্তিত ও ব্যস্ত হইলেন। এই রকম সময়ে একজন মান্দ্রাজী ভক্ত আপেল আঙ্গুর ও কলা প্রভৃতি নানাবিধ ফল ঠাকুরকে নিবেদন করিতে আনিয়াছিল। রামকৃষ্ণানন্দ তাহাকে দেখিতে পাইয়া উক্ত ফলাদির অর্দ্ধাংশ ঠাকুরের নিকট পাঠাইয়া বাকি অর্দ্ধাংশ মহারাজকে দিতে বলিলেন। তিনি ভক্তটীকে ইংরাজীতে বলিলেন, "To offer these fruits to the Maharaj is as good as offering them to Sri Ramakrishna অর্থাৎ মহারাজকে এই ফল দেওয়াতে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিবেদন করার সমান।" ভক্তটীর মনে যদি কিছু ইতস্ততঃ বা সংশয় থাকে তাহা দূর করিবার জন্য তিনি স্পষ্টভাবে তাঁহাকে বলিলেন যে, "ঠাকুর মহারাজের মুখে খান।" তাঁহার এই কথা কোন স্তোকবাক্য নয়, সত্য সত্যই রামকৃষ্ণানন্দ ইহা দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করিতেন। অহরহ সেইভাবেই ঠাকুরের প্রকৃত মানসপুত্র জ্ঞানেই মহারাজের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ্যভাবে

প্রকাশ করিতে তিনি কখন বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সংকোচ করেন নাই। তাই তিনি অনেক সময়ে তাঁহার ব্যবহারে পিতা-পুত্রের কোন পার্থক্য রাখিতেন না। এই নিমিত্ত মহারাজের প্রতি ঠাকুরের মত সম্মান দেখাইতে তিনি সকলকে উৎসাহিত করিতেন।

একদিন কোন মান্দ্রাজী ভক্ত মহারাজের নিকট ফুল পাঠাইয়াছিল। নূতন সেবক উক্ত ফুলগুলি মহারাজের ঘরে সাজাইয়া দিতেছিল। মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু ফুল ঠাকুরকে দিয়েছিস ত?" উত্তরে সেবক বলিল "না"। মহারাজ অমনি তাহাকে বলিলেন, "যা, এখুনিই অর্দ্ধেক ফুল ঠাকুরকে দিয়ে আয়।" সেবকটী ইতস্ততঃ করিতেছিল—তাহার মনের ভাব এই যে এখানে প্রত্যক্ষ ভগবান বিদ্যমান ওখানে মাত্র ছবি। তৎক্ষণাৎ মহারাজ তাহার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুই কি মনে করেছিস ঠাকুর কেবল ছবি? জানিস ঐখানে ঠাকুর প্রত্যক্ষ রয়েছেন।" পরে মহারাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি কখন বাহ্যিক পূজা করেছিস্?" সেবক বলিল, "না, ওতে আমার তেমন বিশ্বাস নেই।" মহারাজ গম্ভীরভাবে তাহাকে বলিলেন, "আমি বলছি ঠাকুর ঐ ছবিতে প্রত্যক্ষ রয়েছেন, কেমন পূজো করবি?" সেবক তদুত্তরে বলিল, "আপনি যখন বলছেন করব।" অনন্তর কিছুদিন অতীত হইলে আদেশ পালনের ফলে সেবকের হৃদয়ে মহারাজের কথার সত্যতা উপলব্ধি হইল।

মান্দ্রাজ হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর দর্শনে গমন করেন। তথায় প্রায় এক সপ্তাহকাল রামনাদের রাজাসাহেবের বাংলাতে তিনি অবস্থান করেন। যখনই তিনি তথায় কোন দেবদেবীর মূর্ত্তি দর্শন

করিতে যাইতেন তখনই তাহার মন একেবারে ভাবসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া পড়িত। কখন কখন তাঁহার ভাবসমাধি হইত। শ্রীরামেশ্বর দর্শন করিয়া তিনি পরম আনন্দরসে বিহ্বল হইলেন। তথা হইতে মহারাজ সদলবলে মাদুরায় শ্রীমীনাক্ষি দেবীর সুবৃহৎ মন্দির দেখিতে গমন করিলেন। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তিনি দেবীকে দর্শন করিতে গেলেন। বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিতে দেখিতে কোন্ এক অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে গিয়া তিনি "মা" "মা" বলিতে বলিতে বাহ্য সংজ্ঞা হারাইয়া গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন। রামকৃষ্ণানন্দ অবিলম্বে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল পাছে মহারাজ ভাবে পড়িয়া যান। উপস্থিত সাধু ব্রহ্মচারী ও ভক্তমণ্ডলী এবং মন্দিরের অনেক লোকে তাঁহার এই অপূর্ব্ব দিব্যভাব দেখিয়া অনিমেষ লোচনে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রায় একঘণ্টা পরে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। পরে তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন মন্দিরে দাঁড়াইয়া তিনি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর মূর্ত্তির দর্শন পাইয়াছিলেন। মাদুরা হইতে মান্দ্রাজে মহারাজ পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন।

দর্শনার্থী লোক বা ভক্তাদির সহিত মহারাজ কখন কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, কখন কাহারও কাহারও সহিত রঙ্গরসিকতা হাসিতামাসা করিতেছেন, কখন নানা বিষয়ের উপদেশ দিতেছেন কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইত যে বক্তা যন্ত্রবৎ বলিয়া যাইতেছেন মাত্র কিন্তু তাঁহার মন ঐসব প্রসঙ্গে নাই—কোন ভাবরাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। প্রায় কথা বলিতে বলিতে তিনি অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেন। বাহিরে দেখিলে সহজে বুঝা যাইত না তিনি কি অমৃতের আস্বাদে বিভোর হইয়া আছেন।

মান্দ্রাজের বিশিষ্ট ভক্তদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ, কয়েকজন মাত্র শূদ্রজাতীয় ছিলেন। মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণেরা সদাচারের বিশেষ পক্ষপাতী এবং শূদ্রদের সহিত সামাজিক আচার ব্যবহারে তাহারা বিশেষ কোন সম্পর্ক রাখিত না। শূদ্রজাতির প্রতি তাহারা বিদ্বেষভাবই সচরাচর পোষণ করিয়া থাকে। একদিন একজন বিশিষ্ট শূদ্রজাতীয় ভক্ত মহারাজ ও মঠের সকল সাধু ব্রহ্মচারীদিগকে তাহার গৃহে ভিক্ষা লইবার জন্য আমন্ত্রণ করে। ইতিপূর্ব্বে রামকৃষ্ণানন্দও কোন শূদ্র-গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। মহারাজ কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া তাহার আমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন। ভক্ত যে জাতি বা শ্রেণীর হউক,—সে যে ঠাকুরের প্রতি ভক্তিমান এবং তাহার আন্তরিক আগ্রহ জানিয়া তিনি সম্মতি দিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন ভক্তের জাতি নাই। এই ভাবেই প্রণোদিত হইয়া তিনি তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। বিশেষভাবে মহারাজ ছিলেন আত্মারাম, সামাজিক রীতি নীতি আচার অনাচারের বহু উর্দ্ধে অবস্থান করিতেন—তাঁহার নিকট জাতিবর্ণ হিন্দু মুসলমান বা খৃষ্টান এই সব ভেদদৃষ্টি কিছু ছিল না। সমস্ত জীবজগতকে তিনি এক অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপ দেখিতেন। মহারাজের সম্মতি থাকায় রামকৃষ্ণানন্দেরও কোন আপত্তি থাকিল না। ভক্তটী একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। মহারাজ ও মঠের সাধু ব্রহ্মচারীরা তাহার গৃহে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি মান্দ্রাজ সহরের অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত আবার কেহ কেহ খৃষ্টান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিল। সকলেই এক পংক্তিতে আহার করিতে বসিলেন

এবং ভক্তটীর কন্যা ও অন্যান্য মহিলারাও পরিবেশন করিতে লাগিলেন। আহার শেষ হইলে যেমনি মহারাজ আসন ত্যাগ করিলেন অমনি রামকৃষ্ণানন্দ তাঁহার পরিত্যক্ত পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ অন্ন প্রসাদ গ্রহণ করিয়া মস্তক ও হৃদয়ে স্পর্শপূর্ব্বক জিহ্বাগ্রে দিয়াছিলেন। সাধু ব্রহ্মচারীরাও তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। সকলের সঙ্গে প্রীতিপূর্ব্বক ব্যবহার করিয়া ভক্তগৃহ হইতে মহারাজ সদলবলে মঠে প্রত্যাগত হইলেন। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ভক্তদের লইয়া কিরূপ উদার দৃষ্টিতে আচার ব্যবহারের প্রয়োজন এবং বাস্তবক্ষেত্রে কেমন ভাবে তাহাদিগকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিতে হয় ইহারও উজ্জ্বল আদর্শ মহারাজ সকলের নয়নসমক্ষে উপস্থিত করিলেন।

তিনি যখন যেখানে যাইতেন তাঁহার সহিত গঙ্গাজল, জগন্নাথের মহাপ্রসাদ (নির্ম্মাল্য) থাকিত। তিনি প্রত্যহ তাহা গ্রহণ করিতেন। তিনি বলিতেন গঙ্গাবারি, ব্রহ্মবারি অভীষ্টদায়িনী ইষ্টদর্শনের সহায়ক। তিনি মঠে আসিয়া ঠাকুরের নাম করিতে করিতে উহা গ্রহণ ও স্পর্শ করিলেন এবং মঠের সাধু ব্রহ্মচারীদিগকেও উহা গ্রহণ করিতে বলিলেন।

মাদুরা হইতে মাদ্রাজে ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বাঙ্গালোরে নূতন জমির উপরে আশ্রম নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হওয়ায় উহা মহারাজদ্বারা প্রতিষ্ঠা করা হইবে ইহা পূর্ব্বেই স্থির ছিল। তজ্জন্য মহারাজ বাঙ্গালোরে যাত্রা করিলেন। তথায় রেলষ্টেশনে তাঁহার সাদর সম্বর্দ্ধনা হইয়াছিল। আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিন মহারাজের সভাপতিত্বে একটী বৃহতী সভার অধিবেশন হয়। সভায় তিনি ইংরাজীতে দুই চারিটী সময়োপযোগী সারগর্ভ কথা বলিয়া

আশ্রমের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। বাঙ্গালোরে তাঁহাকে দর্শন করিয়া সকলে মুগ্ধ হইল এবং তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া ও উপদেশ শুনিয়া কৃতার্থ বোধ করিল। বাঙ্গালোর হইতে মান্দ্রাজে ফিরিয়া তিনি শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী দর্শন করিলেন।

এই দক্ষিণদেশে রামনাম সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া মহারাজ মুগ্ধ হন। বাংলাদেশেও যাহাতে ইহা প্রবর্ত্তিত হয় তিনি তদ্বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। এক সময়ে স্বামিজী বাংলার ঘরে ঘরে ত্যাগ ভক্তি ও জ্ঞানের আদর্শ মূর্ত্তি শ্রীশ্রীমহাবীরের পূজা প্রচলিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এই সূত্রে রামনাম সঙ্কীর্ত্তনের সহিত শ্রীমহাবীরের পূজা প্রচলন করিবার ইচ্ছা মহারাজের মনে উদিত হইল। তিনি উহা সংগ্রহ করিয়া অম্বিকানন্দকে সুরসংযোগ করিতে বলিলেন।

প্রকৃত সুর তান লয়ে ইহাকে সংযুক্ত করাইয়া এবং ইহাতে স্তব, প্রার্থনা প্রভৃতি সঙ্কলিত ও সন্নিবেশিত করিয়া সর্ব্বপ্রথমে ৺পুরীধামে সাধুব্রহ্মচারীদিগের দ্বারা গীত হইল। যাহারা তাহা শুনিয়াছিলেন তাঁহারা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রহিলেন। পরে বেলুড়মঠে সাধুদের কণ্ঠে এই রামনাম সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া সহস্র সহস্র নরনারী ইহা শিখিবার জন্য ব্যাকুল হইল। ইহা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইতে লাগিল। সেই পুস্তিকার ভূমিকায় মহারাজ লিখিয়াছিলেন, "পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজীর বড় সাধ ছিল, বঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য-মূর্ত্তি শ্রীশ্রীমহাবীরের উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়। সেইজন্য আমরা মঠে এই নামসঙ্কীর্ত্তনের পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমহাবীরের আরাধনার নিয়ম করিয়াছি। অনুরোধ, অপর সকলেও ইহার অনুবর্ত্তন করেন। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্ব্বক ভগবৎ-প্রীতির

অধিকারী হইয়া জন্মভূমি ধন্য ও পবিত্র করুন, ইহাই হৃদয়ের অকপট প্রার্থনা।" আজ শুধু বাংলাদেশে নয় ভারতের সর্ব্বত্র এই সঙ্কীর্ত্তন এবং তৎসঙ্গে শ্রীশ্রীমহাবীরের পূজা প্রচলিত হইয়াছে। ভারতের নরনারী ইহা শ্রবণ করিয়া ভক্তিরসে আর্দ্র হইতেছে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রামকৃষ্ণানন্দের দারুণ পীড়ার সংবাদ শুনিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য অবিলম্বে আসিতে লিখিলেন। তাঁহার রওনা হইবার তার পাইয়া পুরী হইতে খুরদা ষ্টেসনে আসিয়া তিনি মান্দ্রাজ মেলে তাঁহার সাক্ষাতের জন্য প্রতীক্ষা করিলেন। গাড়ী আসিলে তিনি তাঁহার কামরায় উঠিলে রামকৃষ্ণানন্দ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, "শশী, এ সব কি? সব ঝেড়ে ফেলে দাও।" পূজ্যপাদ রামকৃষ্ণানন্দ বলিলেন, "রাজা, তুমি আশীর্ব্বাদ করলেই হবে।" মহারাজ পুনরায় উহা বলিলে তিনি আবার সেইরূপ উত্তর করিলেন। যথাবিধি চিকিৎসার উপদেশ দিয়া গাড়ী ছাড়িবার সময় মহারাজ প্লাটফর্ম্মে নামিয়া আসিলে রামকৃষ্ণানন্দ ভূমিষ্ঠভাবে প্রণত হইলেন। এই উভয়ের শেষ সাক্ষাৎ।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসের শেষভাগে মহারাজ দ্বিতীয় বার মান্দ্রাজে আগমন করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজ মঠে তিনি রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীর কথা অনেক সময় উল্লেখ করিতেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মহাসমাধির সংবাদে তিনি বিষাদগম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন যে, "একটী দিকপাল চলে গেল। দক্ষিণ দিকটা যেন অন্ধকার হয়ে গেল।" মান্দ্রাজ মঠে মহারাজ তাঁহার প্রসঙ্গে বলিতেন, "শশী মহারাজের প্রভাব দিগ্বিজয়ী শঙ্করের মত এদেশে জ্বলজ্বল করচে। তার

হাতের তৈয়ারী রামু আর রামানুজ, ঠাকুরের উপর তাদের কি গভীর ভক্তি! এই মঠ আর Students' Homeএর জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম আর চেষ্টা তারা করছে। আমাদের উপর তাদের কত গভীর ভক্তি আর শ্রদ্ধা। মঠের প্রতি তাদের কত যত্ন আর প্রীতি!" পূর্ব্ব মঠ-গৃহ নানাভাবে বিনষ্ট হওয়ায় তখন একটী ভাড়াটীয়া বাড়ীতে মঠ অবস্থিত ছিল। মঠের সম্মুখে অদূরে—উচ্চ গোপুরম্-সমন্বিত কপালেশ্বর মহাদেবের মন্দির। মহারাজ তথায় মাঝে মাঝে যাইতেন। ত্রিপ্লিকেন পল্লীস্থিত শ্রীপার্থসারথির মন্দির দর্শন করিতে গিয়া তন্মধ্যে সুবৃহৎ বিগ্রহমূর্ত্তির সম্মুখে একদিন তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন।

মহারাজের মান্দ্রাজে আসিবার পূর্ব্বে স্থায়ী মঠ-গৃহ নির্ম্মাণের জন্য একখণ্ড জমি ক্রয় করা হইয়াছিল। মঠগৃহের নক্সা ইতিপূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়া রাখা হয়। মহারাজ উহা দেখিয়া তথাকার অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্যে মঠনির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শুভদিনে—শুভতিথিতে ৪ঠা আগষ্ট তারিখে উক্ত জমিতে যথাবিধি পূজার্চ্চনা করাইয়া তিনি মঠগৃহের ভিত্তিস্থাপনা করিলেন। ইহার প্রায় এক সপ্তাহ পরে তিনি সদলবলে বাঙ্গালোরে রওনা হইলেন।

ষ্টেসনে গাড়ী থামিলে বাঙ্গালোরের সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট উচ্চপদস্থ ভদ্র ব্যক্তিরা ও ভক্তমণ্ডলী মহারাজকে পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করিয়া সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সুপ্রশস্ত ও সুবৃহৎ জমির উপর বাঙ্গালোর মঠ দেখিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তথায় অবস্থান করিয়া মহারাজ সাধুভক্তদিগকে নানা উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক আধ্যাত্মিক সাধনায় সহায়তা করিতেন। কখন কখন মধ্যরাত্রে বা শেষরাত্রে

উঠিয়া লণ্ঠনধৃত সেবকের সঙ্গে সাধু ভক্তদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিতেন কে কি করিতেছে। যাঁহাদিগকে নিদ্রিত দেখিতেন পরদিন প্রাতে তাঁহারা যখন তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইতেন তখন তিনি বলিতেন, "রাত্রিকালে সাধনের প্রশস্ত সময় আর তোরা ঘুমিয়ে তা কাটিয়ে দিচ্ছিস। এই জোয়ান বয়সে তোদের এত ঘুম? এখন যদি ভগবান লাভ করবার জন্য না খাটবি—তবে কবে আর তোদের সময় হবে? দিনের বেলা ত কাজ-কর্ম্মে গল্প-সল্পে সময় কেটে যায়। তাঁকে ডাকবি কখন?" মহারাজের ঈদৃশ কথায় তাঁহাদের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিত এবং অনেকে রাত্রিকালে সাধনভজনে নিরত হইলেন। এইভাবে নানারূপে মহারাজ তাঁহাদের মনে সাধনার ইচ্ছা উদ্রেক করিয়া দিতেন।

বাঙ্গালোরে মুচি সম্প্রদায় ও অন্যান্য অস্পৃশ্য জাতি প্রতি রবিবারে আসিয়া মঠের বড় হলঘরে সমবেতভাবে প্রার্থনা ও উপাসনা করিত এবং পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে রামনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া মহারাজের পাদবন্দনা করিত। মহারাজ তাহাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন। তাহাদের প্রতি তাঁহার উদার এবং সস্নেহ ব্যবহার দেখিয়া অনেক ব্রাহ্মণ ভক্তদের অন্তর হইতে তাহাদের বিরুদ্ধে জাতিগত ঘৃণা, অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ দূর হইয়াছিল। তাহারাও উদারদৃষ্টিতে তাহাদের দেখিতে শিখিল। ইহার ফলে পরস্পরের মধ্যে স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের ভেদ-ভাব অনেকটা চলিয়া গিয়াছিল। ঠাকুরের প্রতি মুচীদের সরল ভক্তিনিষ্ঠা দেখিয়া একদিন মহারাজ স্বয়ং তাহাদের পল্লীতে অকস্মাৎ গিয়া তাহাদের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। তাহাদের অনুরাগের সঙ্গে ঠাকুরসেবা দেখিয়া তিনি

সাধনভজনে উৎসাহ দান ও প্রাণ খুলিয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। "মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে" এই বাক্যটী সেদিন প্রত্যক্ষীভূত হইল।

শ্রীরামানুজ-প্রবর্ত্তিত শ্রীসম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থ দর্শন করিতে তিনি মেলকোট গমন করিয়াছিলেন এবং শিবসমুদ্র নামক স্থানে কাবেরী নদীর জলপ্রপাতের সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া তথায় অবস্থিতি করেন। এইখানে মহীশূর রাজ্যের প্রসিদ্ধ বিদ্যুতের কারখানা। ইহার সন্নিকটে রামানুজ সম্প্রদায়ের একটী বিষ্ণুমন্দির দর্শন করিতে যান। উক্ত মন্দিরে একটী প্রাচীন সাধু বাস করিতেন। তিনি কখনও কাহাকে দেখিয়া তাঁহার আসন ত্যাগ করিয়া উঠিতেন না। মহারাজকে দেখিয়াই সাধুটী আসন ছাড়িয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। দর্শকেরা ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। মহীশূরে চামুণ্ডাদেবী দর্শন করিয়া মহারাজ পুনরায় বাঙ্গালোর মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

বাঙ্গালোর হইতে কন্যাকুমারী দর্শনে মহারাজ সদলবলে যাত্রা করিলেন। পথে মালাবারে ঠাকুরের বিভিন্ন আশ্রম ও ভক্তমণ্ডলীকে দেখিতে দেখিতে তিনি চলিলেন। হরিপাদ আশ্রমে তিনদিন থাকিয়া কুইলানে আসিলেন। তথায় ডাক্তর থাম্বি প্রমুখ ঠাকুরের ভক্তমণ্ডলী মহারাজের অবস্থানের জন্য একটী দ্বিতল গৃহ ভাড়া লইয়াছিলেন। মহারাজ উক্ত গৃহে অবস্থান করিলে চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিল। তথা হইতে তিনি ত্রিবিন্দ্রামে কয়েকদিন অবস্থান করেন। সেখানে বহু ভক্ত তাঁহার উপদেশ ও কৃপালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ত্রিবিন্দ্রামে অনন্তশয়ন শ্রীপদ্মনাভ-বিগ্রহ দর্শন করিয়া তিনি আনন্দে পূর্ণ হইলেন।

এই স্থান হইতে ছয় মাইল দূরে একটী পাহাড়ের উপর জমি সংগ্রহ করিয়া একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছিল। শুভদিনে মহারাজ ইহার ভিত্তিস্থাপন করিলেন। স্থানটী বড়ই মনোরম ও চিত্তমুগ্ধ-কর। পর্ব্বতশীর্ষ হইতে নীলাম্বুরাশির শোভা অনির্ব্বচনীয়। উক্ত স্থান হইতে মহারাজ কন্যাকুমারী অভিমুখে রওনা হইলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তিনি তথায় পৌঁছিলেন।

মালাবারে ভ্রমণকালে তিনি বহুসংখ্যক খৃষ্টান অধিবাসীকে দেখিয়া বলেন, "এরা উচ্চবর্ণের নির্য্যাতনে ও পেটের দায়ে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেছে। আমার ইচ্ছে হয় এদের গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়ে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ দিয়ে হিন্দুধর্ম্মে তুলে নি।" এইরূপ সহজভাবে তিনি দক্ষিণদেশে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে এবং ধর্ম্মান্তর গ্রহণকারীদিগকে স্বধর্ম্মে ফিরাইয়া আনিবার ইঙ্গিত মঠের সাধুব্রহ্মচারীদিগকে করিয়াছিলেন। নির্য্যাতিত পতিত জাতিদের দুঃখ তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন এবং তাহাদিগের কল্যাণের জন্য কার্য্য করিতে সকলকে উৎসাহ দিতেন।

ত্রিবাঙ্কুরে আয়েঙ্গার নামে জনৈক রেলকর্ম্মচারী মহারাজের নিকট দীক্ষাপ্রার্থী হন। মহারাজ দুই তিন দিন নিরুত্তর থাকিয়া একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার ইষ্ট এবং মন্ত্রের সন্ধান এখনও আমি পাই নাই। অপেক্ষা কর।" কন্যাকুমারীতে গিয়া উক্ত দীক্ষার্থীর অভীষ্ট ইষ্ট ও মন্ত্র দর্শন পাইয়া পরে তিনি তাঁহাকে দীক্ষা দেন।

কন্যাকুমারী যাত্রাকালে বাঙ্গালোর হইতে আরম্ভ করিয়া পথে প্রায় প্রত্যেক স্থান হইতেই মহারাজের সঙ্গে দুই চারিজন করিয়া স্থানীয় ভক্ত অনুগমন করিতে লাগিলেন; ইহাতে তাহাদের সংখ্যা

হইল বত্রিশজন। ত্রিবাঙ্কুরের রাজকর্ম্মচারীরা একটী দ্বিতল গৃহ মহারাজের জন্য ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। একটী ধনী ব্যবসায়ী (চেটী) যাত্রীদের থাকিবার জন্য উক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করেন।

প্রতিদিন বিশেষ বিশেষ সময়ে কন্যাকুমারীর মন্দিরে গিয়া মহারাজ বিগ্রহ দর্শন করিতেন। তৎকালে তাঁহার সমগ্র বদনমণ্ডল অপূর্ব্ব আনন্দে উদ্ভাসিত হইত। সন্ধ্যার পর চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গরাগে দেবীর অনুপম রূপমাধুরী তিনি স্থাণুবৎ স্থিরভাবে ভাবাবিষ্ট হইয়া দর্শন করিতেছেন; কখন কখন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মহারাজ বালকের মত দেবীর সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছেন! এই সময়ে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বড় থাকিত না। সর্ব্বদাই এক অপূর্ব্ব দিব্যভাবে আবিষ্ট থাকিতেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ১৭ই ডিসেম্বর কন্যাকুমারী হইতে যাত্রা করিয়া পথে সুচীন্দ্রের মন্দিরে শিবতাণ্ডবের নৃত্য দেখিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছিলেন। ৩০শে ডিসেম্বর প্রাতে তিনি বাঙ্গালোর আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

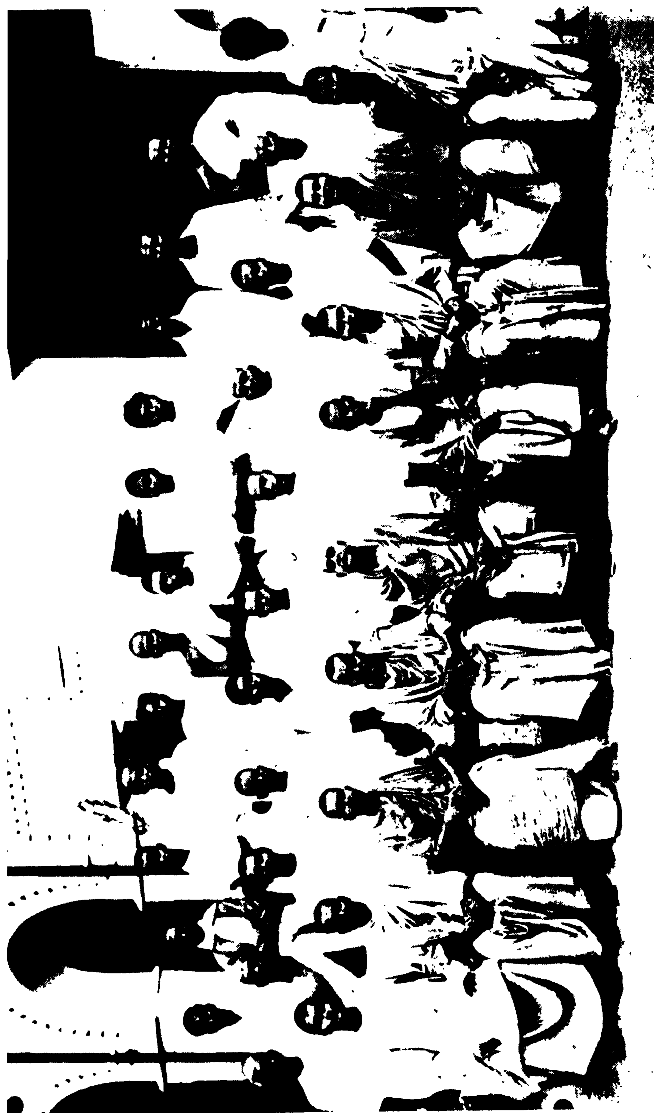
প্রায় মাসাবধি পরে মান্দ্রাজ মঠে আসিয়া মহারাজ শ্রীরামানুজ স্বামীর জন্মস্থান শ্রীপেরমবেদুর ও শ্রীরঙ্গম্ তীর্থে গমন করিলেন। শ্রীযুত বাল সুব্রহ্মণ্য স্বয়ং শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দির দ্বারে দাঁড়াইয়া মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি মহারাজকে সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। দর্শনাদি শেষ হইলে তিনি দেববিগ্রহের নানাবিধ হীরক প্রবাল মণি-মাণিক্য খচিত রত্নালঙ্কার তাঁহাকে দেখাইয়া ছিলেন। পরদিন তিনি ভক্তি-বিহ্বল-চিত্তে শ্রীরামানুজ স্বামীর সমাধি স্থান দর্শন করিলেন।

ইহার পর তিনি ত্রিচনপল্লীর পর্ব্বতশীর্ষে মন্দিরাদি, শ্রীজম্বুকেশ্বর ও শ্রীআচণ্ডালেশ্বর দুইটী সুবৃহৎ শিবমন্দির দেখিয়া পুনরায় মান্দ্রাজ মঠে ফিরিয়া আসিলেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারী ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে কয়েক জনকে তথায় ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস দান করিলেন।

শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী দর্শন করিয়া পরে মহারাজ বালাজী তিরুপতির অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রামানুজ শ্রীসম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধানে শ্রীবালাজী বিষ্ণুবিগ্রহরূপে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। মহারাজ দিব্যভাবে বিগ্রহকে দেবী মূর্ত্তিরূপে দর্শন করিলেন। ইহাই কি বিগ্রহের যথার্থ রূপ—কে বলিবে ?

মান্দ্রাজের নূতন মঠের গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্য কতকাংশ শেষ হইলে ২৪শে এপ্রেল শুভ অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে সাধু ব্রহ্মচারিগণ শ্রীশ্রীঠাকুরকে নূতন মঠে লইয়া আসিলেন। ৩০শে এপ্রেল মহারাজ নূতন মঠে প্রবেশ করিলেন। ৬ই মে Students' Homeএর গৃহ-নির্ম্মাণের ভিত্তি স্থাপন করিয়া ৯ই মে মান্দ্রাজ হইতে পুরী অভিমুখে রওনা হইলেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি Students' Homeএর দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতে তৃতীয় বার মান্দ্রাজে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন পূজ্যপাদ শিবানন্দ স্বামী। পথে বিশ্রামের জন্য তাঁহারা ওয়াল্টেয়ারে অবতরণ করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজে অবস্থানকালে তিনি সমবেতভাবে মঠের সকল সাধু ব্রহ্মচারীদের উপদেশ দিতেন। মান্দ্রাজ ও তাহার অন্তর্গত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের তিনি আনুপূর্ব্বিক সংবাদ লইতেন। মহারাজকে দর্শন করিলে লোকে স্বতঃই আকৃষ্ট হইত। তিনি অধিকাংশ সময়ে বসিয়া থাকিতেন একটী চেয়ার



বা ইঞ্জিচেয়ারে ; প্রবল আকর্ষণে দলে দলে ধর্ম্মপিপাসু বা জিজ্ঞাসু নরনারী তাঁহার পদতলে বসিয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণে ও সপ্রেম ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়া যাইত।

মান্দ্রাজ পৌঁছিবার তিন সপ্তাহ পরে শুভদিনে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের নবনির্ম্মিত Students' Homeএর দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। সেদিন তিনি রামুকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করিলেন। কয়েক দিন পরে মান্দ্রাজ হইতে তিনি বাঙ্গালোর আশ্রমে চলিয়া গেলেন। সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া পুনরায় মান্দ্রাজ ফিরিয়া আসিলেন। দাক্ষিণাত্যে দুর্গোৎসব করিবার তাঁহার অনেক দিন হইতে ইচ্ছা ছিল। তিনি কলিকাতা হইতে প্রতিমা আনাইয়া যাথারীতি পূজা ও উৎসব করিলেন। মান্দ্রাজ মঠে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা হইয়া গেলে তথায় শ্রীশ্রীকালীপূজা অনুষ্ঠিত হইল। পরে তিনি পূজ্যপাদ শিবানন্দের সঙ্গে ভুবনেশ্বরে প্রত্যাগত হইলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ববঙ্গে

পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান সহর ঢাকাকে কেন্দ্র করিয়া মঠ ও মিশনের কার্য্য উক্ত অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিতেছিল। ঢাকায় সর্ব্বপ্রথমে স্বামিজীকে দর্শন ও তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া অনেকে শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। স্বর্গীয় মোহিনীমোহন দাসের গৃহের একটী হলে এই সব ভক্তবৃন্দের সাপ্তাহিক অধিবেশন হইত। ধীরে ধীরে তাঁহারা নানা জনহিতকর কার্য্য আরম্ভ করিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। সেবাশ্রম-কার্য্য লাঙ্গলবন্ধের যোগ স্নানে যাত্রীদের সাহায্য নিমিত্ত প্রতি বৎসরে সেবকদল গঠন, শ্রীরামকৃষ্ণের ও স্বামিজীর জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান ও তৎপ্রসঙ্গে সাধারণ সভায় তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও বক্তৃতা পাঠ প্রভৃতি নানা সেবা কার্য্যদ্বারা ভক্তেরা সঙ্ঘের সহায়তায় মঠ ও মিশনের ভাব প্রচার করিতে লাগিলেন। এই সব কার্য্যের উদ্যোক্তারা অনেকেই বেলুড় মঠে আসিয়া মহারাজ ও তাঁহার গুরুভ্রাতাগণকে দর্শন করিয়া আধ্যাত্মিক-ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তথায় মঠ ও মিশন স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার উদ্যোগ চলিতে লাগিল।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের গৃহ-নির্ম্মাণের ভিত্তি সংস্থাপন উপলক্ষে ঢাকার উদ্যোক্তাগণ মহারাজকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য বেলুড় মঠে তাঁহার নিকট আসিলেন। তিনি তাঁহাদের প্রার্থনায় তথায়

যাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে তিনি ৺কামাখ্যাতীর্থে যাইবেন ইহাই স্থির হইল। শুভদিনে মহারাজ পূজ্যপাদ প্রেমানন্দ স্বামী ও মঠের কয়েকজন সাধু ব্রহ্মচারী এবং ভক্তদের সমভিব্যাহারে ৺কামাখ্যা তীর্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পাণ্ডাদের ঘরে উঠিয়া মহারাজ প্রত্যহ মন্দিরে দেবীদর্শনে যাইতেন এবং দিব্যভাবে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। সাধু ব্রহ্মচারী ও ভক্তদিগের কণ্ঠে ভজন সঙ্গীত শুনিয়া তিনি অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। ৺কামাখ্যায় তিনি যথাবিহিত কুমারী পূজা করাইয়াছিলেন। তিন দিবস তথায় থাকিয়া ভক্তদের অনুরোধে তিনি ময়মনসিংহে গমন করিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহে ঠাকুরের ভক্তগণ মহারাজকে দর্শন করিয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইলেন। তাঁহার নিকট বহু নরনারী আসিত। পূজ্যপাদ প্রেমানন্দ তাঁহাদিগের সহিত অধিকাংশ সময়ে ঠাকুর ও স্বামিজীর প্রসঙ্গ তুলিয়া নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন। মহারাজের যাহাতে কোন কষ্ট বা শ্রান্তি না হয় তজ্জন্য সকলেই সতর্ক থাকিতেন। কয়েক দিন এই ভাবে পরমানন্দে তথায় কাটিয়া গেল। অতঃপর মহারাজ সদলবলে রেলপথে ঢাকায় গমন করিলেন।

ঢাকা রেল ষ্টেসনে মহারাজের বিপুল সম্বর্দ্ধনা হইয়াছিল। তথাকার ভক্তগণ ও পদস্থ ভদ্রব্যক্তিরা তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করিয়া পাদবন্দনা করিলেন। বহু ধর্ম্মপিপাসু নরনারী তাঁহার নিকট উপদেশ ও দীক্ষা লইবার জন্য আসিতে লাগিল। মহারাজ যেখানে অবস্থান করিতেন সেখানে যেন উৎসব লাগিয়াই থাকিত। তাঁহাকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার মুখে আধ্যাত্মিক ভাবের কথা শুনিয়া সকলের প্রাণ স্নিগ্ধ ও শান্ত হইত। ১৩ই ফেব্রুয়ারী

শুভদিনে যথাবিধি পূজা ও হোমের পর তিনি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের এবং মঠের ভিত্তি সংস্থাপন করিলেন।

ঢাকা সহরে মহারাজের আগমন সংবাদ পাইয়া কাশীমপুরের জমিদার তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। জমিদারবাবুর একমাত্র পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তিনি গভীর শোকে অভিভূত হইয়াছিলেন। মহারাজকে দর্শন ও তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া তাঁহার প্রাণের আবেগ কতকটা প্রশমিত হইল। তাঁহার শোকদগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবার জন্য তিনি মহারাজকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাঁহাকে অত্যন্ত শোকাতুর এবং তাঁহার আন্তরিক আগ্রহ দেখিয়া মহারাজ তাঁহার বাড়ীতে যাইতে সম্মত হইলেন। যথোচিত সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা সহকারে জমিদারবাবু মহারাজকে তাঁহার ঢাকাসহরস্থ বাড়ীতে লইয়া গেলেন। তথায় তিনি তাঁহাকে অন্তরালে এবং নিভৃতে তাঁহার জীবনের কাহিনী ও তাঁহার দাবদগ্ধ হৃদয়ের সমুদায় অশান্তির কথা অকপটে ব্যক্ত করিলেন। এই দারুণ অশান্তিতে তিনি চারিদিকে ঘোর নৈরাশ্যের অন্ধকার দেখিতেছিলেন। মহারাজ তাঁহার ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে যথোচিত উপদেশ দান করিয়া কৃপা করিলেন। জমিদারবাবু মহারাজের দয়ায় যথেষ্ট শান্তি ও সান্ত্বনা পাইলেন। পরে একদিন তিনি মহারাজকে কাশীমপুরে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। মহারাজ অনুমতি প্রদান করিলে তিনি মহারাজসহ প্রেমানন্দ স্বামিজী এবং অন্যান্য সাধুব্রহ্মচারীদিগকে কাশীমপুরে লইয়া গেলেন। তথায় মহারাজকে পাইয়া তিনি পরমানন্দ অনুভব করিলেন এবং একদিন নিকটবর্ত্তী

গভীর জঙ্গল দেখাইবার জন্য তাঁহাদিগকে হস্তিপৃষ্ঠে লইয়া যান। এইরূপে মহারাজের কৃপায় তাঁহার শোকদগ্ধ হৃদয় ঈশ্বরাভিমুখী হইয়া পারমার্থিক সাধনায় প্রবৃত্ত হইল।

কয়েকদিন পরে মহারাজ ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়া গেণ্ডারিয়াস্থিত বিজয়কৃষ্ণের তপস্যাপূত আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় তখন গোঁসাইজীর বৃদ্ধা শাশুড়ী বাস করিতেছিলেন। বৃদ্ধা ঠাকুরের নিকট অনেক সময়ে যাতায়াত করিতেন এবং মহারাজের সঙ্গে সেই সময় হইতে তাঁহার আলাপ পরিচয় ছিল। বৃদ্ধা মহারাজকে দেখিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া প্রণতা হইলেন। মহারাজ সহাস্যবদনে তাঁহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার আহার করিতে কষ্ট হয়, ইহা বলিলে মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "সে কি গো! কুকুরে ত সব খায়—তাতে কি? জীবনে ভক্তিলাভ করাই উদ্দেশ্য, তা হলেই ত হল।"

ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জে আসিয়া মহারাজ সদলবলে পূজ্যপাদ প্রেমানন্দের সঙ্গে দেওভোগ গ্রামে নাগ মহাশয়ের বাড়ী দর্শন করিতে পদব্রজে গমন করিলেন। খোল করতাল লইয়া ঢাকায় ও নারায়ণগঞ্জের অনেক ভক্ত তাঁহাদের সহযাত্রী হইলেন। সকলেই নাগ মহাশয়ের বাড়ীতে পৌছিলে প্রেমানন্দ ভাবাবিষ্ট হইয়া গাত্র হইতে জামা কাপড় উন্মোচন করিয়া প্রাঙ্গণে গড়াগড়ি দিলেন। ভক্তেরা খোল করতাল-সহ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মহারাজ একস্থানে নীরব ও নিশ্চল-ভাবে স্থাণুর মত বসিয়াছিলেন। ভাবোন্মত্ত প্রেমানন্দ তাঁহার নিকট অর্দ্ধস্ফুটবাক্যে বলিলেন—"মহারাজ, এদের একটু কৃপা—" এই অর্দ্ধোত্থিত বাক্য শুনিতে না শুনিতে মহারাজ ভাবে গর্গর মাতোয়ারা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হুঙ্কার দিয়া ঊর্দ্ধে লাফাইয়া গাহিলেন, "—হরি নামে

গগন ছাও রে।” কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে গিয়া ভাবে তিনি নৃত্য করিতে পারিতেছেন না! তিনি গভীর ভাবসমাধিতে একেবারে মগ্ন হইলেন। মহারাজের ঈদৃশ ভাব দেখিয়া সকলে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তাঁহার দুইহস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ, শরীর কঠিন কাষ্ঠবৎ। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! সকলের হৃদয়ে অদ্ভুত আধ্যাত্মিক ভাবের তরঙ্গ বহিল। তাহারা মুগ্ধভাবে মহারাজের এই অপার্থিব দিব্যভাবের অবস্থা অপলকনেত্রে ও ভক্তিরসাপ্লুতচিত্তে দেখিতে লাগিল।

মহারাজের ভাব সম্বরণ হইলে পর তথায় বাতাসা প্রভৃতি ভোগ আনিয়া হরিরলুট দেওয়া হইল। অনন্তর পরমানন্দে মহারাজ সদলবলে নারায়ণগঞ্জে প্রত্যাগমন করিলেন।

মহারাজের আগমনে ঢাকায় ও নারায়ণগঞ্জে একটা আধ্যাত্মিক ভাবের প্রবল তরঙ্গ উঠিয়াছিল। তিনি বহু নরনারীকে সাধনপথের নির্দ্দেশ ও কৃপা করিয়াছিলেন। তৎপর মহারাজ প্রেমানন্দ স্বামী ও অন্যান্য সাধুব্রহ্মচারীসহ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে

মহারাজ মাঝে মাঝে কাশীধামে ও হরিদ্বার-কনখলের আশ্রমে গিয়া বাস করিতেন। তন্মধ্যে কাশীধামের আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া মহারাজ কখন কখন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য তীর্থ দর্শন করিয়া আসিতেন। তাঁহার অবস্থান এবং তাঁহার দিব্যদর্শনে আশ্রমের সাধুব্রহ্মচারিগণ স্থানীয় ভক্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরা পরমানন্দ অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইতেন এবং পারমার্থিক তত্ত্ব ও চরম সত্যকে লাভ করিবার জন্য তাঁহাদের হৃদয় উন্মুখ হইয়া উঠিত। এই সব ভ্রমণের সময় নিষ্ঠাবান কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তকে তাঁহাদের স্ব স্ব আদর্শ সার্ব্বভৌমিক উদারতার উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিয়া পারমার্থিক কল্যাণ পথে অগ্রসর হইবার জন্য মহারাজ উৎসাহিত করিতেন। মানুষ যে পথেই চলুক না কেন, যে আদর্শেই অনুরক্ত হউক না কেন, যে অবস্থায়ই বা পরিস্থিতিতে পতিত হউক না কেন, ঈশ্বরই তাহার একমাত্র লক্ষ্য, ইহা তাহাদের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করাইবার জন্য মহারাজ ব্যগ্র হইয়া পড়িতেন। এই দুর্গম পথে চলিতে গেলে সত্য লাভের জন্য মানুষের যেরূপ অটল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অসীম ধৈর্য্য, অপরিসীম অধ্যবসায়, কঠোর তপশ্চর্য্যা এবং একান্ত ব্যাকুলতা আবশ্যক তাহা সরল প্রাঞ্জল ভাষায়, সতেজ বাক্যে ও আধ্যাত্মিকতার বিমল দীপ্তির আলোকে বুঝাইয়া দিতেন। কিন্তু বুঝিবার ও বুঝাইবার

পুরোভাগে থাকিত তাঁহার অলৌকিক ব্যক্তিত্ব, তাঁহার হৃদয়ের প্রজ্বলিত আধ্যাত্মিক অগ্নির উত্তাপ এবং বাণীর তেজবহ্নি। ইহাতে উদ্দীপিত হইয়াই তাহাদের হৃদয়ের উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত এবং সত্যলাভের জন্য তাহাদের অনুরাগ বৃদ্ধি পাইত। তাঁহার নানাস্থানে ভ্রমণে এই তত্ত্ব স্ফুটতররূপে প্রকাশ হইত।

বিভিন্ন সময়ে তিনি কাশীধামে বা হরিদ্বারে পুনঃ পুনঃ গমন করিয়াছিলেন ; তৎসমুদায় এই পরিচ্ছেদে সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হইল।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে ২০শে মার্চ্চ বুধবার মহারাজ শ্রীতুরীয়ানন্দ, শ্রীশিবানন্দ ও কয়েকজন সাধুসেবক এবং ভক্তসঙ্গে বোম্বেমেলে হরিদ্বার যাত্রা করিলেন। তাঁহারা সকলেই কনখল সেবাশ্রমে উঠিলেন। তথায় অবস্থানকালে মহারাজ দুর্গোৎসব করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কনখলে সতী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তথায় কেহ প্রতিমায় দুর্গাপূজা করে নাই। কলিকাতা হইতে প্রতিমা আনাইয়া যথাবিধি মহাসমারোহে তিন দিন মহামায়ীর পূজার্চ্চনা হইল। মঠে মঠে সাধুদের নিমন্ত্রণ করিয়া তিনি বিরাট সমষ্টি-ভাণ্ডারা দিলেন। সাধুরা প্রতিমা দর্শন, ভজন সঙ্গীত শ্রবণ ও মায়ের বিবিধ উপাদেয় প্রসাদ ধারণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই ভারতের উত্তর প্রান্তে হিমালয়ের ক্রোড়ে শ্রীশ্রীমহামায়ার পূজার উপকরণেও কোন ক্রটী হয় নাই। কনখলের আশ্রমে কয়দিন যেন বাংলাদেশের আবির্ভাব হইয়াছিল। পূজান্তে মহারাজ দাক্ষিণাত্যে একবার দুর্গোৎসব করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাধুরা পরে বহুকালাবধি কনখল আশ্রমে জিজ্ঞাসা করিত, "আবার কবে দুর্গোৎসব হইবে ?"



এই সময়ে সাধুদের মধ্যে কেহ কেহ তপস্যার জন্য হৃষীকেশ ও লছমন ঝোলায় গিয়াছিলেন। সেখান হইতে তাঁহারা কনখল আশ্রমে ফিরিয়া আসিলে মহারাজ তাঁহাদের কুশল প্রশ্ন করিতেন। কাহারও শরীর দুর্ব্বল ও বিবর্ণ দেখিলে তিনি তাঁহাকে বলিতেন, "কেমন ছিলি ? কষ্ট পেয়েছিস্ বুঝি !" একজন তরুণ সাধু হৃষীকেশ হইতে কনখল আশ্রমে ফিরিয়া আসিলে মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, তুই যে শুকিয়ে গেছিস্—কষ্ট হয়েছিল ?" ইহা শুনিয়া শিবানন্দ স্বামিজী বলিলেন, "ও হৃষীকেশের তপস্যার হাওয়া লেগেছে !" মহারাজ অমনি বলিয়া উঠিলেন, "তপস্যা না ছাই, ওর মুখ কালো হয়ে গেছে, সেখানে কষ্ট পেয়েছে।" মহারাজ মঠের সাধু ব্রহ্মচারী বা ভক্তদের সাধন ভজনে যেমন উৎসাহিত করিতেন আবার তাঁহাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের দিকে তেমনি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি তাঁহাদিগকে প্রায়ই বলিতেন যে, "জগতে এসেছিস্ তাঁকে লাভ করতে। তাঁকে আগে লাভ করে ধন্য হয়ে যা। নিজের চিন্তা আগে কর, নিজের পথের সম্বল আগে করে নে, কি জন্য এখানে এসেছিস, আগে সেই প্রশ্নের মীমাংসা করে নে। খাট, খাট—অমৃত কুণ্ডে পড়ে অমর হয়ে যা, দিনরাত তাঁর কাছে প্রার্থনা কর।"

জনৈক সেবকের বন্ধু কিছুদিন যাবৎ হৃষীকেশে তপস্যা করিতেছিলেন। সেবক মহারাজকে জানান যে তাঁহার বন্ধুটীর নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হইয়াছে। ইহা শুনিয়া মহারাজ বলিলেন, "কইরে, সে এই কিছুদিন আগে এখানে এসেছিল, তার চোখ দেখে ত সেরকম কিছু হয়েছে বলে মনে হল না।" পরে গম্ভীরভাবে তিনি বলিতে লাগিলেন, "বাবা, সমাধি কি সোজা কথা !—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ,

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।

—এক ঠাকুরের সে সমাধি মুহুর্মুহুঃ দেখেছি, আর স্বামিজীর কয়েক বার দেখছি।" এই কথার পর সেবকটী জিজ্ঞাসা করেন, মানুষের জীবনে বহুদিন ধরিয়া সাধন ভজন করিলে সমাধিলাভ সম্ভব কিনা? প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—"অটুট ব্রহ্মচর্য্য থাকলে সম্ভব।"

দুর্গোৎসবের পরে মহারাজ শিবানন্দ স্বামী, তুরীয়ানন্দ স্বামী ও সেবকগণসহ কাশীধামে চলিয়া আসিলেন। তাঁহাদের আগমনে আশ্রমে আনন্দোৎসব লাগিয়া গেল। ডাক্তার নৃপেন্দ্র মুখার্জ্জি প্রাণপণে তাঁহাদের যথোচিত সেবা ও যত্ন করেন।

শ্রীশ্রীমা কালীপূজার কিছুদিন পূর্ব্বে সদলবলে কাশীধামে শুভাগমন করেন। অদ্বৈতাশ্রমে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীশ্যামা পূজা হইল। শ্রীবৃন্দাবন হইতে আগত একটী দল রাসলীলার ভজন করিলে বেশ আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে বহু ভক্ত মহারাজকে দর্শন করিতে কাশীধামে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও মঠে এবং কাহাকেও অন্যত্র থাকিয়া কিছুদিন সাধন ভজন করিবার জন্য তিনি উৎসাহিত করিলেন। তিনি বলিতেন, "ক্ষেত্রের মধ্যে কাশীধাম শ্রেষ্ঠ। কাশীর মত জায়গা নেই। কত সাধু ঋষি তপস্বী রাজর্ষির সাধনার ক্ষেত্র, সিদ্ধির স্থান। এখানে একটু জপ ধ্যান করলেই জমে যায়।" কাহাকে কাহাকেও গোপনে ডাকিয়া তিনি বলিতেন, "খুব উঠে পড়ে লাগ। এমন স্থান যে ধ্যান আপনা হতেই হয়। রাতদিন 'হর' 'হর' 'বোম বোম' শব্দ হচ্ছে।

এ স্থানের হাওয়াই অন্যরকম। একটু করলেই হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়।"

এই সময়ে সুকণ্ঠ গায়ক খ্যাতনামা অঘোরবাবু কাশীবাস করিতেছিলেন। তিনি প্রায় প্রত্যহ সকালে আশ্রমে বেড়াইতে আসিতেন এবং মহারাজ ও উপস্থিত সকলকে মধুরকণ্ঠে বিনাযন্ত্র সাহায্যে দুই চারিখানি ভজন শুনাইয়া যাইতেন। তাঁহার ভজনে যেন অমৃত বর্ষিত হইত। মহারাজ একদিন যন্ত্র সাহায্যে তাঁহার ভজন শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি দুইজন শ্রেষ্ঠ সারিঙ্গী ও আনুষঙ্গিক বাদ্যযন্ত্র সহযোগে অদ্বৈত আশ্রমে সন্ধ্যারতির পর গান করেন। মহারাজ এবং মঠের সাধুগণ ও ভক্তমণ্ডলী তাঁহার সুর তান লয়সহ ভজনে মুগ্ধ হইলেন। মহারাজ পরে বলিয়াছিলেন, "এরূপ মধুর কণ্ঠ ও শুদ্ধবাণী প্রায় শুনা যায় না, স্বর বন্ধ হলেও যেন হাওয়ায় সুর খেলছে, ভজনের ভাব আর সুরে যেন এক হয়ে গেছে।"

ভক্তদের মধ্যে কয়েকজনের ধারণা ছিল যে, রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাশ্রম ও সেবাধর্ম্ম ঠিক ঠাকুরের উপদেশ ও শিক্ষানুযায়ী নয়; ইহাতে পাশ্চাত্য ভাবের স্পর্শ আছে। তাঁহারা বলিতেন যুবক সাধুব্রহ্মচারীরা সাধন-ভজন দ্বারা ঈশ্বরলাভ না করিয়া ডিস্পেন্সারী ও হাসপাতালে রুগ্ন ও আর্ত্তের সেবা করিতেছে—ইহাই কি ঠাকুর বলিয়াছেন? এইসব মতাবলম্বীদের মধ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতলেখক শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ একজন ছিলেন। তিনি উক্ত সময়ে কাশীধামে গিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট নীচের তলায় একটী ছোট ঘরে থাকিতেন। দুইবেলা অদ্বৈতাশ্রমে মহারাজ ও শিবানন্দ স্বামীর সঙ্গ করিতে তথায় আসিতেন। একদিন শ্রীশ্রীমা সেবাশ্রম দেখিতে

আসিলেন। মহারাজ প্রমুখ উভয় আশ্রমের সকলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পরে শ্রীশ্রীমাকে একটী পালকি করিয়া সেবাশ্রমের সমস্ত প্রদর্শন করাইয়া ডিস্পেন্সারীর বারান্দায় আসিয়া সকলে দাঁড়াইলেন। মহারাজ মার জন্য চেয়ার আনাইলেন এবং কিঞ্চিৎ দূরে যুক্তকরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্রীশ্রীমা যেন তখন অন্তর্মুখী, স্থির ও শান্তভাবে বসিয়া আছেন। মহারাজ অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "মা, এই সব সেবাশ্রমের যা কিছু উন্নতি সব কেদারবাবা ও চারুবাবুর প্রাণপাত চেষ্টায়।" কেদারবাবা (অচলানন্দ) অমনি বলিয়া উঠিলেন, "মা, সব মহারাজের দয়ায়। আমরা শুধু ওঁর আদেশমত খেটেছি।" শ্রীশ্রীমা নিরুত্তরে কিছুক্ষণ বসিয়া তাঁহার বাসায় ফিরিয়া গেলেন এবং পরে সেবাশ্রমের জন্য দশ টাকার একখানি নোট পাঠাইয়া দিলেন। কোন ভক্ত তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিতে গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, সেবাশ্রম কেমন দেখলেন ?" মা ধীরভাবে বলিলেন, "দেখলাম ঠাকুর এখানে প্রত্যক্ষ বিরাজ করছেন। তাই এই সব কাজ হচ্ছে। এই সব তাঁরই কাজ।" মায়ের এই অভিমত ভক্তটী মঠে গিয়া মহারাজকে জানাইলেন। মহারাজ পূজ্যপাদ শিবানন্দকে তাহা অবিলম্বে বলিলেন। ঠিক সেই সময় মাষ্টার মহাশয় (মহেন্দ্রনাথ) অদ্বৈতাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে মঠে আসিতে দেখিয়া মহারাজ কয়েকটী ব্রহ্মচারী ও ভক্তদের তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন, "মাষ্টার মশায়, মা বলেছেন—সেবাশ্রম ঠাকুরের কাজ, সেখানে ঠাকুর প্রত্যক্ষ রয়েছেন—এখন আপনি কি বলেন ?" মাষ্টার মহাশয়কে দেখিয়া সকলে একযোগে ঐ কথাগুলি বলিতে লাগিলেন। মহারাজও আর নীরবে থাকিতে পারিলেন না। তিনিও তাঁহাকে বলিলেন,

"মাষ্টার মশায়! মার কথা শুনেছেন তো? এখন আর না মানলে চলবে না। মা এই সেবাশ্রমে ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ করলেন। মা বলেছেন, এ তাঁরই কাজ।" মাষ্টার মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আর অস্বীকার করবার জো নেই।"

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী অদ্বৈতাশ্রমের সন্নিকটে শ্রীযুত হরিপদ দত্ত ও কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়দের বাড়ীতে ছিলেন। মহারাজ প্রতিদিন প্রাতে বেড়াইবার সময় তাঁহাকে দর্শনের জন্য তথায় যাইতেন; গোলাপ মাকে ডাকিয়া কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পরে বালকের মত রঙ্গ করিতেন। শ্রীশ্রীমা দূর হইতে তাহা দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন। রাখালের কোন বিষয়ে কোন অভিমত জানিতে পারিলে তিনি তাহা অবিলম্বে অনুমোদন করিতেন। ভক্ত নরনারীরা আধ্যাত্মিক প্রশ্ন করিলে শ্রীশ্রীমা তাহার উত্তর দিতেন। আবার কাহাকেও কাহাকেও বলিতেন যে, "রাখালকে জিজ্ঞাসা করিও।" কাহাকেও গেরুয়া বস্ত্র দান করিয়া মা বলিয়া দিতেন, "রাখালের কাছে সন্ন্যাস নিও।" মহারাজও শ্রীশ্রীমার কোনও আদেশ বা অভিমত জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ তাহা নির্ব্বিচারে পালন করিতেন।

এইরূপ একদিন মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিবার জন্য নীচের প্রাঙ্গণে গিয়া দাঁড়াইলেন। মাষ্টার মহাশয় ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গোলাপ মা উপরের বারান্দা হইতে মহারাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রাখাল! মা জিজ্ঞেস কর্চ্ছেন, আগে শক্তিপূজা করতে হয় কেন?" মহারাজ উত্তর করিলেন, "মার কাছে যে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি। মা কৃপা ক'রে চাবি দিয়ে দোর না খুললে যে আর উপায় নেই।" এই বলিয়া মহারাজ বাউলের সুরে একটী

গান ধরিলেন। গীত গাহিতে গাহিতে তিনি ভাবোন্মত্ত হইয়া বালকের মত নাচিতে লাগিলেন। গানের শেষে তালের সঙ্গে আপনা আপনি—হো-হো-হো বলিয়াই সবেগে উক্ত গৃহ হইতে ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া গেলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতকার শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এবং অন্যান্য দুয়েকটী ভক্ত দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব্ব ভাবময় দৃশ্য দেখিতেছিলেন। উপরে অনেক স্ত্রীভক্ত লইয়া শ্রীশ্রীমা তাঁহার রাখালের এই নৃত্যগীত দেখিয়া আনন্দ করিতেছিলেন।

এই সময়ে শ্রীশ্রীমা একদিন মেয়ে ভক্তদের লইয়া সারনাথ দর্শনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তজ্জন্য ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ীর ব্যবস্থা হয়। মিস ম্যাকলাউড উক্ত সময়ে কাশীতে থাকায় হোটেল হইতে বড় ফিটন গাড়ী পাঠাইয়া দেন। কিন্তু উহা অনেক দেরিতে আসিয়া পৌঁছে। শ্রীশ্রীমা ইতিমধ্যে সারনাথ চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া মহারাজ বিশেষ দুঃখিত হন। তিনি ডাঃ নৃপেনবাবু ও দুইজন সেবকসহ অবিলম্বে ঐ ফিটনে সারনাথ গমন করেন। তথায় পৌঁছিয়া শ্রীশ্রীমা যাহাতে উক্ত ফিটনে প্রত্যাগমন করেন তজ্জন্য মহারাজ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলে শ্রীশ্রীমা তাহাতে সম্মত হইলেন। শ্রীশ্রীমা ও তাঁহার সঙ্গিনীদের ফিটনে তুলিয়া দিয়া তিনি ডাক্তারবাবু ও সেবক দুইটী সহ ভাড়াটিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। রাস্তার বাঁধের একটী বাঁকের মুখে ঘুরিবার কালে ঐ গাড়ী উল্টাইয়া পড়ে। ইহাতে মহারাজের বিশেষ কোন গুরুতর আঘাত লাগে নাই। তিনি বরং আনন্দিতচিত্তে বলিলেন, "ভাগ্যিস মা এ গাড়ীতে যান নাই।"

প্রায় ছয় মাসকাল কাশীধামে থাকিয়া মহারাজ ১৯১৩ খৃঃ অঃ ২৭শে এপ্রিল রবিবার বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। অনন্তর কোন

বিশিষ্ট ভক্তের একান্ত অনুরোধে শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব উপলক্ষে মহারাজ কয়েকজন সেবকসহ ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা অক্টোবর সন্ধ্যায় কাশীধামে যাত্রা করিলেন।

শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব অদ্বৈতাশ্রমে সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। মহারাজ উপস্থিত থাকায় ভক্তমণ্ডলীর আনন্দের অবধি নাই। মহারাজ প্রত্যহ কাশীখণ্ড শ্রবণ ও সকলকে সাধন ভজনে অনুপ্রাণিত করিয়া কাশীধামে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সেবাশ্রমের কার্য্য বিস্তৃতির জন্য সরকার সাহায্যে জমির চেষ্টা চলিতেছিল। তিনি উক্ত বিষয়ে পরামর্শ দান করিয়া সেবা-শ্রমের কার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে বিবিধ সদুপদেশ দিতেন। আশ্রমের কিভাবে কাজকর্ম্ম চলিতেছে তদ্বিষয়ে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। বিভিন্ন দেশ হইতে বৃক্ষ ও বীজাদি আনাইয়া সেবাশ্রম সুশোভিত করিলেন। পুষ্প বৃক্ষাদি রোপণ ও তাহাদের যথোচিত যত্ন এবং সকল দিকে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে তিনি তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। ৺পুরীর সমুদ্রকূল হইতে নানা বর্ণের ঝিনুক আনাইয়া তিনি সদর ফটকের স্তম্ভদ্বয় কারুকার্য্য খচিত করাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহার জন্য দেশস্থ জনসাধারণ কাশী সেবাশ্রমকে "কৌড়ী হাসপাতাল" বলিয়া থাকে।

অনন্তর মহারাজ ৺ঝুলন যাত্রা উপলক্ষে অযোধ্যা দর্শনে যাত্রা করেন। হনুমান গড় মন্দিরে শ্রীশ্রীমহাবীরের সম্মুখে রামনাম সঙ্কীর্ত্তন করিবার তাঁহার ইচ্ছা হইল। তথায় সাধু ব্রহ্মচারী ও ভক্ত যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া রামনাম সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। রামনাম কীর্ত্তন শুনিতে

শুনিতে তিনি গভীর ভাবাবিষ্ট হইলেন এবং সমাগত সকলেই তন্ময়তা-জনিত একটা অপূর্ব্ব আনন্দে মগ্ন হইয়াছিল। স্থানীয় কতিপয় বিশিষ্ট লোক এই রামনাম শুনিয়া উহা হিন্দী ভাষায় মুদ্রিত করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

একদিন সন্ধ্যার পর মহারাজ ঝুলন দেখিতে যান। তথায় সুসজ্জিত মঞ্চে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে জনৈক নট নাচিতে নাচিতে সুমধুর ভজন গাহিতেছিল। মহারাজ তথায় বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া ভজন শুনিতে ছিলেন। ইতিমধ্যে প্রবল ধারায় বৃষ্টি নামিল। ক্রমে জলধারা সামিয়ানার মধ্য স্থল দিয়া সজোরে পতিত হইয়া দাঁড়াইবার স্থান পর্য্যন্ত ভাসাইয়া দিল। এমত অবস্থায় মহারাজ স্থিরভাবে ভজন শুনিতেছেন দেখিয়া একটী বেঞ্চ তথায় আনা হইল এবং তাঁহাকে বলায় তিনি উহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এইরূপ ভাবোন্মত্ত চিত্তে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে সুদীর্ঘ কাল তিনি তন্ময় চিত্তে ভজন শুনিতে লাগিলেন। বৃষ্টি বন্ধ হইবার বহুক্ষণ পরে মহারাজ প্রকৃতিস্থ হইয়া বাসস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তথায় এইরূপ ভাবতন্ময়তায় পরমানন্দে পাঁচদিন বাস করিয়া কাশীধামে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন।

সাধুব্রহ্মচারিগণকে সমবেতভাবে কালীকীর্ত্তন ও ভজন সঙ্গীত গাহিতে মহারাজ প্রায়ই বলিতেন। অম্বিকানন্দ উচ্চ সুরতানযোগে উভয় আশ্রমের অনেককে ভজন সঙ্গীত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। উভয় আশ্রমের মিলিত সাধু ব্রহ্মচারী ও কর্ম্মিবৃন্দ দুর্গাবাড়ী ও শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার মন্দিরে আমন্ত্রিত হইয়া বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ গুণিগণের সম্মুখে সুদীর্ঘ তিন ঘণ্টা ব্যাপী ভাবোন্মত্ত হইয়া ভজন গাহিতেন।

শ্রোতৃবর্গ ভক্তিরসাপ্লুত চিত্তে তাহা শুনিত। অন্নপূর্ণার মন্দিরের মোহান্তজী যথাসম্মানে মহারাজকে তাঁহার স্বীয় আসনে বসাইয়া স্বয়ং তাঁহার পার্শ্বে অবহিত চিত্তে উপবিষ্ট থাকিতেন। আশ্রমের সাধু ও ভক্তগণ তথায় সাদরে অভ্যর্থিত হইতেন। সেবাশ্রম বা অদ্বৈত আশ্রমে এই ভজন গান শুনিবার জন্য কাশীস্থ বহুলোক তথায় আসিত। শুদ্ধচেতা সাধনপরায়ণ সাধু ব্রহ্মচারিগণের ভক্তিপূর্ণ ভজন শুনিয়া এবং মহারাজের ভাবতন্ময় শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া সমাগত সকলেই অপার আনন্দে আপ্লুত হইত।

দেখিতে দেখিতে শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজা সমাগত হইল। এবার প্রতিমায় ৺দুর্গাপূজার ব্যবস্থা হইল না। চতুর্দ্দিকে লোকে বিপন্ন, মেদিনীপুর জেলায় ভীষণ বন্যা, বিভিন্ন দেশে অন্নকষ্ট এবং পাশ্চাত্য দেশে যুদ্ধ উপলক্ষে লোকজনের দুর্গতি দেখিয়া মহারাজ প্রতিমায় দুর্গোৎসব স্থগিত রাখিয়া শ্রীশ্রীকালীপূজা করিতে পরামর্শ দিলেন। এই সময়ে তুরীয়ানন্দ স্বামীকে কাশীতে আসিবার জন্য তিনি স্বহস্তে লিখিয়া একখানি পত্র পাঠাইলেন। মহারাজের সাদর আহ্বানে তিনি কনখল হইতে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে শিবানন্দ স্বামী আলমোড়া হইতে কাশীধামে আসিয়া পৌঁছিলেন।

এদিকে বহুকাল যাবত মহারাজ বেলুড় মঠে আগমন না করায় পূজ্যপাদ প্রেমানন্দ স্বামীর ভাল লাগিতেছিল না। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা মহারাজ মঠে শীঘ্র প্রত্যাগমন করেন। ৪ঠা অক্টোবর ১৯১৪ সালের লিখিত কাশীর এক পত্রে তিনি জানিতে পারিলেন যে, মহারাজের বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে। ইহা শুনিয়া তিনি যে

কোন উপায়ে মহারাজকে বেলুড় মঠে আনিবার জন্য মনে মনে স্থিরসঙ্কল্প হইয়া স্বয়ং কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীকালীপূজার পূর্ব্বে এইভাবে গুরুভ্রাতাগণ তথায় সম্মিলিত হইয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। উভয় আশ্রমের সাধু ব্রহ্মচারিগণও অপার আনন্দে মগ্ন হইলেন।

বিজ্ঞানানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও এলাহাবাদ মঠ দেখিবার উদ্দেশে মহারাজ সেবকগণসহ তথায় গমন করিলেন। প্রেমানন্দও কাশী হইতে এলাহাবাদ চলিয়া গেলেন। প্রয়াগে শ্রীবেণীমাধব ও ত্রিবেণী সঙ্গম দর্শনাদি করিয়া তথায় তিন রাত্রি মহারাজ অতিবাহিত করিলেন। চতুর্থ দিবসে দ্বিপ্রহর বিশ্রামান্তে প্রেমানন্দ মহারাজের সম্মুখে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া একবারে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ, তোমায় মঠে যেতেই হবে।" বয়োজ্যেষ্ঠ প্রিয়তম গুরুভ্রাতাকে এই ভাবে ভূমিষ্ঠ হইতে দেখিয়া মহারাজ শশব্যস্তে চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং সস্নেহে ব্যগ্র কণ্ঠে বলিলেন, "ওকি, বাবুরাম দা, ওকি! ওঠ—ওঠ!" প্রেমানন্দ ভূমিতে তদবস্থায় থাকিয়াই পুনরায় বলিলেন, "মহারাজ! তোমায় মঠে যেতেই হবে।" মহারাজ তখন অত্যন্ত কাতর ভাবে বলিলেন, "বাবুরাম দা, ওঠ ওঠ আমি যাব।" তখন প্রেমানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং উত্তেজিত কণ্ঠে গম্ভীর ভাবে মহারাজকে বলিলেন, "আজই যেতে হবে।" সে দিন গাড়ীর সময় না থাকায় অগত্যা পরদিনই ডাক গাড়ীতে বেলুড় মঠে যাওয়া স্থির হইল। প্রেমানন্দের মুখমণ্ডলে আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল।

বেলুড় মঠে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার প্রিয়তম গুরুভ্রাতা প্রেমানন্দের ঐকান্তিক ইচ্ছা, আকুল আগ্রহ ও প্রেমের উচ্ছ্বাসজনিত আহ্বানে মহারাজের আর বৃন্দাবনে যাওয়া হইল না। শ্রীশ্রীঠাকুর



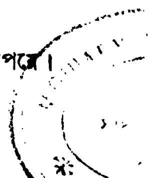
স্বামী ব্রহ্মানন্দ

এলাহাবাদে গৃহীত ফটো

তাঁহার ত্যাগী সন্তানদের পরস্পরকে কি এক অচ্ছেদ্য প্রেমের বন্ধনেই না বাঁধিয়াছিলেন! প্রেমস্বরূপ ঠাকুরও যেমন অদ্ভুত, গুরুভ্রাতাদের পরস্পরের প্রেমও তেমনিই অদ্ভুত—জগতে ইহা অতুলনীয়!

অদ্বৈত আশ্রমে যথাবিধি শ্রীশ্রীকালীপূজা অনুষ্ঠিত হইল। শুকুল মহারাজ (আত্মানন্দ) পূজক ও অম্বিকানন্দ তন্ত্রধারক ছিলেন। রাত্রি শেষে পূজক ও তন্ত্রধারক হোম সমাপ্তির পর অন্যত্র বিশ্রাম করিতে গিয়াছিলেন। প্রতিমার নিকট সে সময়ে কেহ ছিল না। আশ্রমের অধ্যক্ষ চন্দ্র মহারাজ (নির্ভরানন্দ) সম্মুখস্থ ঘরে জাগিয়া বসিয়াছিলেন। এমন সময়ে মহারাজ তথায় আসিয়া প্রতিমার সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। পরে উঠিয়া যুক্তকরে ভাবে বিহ্বল হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "ওমা দয়াময়ী, মাগো—কৃপা কর করুণাময়ী।" এই ভাবে কিছুক্ষণ বালকের মত তিনি কত আবদার করিতে লাগিলেন। চন্দ্র মহারাজ ঘরে বসিয়া মহারাজের এই ভাবময় অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ ও বিগলিত হইয়াছিলেন। পরদিন বেলা বারটা পর্য্যন্ত অমাবস্যা থাকায় প্রাতে পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা হয়। ভোগান্তে আরতি আরম্ভ হইল। বহু ভক্ত পূজা দেখিতে আসিয়াছিলেন। মহারাজ "হের হর মনোমোহিনী" গানটী গাহিতে বলিলেন। অম্বিকানন্দ হারমোনিয়াম সহযোগে গাহিতে লাগিলেন—

হের হর মনোমোহিনী কে বলেরে কাল মেয়ে,
(আমার) মায়ের রূপে ভুবন আলো চোখ থাকে ত দেখনা চেয়ে।
বিমল হাসি ক্ষরে শশী অরুণ পড়ে নখে খসি
এলোকেশী শ্যামা ষোড়শী;
কমলভ্রমে ভ্রমর ভ্রমে, বিভোর ভোলা চরণ পেয়ে।



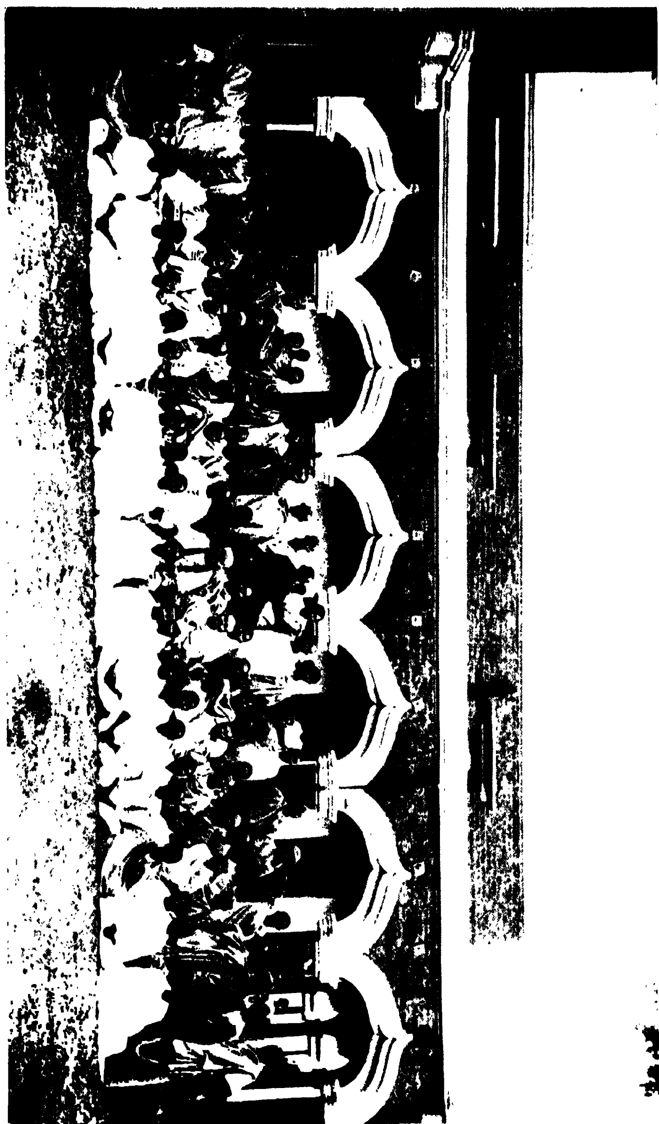
সাধু ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ অনেকেই সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন। মহারাজ জনৈক সাধুর হাত হইতে চামর লইয়া ব্যজন-সহ তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার নৃত্য দেখিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ সকলেই নৃত্য করিতে লাগিল। ভাবের আবেগবশতঃ মহারাজ নৃত্যকালে যেন ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছিলেন। ভাবের উদ্দীপনা বশতঃ আত্মানন্দের আরতিও অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল। পরে আরতি শেষ হইলে সকলে সমবেতকণ্ঠে প্রণাম মন্ত্র গাহিলেন—

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণী নমোহস্তুতে"।

এই প্রণাম মন্ত্র আরম্ভ হইলে মহারাজের বাহ্যস্ফূর্ত্তি আসিল। যাঁহারা এই সময়ে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের স্মৃতিপটে উক্ত ঘটনা এখনও সমুজ্জ্বল রহিয়াছে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পূজ্যপাদ সারদানন্দ স্বামী মঠ ও মিশনের কার্য্য লইয়া ভুবনেশ্বরের মঠে মহারাজের নিকটে আসিয়াছিলেন। তাঁহার একান্ত অনুরোধে এবং কার্য্যের সুশৃঙ্খলতার জন্য মহারাজ তাঁহার সহিত কাশীধামে গমন করিলেন।

কাশীতে গিয়া মহারাজ দেখিতে পাইলেন, সকলের মনোমালিন্যের মূলে রহিয়াছে প্রভুত্ব ও অভিমান। কয়েকমাস থাকিয়া মঠে ও সেবাশ্রমের চারিদিকে তিনি একটা আনন্দ ও আধ্যাত্মিকতার ভাব সৃষ্টি করিলেন। সাধু ব্রহ্মচারী ও সেবাশ্রমের সেবকদের প্রাণে তিনি সাধনার প্রবল উদ্দীপনা জাগাইয়া তুলিলেন। কাশীর মঠে ও সেবাশ্রমে মহারাজ, তুরীয়ানন্দ ও সারদানন্দ প্রভৃতি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ মহাপুরুষদের



একত্র সমাবেশে সর্ব্বদা আধ্যাত্মিকতার বিমল তরঙ্গ উঠিত। সকলের মন একটা উৎসাহ ও উদ্দীপনার ভাবে পূর্ণ থাকিত। প্রতিদিন সন্ধ্যারতির পর মঠের ও সেবাশ্রমের সাধু, ব্রহ্মচারী, সেবক ও ভক্তেরা মহারাজের ঘরে সমবেত হইতেন। মহারাজ তাঁহার গুরুভ্রাতাদের সহিত বসিয়া সাধনরাজ্যের গূঢ়তত্ত্ব ও মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সরলভাবে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। অনুরাগ ও ব্যাকুলতার প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি বলিতেন, "ঠাকুর বলতেন, 'মা আর একটা দিন কেটে গেল এখনও দেখা দিলি নি!' রোজ রাত্রে শোবার আগে একবার চিন্তা করবে কতটুকু ভাল কাজে গেল আর কতটুকু মন্দ কাজে গেল, কতটা তাঁর চিন্তা ও ধ্যানভজনে গেল ও কতটা তমোগুণের কাজে কেটে গেল। কি কচ্ছ তোমরা? গেরুয়া নিলে আর সংসার ত্যাগ করলেই কি সব হয়ে গেল? কি হয়েছে তোমাদের? সময় শুধু চলে যাচ্ছে। আর একমুহূর্ত্তও waste (নষ্ট) করো না।" ইহাতে যদি কেহ বলিতেন, "কাজের জন্য ধ্যান জপ করিবার সময় পাওয়া যায় না।" মহারাজ অমনি বলিয়া উঠিতেন, "মনের গোলমালের জন্য ধ্যান জপ হয় না। কাজের জন্য ধ্যান জপের সময় না পাওয়া মনে করা ভুল। Work and worship (কর্ম্ম এবং উপাসনা) এক সঙ্গে অভ্যাস করতে হবে। কেবল সাধন ভজন নিয়ে থাকতে পারলে ভাল, কিন্তু কয়জনে তা পারে? কিছু না করে অজগর-বৃত্তি অবলম্বন করে থাকা এক idiot বা (জড়বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা) যাদের brain (মস্তিষ্ক) খাটাইবার শক্তি নেই, কোন রকমে বেঁচে থাকে তারাই পারে—আর এক মহাপুরুষরা পারেন, যাঁরা কর্ম্মের পার। গীতায় আছে কর্ম্ম না করে জ্ঞান লাভ হয় না। কর্ম্মের মধ্য দিয়েই যেতে

হবে। যারা কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে সাধন ভজন করে তাদেরও ঝুবড়ি বাঁধতে আর রান্না করতে সময় কেটে যায়। কর্ম্ম ঠাকুর স্বামিজীর— এইভাব নিয়ে করলে কোনও বন্ধন ত হবেই না। অধিকন্তু তার through (মধ্য) দিয়ে spiritual, moral, intellectual এবং physical (আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানসিক এবং শারীরিক) সব রকম উন্নতি হবে। তাঁহাদের পায়ে আত্মসমর্পণ কর। শরীর মন সব তাঁদের পায়ে দিয়ে দাও। তাঁদের গোলাম হয়ে যাও। বল— এই শরীর মন সব তোমাদের দিলুম, এর দ্বারা যা দরকার কর! আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু হয় করবার জন্য প্রস্তুত। তখন তোমার ভার তাঁদের উপর। তোমাকে নিজে আর কিছু করতে হবে না। ঠিক ঠিক এইটি করা চাই। নইলে 'রামও বলবে আবার কাপড়ও তুলবে' এ চলবে না।" এইরূপ উভয় আশ্রমের সাধুব্রহ্মচারী ও সেবকদিগকে উচ্চ আদর্শে তিনি সতত অনুপ্রাণিত করিতেন, তন্মধ্যে যাঁহারা জিজ্ঞাসু ও পিপাসু তাঁহাদের প্রশ্ন ও সংশয় তাঁহাকে জানাইতেন। তিনি অমনি সেগুলির সমাধান করিয়া দিতেন। উভয় আশ্রমের সাধু ব্রহ্মচারিগণ একত্রে মিলিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় যাহাতে ভজন গান করেন তদুদ্দেশে তিনি সকলকে 'কালীকীর্ত্তন' 'রামনাম' সংগীতাদিতে যোগদানে উৎসাহিত করিতেন। নাম কীর্ত্তনের তন্ময়তায় গায়ক ও শ্রোতৃবৃন্দ এক ঘনীভূত আনন্দের আস্বাদ পাইতেন। তুলসীদাস প্রতিষ্ঠিত 'সঙ্কট মোচন' স্থানে শ্রীশ্রীমহাবীরের সম্মুখে উভয় আশ্রমের সাধুব্রহ্মচারীদের লইয়া তিনি রামনাম সংকীর্ত্তন করাইলেন। ফাল্গুনের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে ইহা প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। এই রামনাম কীর্ত্তনে

স্থানীয় ভক্তবৃন্দ ও অনেক বিশিষ্ট লোক পরম আনন্দ লাভ করিলেন। তদবধি উক্তস্থানে মহারাজের অভিপ্রায়ানুযায়ী প্রতিবৎসর এইদিনে রামনাম কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

অনন্তর কাশীর অদ্বৈত আশ্রমে স্বামিজী ও ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে চল্লিশ জন সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ-গয়ার মঠে সমষ্টিভোজন উপলক্ষে আশ্রম হইতে আশি জন সাধু গমন করিয়াছিলেন। সেবাশ্রমের প্রারম্ভ হইতে অক্লান্ত কর্ম্মী ও পরে অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র (শুভানন্দ) সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া এই সময়ে তপস্যায় চলিয়া যান। মহারাজের অপূর্ব্ব কর্ম্মকুশলতা ও অদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভায় উভয় আশ্রমে অনৈক্য ও মনোমালিন্য দূরীভূত হইয়া সকলে প্রেমের মিলনে আবদ্ধ হইল।

কাশীধামে যখন তিনি শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর ও শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দর্শনে যাইতেন তখন তাঁহার গুরুভ্রাতারা এবং মঠের অন্যান্য সাধু ব্রহ্মচারীরা তাঁহার সঙ্গে গমন করিতেন। কাহাকেও আবার ডাকিয়া মহারাজ সঙ্গে লইতেন। দলবল সহ তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া লোকে জিজ্ঞাসা করিত, "ইনি কোন মঠের মোহান্ত মহারাজ?" এই সময় তাঁহার ভাবগম্ভীর আকৃতি স্বতঃই সকলের চিত্তাকর্ষণ করিত।

তিনি বহুপূর্ব্বে মাত্র একজনকে কাশীধামে দীক্ষা দিয়াছিলেন, পরে আর কাহাকেও মন্ত্রদীক্ষা দিতেন না। তিনি বলিতেন, "স্বয়ং বিশ্বনাথ এখানে জীবের মন্ত্রদাতা গুরু।" তিনি তথায় ত্যাগ বৈরাগ্যের অগ্নিমন্ত্রে অনুপ্রাণিত করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস দান করিতেন।

কাশীধামে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার মন্দিরে প্রবেশ করিলেই তিনি প্রায় ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। ৺শিবচতুর্দ্দশীর দিন তিনি দর্শনার্থ

আশ্রম হইতে সদলবলে পদব্রজে মন্দিরে গেলেন। ভাববিহ্বল মহারাজ বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া অন্নপূর্ণার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। অদ্য মা অন্নপূর্ণার রাজরাজেশ্বরীর বেশ। স্বয়ং বিশ্বনাথ তাঁহার নিকট ভিক্ষুক। অদ্বৈতকেশরী ভগবান শঙ্করাচার্য্য করজোড়ে প্রার্থনা করিয়াছিলেন,

"অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতি।"

জগন্মাতা যে জ্ঞান বৈরাগ্য ও প্রেম দুই হস্তে জগতে বিলাইতেছেন! মহারাজ মা অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভাবচক্ষে কি প্রত্যক্ষ করিতেন—তাহা কে বলিবে? তিনি ভাবে তন্ময় ও তাঁহার নয়ন অর্দ্ধনিমীলিত। কিছুক্ষণ পরে তিনি মৃদুভাবে তাঁহার সঙ্গী ব্রহ্মচারীদের কালীকীর্ত্তন করিতে বলিলেন। ঘনীভূত ভাবের প্রবাহে কীর্ত্তন জমিয়া উঠিল। দলে দলে তীর্থযাত্রী ও দর্শনার্থী নরনারীগণ ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে তাঁহাদের চারিদিকে দাঁড়াইয়া সেই অপূর্ব্ব ভজন গান শুনিতে লাগিল। সমগ্র মন্দিরে কেমন একটা আধ্যাত্মিকতা জমাট বাঁধিয়া গেল। সেই জনমণ্ডলী যেন ভাবাবিষ্ট, কাহারও মুখে একটী শব্দ নাই। সকলেই ভক্তিবিহ্বল চিত্তে নীরব ও নিস্পন্দ। এরূপ গম্ভীর স্তব্ধতার মধ্যে মনোমুগ্ধকারী ভজনগীতি চলিতে লাগিল। মহারাজের অপার্থিব হাস্যময় বদন-মণ্ডলে বিমল স্নিগ্ধ জ্যোতি, নেত্রে প্রেমের প্রবাহ, সমুন্নত দেহ স্থির এবং সর্ব্বাঙ্গে অপূর্ব্ব এক লাবণ্য লহরী বহিয়া যাইতেছে। সকলেই নীরবে চিত্রার্পিতের ন্যায় এই দৃশ্য দেখিতেছিল।

বাস্তবিকই এই সময়ে মহারাজের অদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির

বিকাশ দেখা যাইত। যেখানেই তিনি বসিতেন, গল্প করিতেন বা ভজন গান শুনিতেন সেইখানেই একটা ঘনীভূত ভাবের আনন্দ-প্রবাহিত হইত। তাঁহার আশে পাশে চতুর্দ্দিকে যাহারা থাকিত তাহাদের প্রত্যেকের ভিতর একটা নিবিড় আনন্দের তড়িত-প্রবাহের উন্মাদনা আনিয়া দিত। তাহাদের নিজ নিজ সত্তার স্বাধীনতা অহমিকাবিজড়িত জাগতিক সুখ দুঃখের স্মৃতি সাময়িক ভাবে কোথায় সহসা লুপ্ত হইয়া যাইত। আধ্যাত্মিক জ্যোতির বিমল আলোক তাহাদের অন্তরে স্বতঃই যেন ফুটিয়া উঠিত।

অদ্বৈতাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতিখানি পুরাতন ও জীর্ণ হইয়া যাওয়ায় এই সময় উহা পরিবর্ত্তিত হয়। নূতন ফটো প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানগুলি মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই সময়ে সারদানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও সুবোধানন্দ প্রভৃতি ঠাকুরের পরম অন্তরঙ্গ সন্তানেরা মহারাজের সঙ্গে এখানে অবস্থান করিতেছিলেন। পূজার্চ্চনা প্রভৃতি অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে মহারাজ উপস্থিত সাধু-ব্রহ্মচারীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, "তোরা ঐ গানটী গা—এসেছে নূতন মানুষ।" তাঁহারা অমনি বাদ্যযন্ত্র-সহযোগে সমবেত-কণ্ঠে গাহিলেন—

"এসেছে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে,
(তাঁর) বিবেক-বৈরাগ্য ঝুলি দুই কাঁধে সদা ঝুলে॥
শ্রীবদনে "মা-মা" বাণী পড়ি গঙ্গা-সলিলে,
(বলে) ব্রহ্মময়ি, গেল মা দিন দেখা ত নাহি দিলে॥
নাস্তিক অজ্ঞানী নরে—সরল কথায় শিখালে,
যেই কালী—সেই কৃষ্ণ, নামে ভেদ এক মূলে॥

"একোয়া" "ওয়াটার" "পানি" "বারি" নাম দেয় জলে
"আল্লা" "গড " "ঈশা" "মুশা" কালী নাম ভেদে বলে ॥
দীন, ধনী-মানী জ্ঞানী—বিচার নাই জাতি কুলে,
আপন-হারা পাগল-পারা সরলে নেহারিলে ॥
দুবাহু তুলিয়ে ডাকে, আয়রে তোরা আয় চলে,
তোদের তরে কৃপা করে বসে আছি বিরলে ॥
যতন করি পারের তরি—বেঁধেছি ভবের কূলে ॥

এই ভজনটী সম্পূর্ণ শেষ হইবার পূর্ব্বে এক অপরূপ দৃশ্যপট উন্মুক্ত হইল। ভাবোন্মত্ত মহারাজ আর স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, তিনি দাঁড়াইয়া তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সকলের ভিতর যেন একটা ভাবের বিদ্যুৎ-প্রবাহ চমকিয়া উঠিল। ভাবগম্ভীর সারদানন্দ এবং রুগ্নদেহ তুরীয়ানন্দও মহারাজের সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন। চারিদিকে জমাট ঘনীভূত ভাবের বিকাশে—সকলেই আত্মহারা, ভাবে মাতোয়ারা! মহারাজের ভাবতন্ময় নৃত্যে সকলের মনে আধ্যাত্মিক ভাবের উৎস খুলিয়া গেল। যে যে অবস্থায় তথায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই অননুভূত আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন। কি এক অপূর্ব্ব প্রেমের স্রোতে সকলে ভাসিয়া চলিতেছেন। "এসেছে নূতন মানুষ" প্রতি কণ্ঠে স্ফুরিত হইল আর সত্য সত্য সেই সঙ্গে যেন এক নূতন মানুষের রূপ তাঁহাদের হৃদয় পদ্মে প্রতিভাত হইতে লাগিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ভুবনেশ্বরের মঠ

একবার কাশীধামে যাইবার সময় প্রাতে গয়া ষ্টেসনে গাড়ী থামিলে জনৈক সেবক মহারাজকে বলিয়াছিলেন, "গাড়ী কিছুক্ষণ এখানে থাকবে, যদি ইচ্ছা করেন, তবে প্লাটফরমে পায়চারি করিতে পারেন।" মহারাজ ইহা শুনিয়া জিব কাটিয়া অসম্মতি জানাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ঠাকুর নিষেধ করেছিলেন। আমার একবার গয়াধামে আসবার কথা হয়েছিল—তাতে ঠাকুর বলে উঠলেন, 'না—না, ও গয়ায় যাবে না ও পুরীতে যাবে। গয়ায় গেলে শরীর থাকবে না'।" বোধ হয় এই জন্য তিনি বহুবার পুরীধামে আসিয়াছেন, দীর্ঘকাল বাস করিয়াছেন এবং শ্রীনীলাচল তীর্থ তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল।

পুরীধামে তিনি শশী-নিকেতনে * থাকিতেন। পুরীর গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সরকারী রাজপুরুষেরা, তরুণ সম্প্রদায় এবং সকল অবস্থার বহু নরনারী তাঁহার নিকট সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। তাঁহারা কেহ শুধুমুখে ফিরিতেন না। তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তাঁহার

---

* ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে শশী-নিকেতন নির্ম্মিত হয়। মহারাজ শ্রীশ্রীমার সঙ্গে যখন পুরীধামে গিয়াছিলেন তখন বলরামবাবুদের তথায় এই প্রাসাদোপম বাড়ী ছিল না।

সদুপদেশ শুনিয়া, তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ও হাস্য কৌতুকে সময় কাটাইয়া সুস্বাদুফল ও মিষ্টান্ন দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতেন। ভারতের নানাস্থান হইতে ভক্তেরা নানাবিধ ফল ও মিষ্ট দ্রব্য পাঠাইত, মহারাজ তাহা উক্ত ভক্তদের কাহার কাহার ঘরে তাহারও কতকাংশ পাঠাইয়া দিতেন। মাঝে মাঝে প্রচুর মহাপ্রসাদ আনাইয়া সকলকে আহার করাইতেন। পুরীতে এখনও কেহ কেহ জীবিত আছেন, যাঁহারা তাঁহার এই সব প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, "মহারাজ কত ভালবাসতেন। আমরা এখানে অনেক রকম মানুষ দেখেছি কিন্তু এমনটী আর দেখি নি। তিনি যেন কত আপনার লোক ছিলেন।" তাঁহারা তাঁহার সদানন্দভাব এখনও মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়া থাকেন। কত উকীল, হাকিম ও অন্যান্য ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরা তাঁহার নিকট সদুপদেশ গ্রহণ করিতে আসিতেন। উপযুক্ত অধিকারী দেখিলে তিনি তাহাকে সাধনার ইঙ্গিত বলিয়া দিতেন। একদিন জনৈক জিজ্ঞাসু ভদ্রলোক তাঁহার নিকট ধর্ম্মপ্রসঙ্গ শুনিয়া আক্ষেপ করিয়া বলেন, "আমার নাতিটার জন্য আমার ধর্ম্মকর্ম্ম সব লোপ পেয়েছে। তার মায়াতে আমি দিন দিন জড়িয়ে পড়ছি।" মহারাজ ইহা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, "তাকে ভাববেন যে গোপাল রূপে ভগবান এসেছেন। গোপালভাবে তার যত্ন সেবা সব করবেন, ভাববেন গোপালের সেবা করে আমি ধন্য। এসব ভাব থেকে নাতির সেবা করলে আর মায়ায় বদ্ধ হবার ভয় থাকবে না। সংসারে যেটা 'আমি আমার' বোধ থেকে বদ্ধ করে, সেটাই 'তিনি তাঁর' বোধ থেকে মুক্তির উপায় হয়।"

অপর একদিন কোন ভদ্রলোক মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, কেমন করে মনকে দমন করা যায়?" মহারাজ তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন, "মনকে ধীরে ধীরে অভ্যাস দ্বারা ভগবানের দিকে একাগ্র করতে হয়। মনের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয় যাতে বাজে চিন্তা বা কুচিন্তা না আসে। যখনই মনে অন্য কোন চিন্তা আসবে তখনই মনকে ভগবানের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করতে হয়। এইরূপ অভ্যাস করতে করতে মনের দমন হয় ও সে সদ্ভাব অবলম্বন করে। ঠাকুর সরল ছিলেন। তিনি নানা ভাবে মনকে দমন করবার উপায় বলে পরে বলতেন, 'এসবেও না হলে যাতনা ভোগ করে করে শেষে মনের দমন হয় ও সৎদিকে যায়'।" এইভাবে প্রতিদিন কত ব্যক্তি তাঁহার নিকট তাহাদের সংশয় মিটাইয়া লইত।

একদিন মহারাজ শ্রীমন্দিরের মণিকোঠায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে শ্রীজগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের পরিবর্ত্তে একটী রাখাল বালক দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি তন্ময় হইয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। ইহা কি স্ব-স্বরূপ দর্শন? শ্রীমন্দিরে দর্শন করিতে গিয়া এক এক দিন এক এক ভাবে তিনি বিভোর হইয়া পড়িতেন এবং আনন্দোদ্ভাসিত বদনে হাত মুখ নাড়িয়া মাঝে মাঝে যেন তিনি কাহার সহিত কত কথা বলিতেন। ইহা কে বুঝিবে? অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করিলে এইরূপ দর্শন ও কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে, মহারাজের দিব্যসঙ্গ করিবার যাঁহারা সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

পুরীতে একদিন ফলাহারিণী পূজার রাত্রে শ্রীশ্রীমহামায়ীর পূজা হইল। সকল কর্ম্মসূচনার প্রারম্ভে তিনি ঠাকুরের ইঙ্গিত পাইতেন। তাই তিনি বলিতেন, "তাঁর ইঙ্গিত ভিন্ন আমার কিছু করবার জো নেই।"

স্নানযাত্রায় তিনি স্নান দর্শনান্তে স্নানমঞ্চে গিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামকে স্পর্শন ও আলিঙ্গন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া যাইতেন। নবযৌবনে প্রাতে সাধু ভক্তদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তন্ময়ভাবে শ্রীবিগ্রহদিগকে দর্শন স্পর্শন করিয়া বালকের স্থায় আনন্দে মাতিয়া উঠিতেন। রথযাত্রা দিবসে যাহাতে শরীর বেশ স্বচ্ছন্দ থাকে সেজন্য তিনি সকলকে অন্নাহার করিতে নিষেধ করিতেন। সামান্য জলযোগ বা ফলাহার করিয়া রথযাত্রা দর্শন করিতে তিনি সকলকে বলিতেন। মহারাজ সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্তমণ্ডলী লইয়া জগন্নাথবল্লভ মঠ হইতে রথযাত্রা দর্শন, রথরজ্জু স্পর্শ ইত্যাদি করিতেন এবং সঙ্গের সকলেই যাহাতে ইহার সুযোগ পায় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি গুণ্ডিচার বেদীর উপর শ্রীশ্রীজগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামকে দর্শন করিতে যাইতেন। বিশেষতঃ নবমীর দিন তথায় দর্শন ও প্রসাদ-ধারণের জন্য সকলকে উৎসাহিত করিয়া মহারাজ স্বয়ং সাধু ব্রহ্মচারী ও ভক্তমণ্ডলীসহ গুণ্ডিচায় বসিয়া পরমানন্দে মহাপ্রসাদ পাইতেন। পুনর্যাত্রায় তিনি রথযাত্রার মত দর্শন ও রজ্জু স্পর্শ করিতেন। বিশেষ বিশেষ পর্ব্বদিনে বা তিথিতে তিনি শ্রীমন্দিরে দর্শন করিতে যাইতেন। পুরীতে অবস্থান-কালে তিনি নিত্য প্রাতে শশী-নিকেতনের পশ্চিম পার্শ্ব হইতে খুব নিষ্ঠা ভক্তির সহিত শ্রীমন্দিরের চূড়া দর্শন ও প্রণাম করিতেন।

পুরীধামে তিনি অহর্নিশ ভাবে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। একদিন কোন সন্ন্যাসী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিলে তিনি হাত নাড়িয়া অপূর্ব্ব লাবণ্যসমুজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাঁহাকে বালকের মত সরলভাবে বলিলেন, "দেখ, দেখ, সব চৈতন্যময়—সব চৈতন্যময়।"

পুরীধামে অবস্থানকালে তথায় একটী স্থায়ী মঠ স্থাপন করিবার জন্য মহারাজের এক সময়ে ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল। ইহা জানিতে পারিয়া পরম ভক্ত রামকৃষ্ণবাবু চক্রতীর্থে সমুদ্রকূলে মঠ নির্ম্মাণের জন্য একখণ্ড প্রশস্ত জমি দান করেন। এই জমির উপরেই বর্ত্তমান রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপিত হইয়াছে।

এই নীলাচলে নবকলেবরের সময়ে নানাস্থান হইতে ভক্তমণ্ডলী তাঁহার নিকটে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্ন করিতেন। সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে শ্রীমন্দিরে দর্শন ও জপধ্যান করিতে বলিতেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহার পবিত্র সঙ্গলাভ করিতেই ভালবাসিতেন। তাঁহার গুরুভ্রাতারা অনেকেই তাঁহার নিকট মাঝে মাঝে থাকিতেন। কখন কখন তাঁহারা অনেকে একসঙ্গে মিলিত হইতেন। সে সময়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইত এবং সকলে পরমানন্দে দিন অতিবাহিত করিতেন। এই নীলাচলে অবস্থানকালে তাঁহার ভুবনেশ্বর মঠ নির্ম্মাণের কল্পনা হয় ও তজ্জন্য সকল ব্যবস্থা করেন।

ভুবনেশ্বর মঠ নির্ম্মাণের একটু ইতিহাস আছে। ইতিপূর্ব্বে পুরী হইতে ফিরিবার কালে মহারাজ তিন রাত্রি তত্রস্থ মন্দিরের বাংলায় বাস করিয়াছিলেন। সেই সময় তথাকার জলবায়ু এবং ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া তথায় একটী মঠ-প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। একদিন রাত্রিশেষে উঠিয়া বলেন যে, "বহুপূর্ব্বে জোয়ান বয়সে শরীর মন যেরূপ

স্বচ্ছন্দ বোধ হইত, এখানে সেইরূপ বোধ হইতেছে। এখানে একটু জায়গা দেখ।" ভুবনেশ্বরে মঠ নির্ম্মাণের বিশেষ ইচ্ছা থাকায় পরে জায়গা দেখিবার জন্য পুরী হইতে একবার তথায় আসেন। জমিতে একটী সুবৃহৎ আম্রকানন দেখিয়াই ঐ স্থানটী তিনি পছন্দ করিলেন এবং পুরীতে প্রত্যাগত হইয়া জমিটী লইবার ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন। উক্ত জমি খুরদা খাসমহলের অন্তর্ভুক্ত। উহার সম্মুখস্থ জমি—রাস্তার ধার পর্য্যন্ত পরে বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হয়।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় সংবাদ আসিল ভুবনেশ্বরে মঠ নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়াছে, শুধু শুভদিন দেখিয়া প্রবেশ করিলেই হয়। ৩১শে অক্টোবর মহারাজ ভুবনেশ্বরের নবনির্ম্মিত মঠের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া সাধুব্রহ্মচারীদের সহিত সানন্দে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ভক্তেরাও পরে একে একে নানাস্থান হইতে তথায় আসিলেন।

এই সময়ে ভুবনেশ্বরে দুর্ভিক্ষের বিশেষ প্রকোপ হওয়ায় মহারাজ তথায় একটী সাহায্যকেন্দ্র খুলিয়া দিলেন এবং তাঁহার শিষ্যসেবকেরা তাহার পরিচালনায় নিযুক্ত হইলেন। ভুবনেশ্বরে চিকিৎসা ও ঔষধের অভাবে তথাকার অধিবাসীরা অত্যন্ত ক্লেশ পাইত এবং কেহ কেহ সুচিকিৎসা ও ঔষধের অভাবে মৃত্যুমুখেও পতিত হইত। ইহা দেখিয়া মহারাজ রাস্তার সম্মুখে মঠের জমিতে একটী দাতব্য ঔষধালয় (Charitable Dispensary) প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন। ইহাতে ভুবনেশ্বর ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের রোগক্লিষ্ট অধিবাসীরা এবং তীর্থযাত্রিগণ অশেষ সাহায্যলাভ করিতে লাগিল। লোকের দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচন করিতে তিনি শুধু আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ

করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না—সন্ধান লইয়া দুর্দ্দশার মূল কারণ জ্ঞাত হইয়া তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিতেন।

ভুবনেশ্বরের আধ্যাত্মিক মহিমা সম্বন্ধে মহারাজ বলিতেন,"এ স্থানটী যোগভূমি, আর পুরী ভোগভূমি। ভুবনেশ্বর শিবক্ষেত্র—গুপ্ত কাশী বলে জানবে। এখানে একটু সাধন-ভজন করলে অনেক ফল পাওয়া যায়। সাধন-ভজনের বিশেষ অনুকূল স্থান। ধ্যান সহজেই জমে। এমন স্বাস্থ্যকর স্থান—ছেলেরা অন্য জায়গায় খেটেখুটে আসবে—এখানে তাদের স্বাস্থ্য ভাল হবে আর সাধন-ভজনে লেগে যাবে।" গৃহস্থ ভক্তদের তিনি মঠের আশেপাশে ছোট ছোট বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে পরামর্শ দিতেন। তিনি তাহাদিগকে বলিতেন, "সংসারে থেকে দূরে—কলকাতার কাছে এমন নির্জ্জন পবিত্র স্থানে বাস করে—নির্জ্জনে সাধন করবে। তাতে তোমাদের শরীর সুস্থ থাকবে আর অশেষ কল্যাণ হবে।"

বন্য জন্তুর উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি বিস্তৃত জমি প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া দিলেন। সাধু ব্রহ্মচারী ও অতিথি অভ্যাগত ভক্তদের স্থান সংকুলান না হওয়াতে মঠগৃহের বিস্তৃতি হইল। বাহির হইতে মঠের সুবৃহৎ প্রাচীর ও বৃহৎ ফটক দেখিলে ইহা কোনও রাজপ্রাসাদ বলিয়া বোধ হয়। একদিন তিনি জনৈক ভক্তসহ মঠের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়া দেখিতেছিলেন; ভক্তটী বিস্ময়োৎফুল্লনেত্রে মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ! ভবিষ্যতে বোধ হয় এখানে বিরাট ব্যাপার হইবে তাই বুঝি এই বিরাট আয়োজন?" মহারাজ তাহার কথা শুনিয়া আনন্দে ঈষৎ হাস্য করিলেন।

ভুবনেশ্বরের কঙ্কর মিশ্রিত প্রস্তরময় মৃত্তিকায় মহারাজ নানা ফলফুল বৃক্ষলতা বিভিন্ন দেশ হইতে আনাইয়া রোপণ করাইলেন। আশ্রমে গাছপালার প্রতি যত্ন লইতে যদি কাহাকেও দেখিতেন তবে তিনি বিশেষ আনন্দিত হইতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অল্প দিনের মধ্যেই ফলফুলে ও বৃক্ষলতার শ্যামলসৌন্দর্য্যে ভুবনেশ্বর মঠ সুশোভিত হইল এবং প্রশান্ত পবিত্র আধ্যাত্মিক হাওয়ায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। উক্ত মঠে সকলেই তাঁহার উপদেশানুযায়ী সাধন ভজন করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ এবং শান্তি অনুভব করিতে লাগিল।

তিনি প্রত্যহ সাধু ব্রহ্মচারী এবং ভক্তবৃন্দকে লইয়া নানাবিধ উপদেশ, সদালোচনা ও ভজন কীর্ত্তনে দিন কাটাইতে লাগিলেন। একদিন জনৈক সাধু প্রণামান্তে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া বলেন, "আশীর্ব্বাদ করুন যাতে শ্রী শ্রীঠাকুরের পদে ভক্তি হয়।" তিনি ঈষৎ স্থির ও গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "দেখ, নিরালম্ব দীন হীন কাঙ্গাল হতে পারলে তবে একটু ভক্তি আসে।" ধ্যানজপ সম্বন্ধে অনেক কথা বলার পর একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "খুব জপ করবে, মনে মনে সব সময়ে শ্বাস প্রশ্বাসে জপ অভ্যাস করবে। এটা ক্রমশঃ অভ্যাস হলে উহা সহজভাবে চলতে থাকে। এমন কি ঘুমের পূর্ব্বে ও পরে সেই জপই চলে।" পরে বলিলেন, "কে পড়ল দেখবার দরকার নেই, তুমি এগিয়ে চল। একটা ছেলে যদি ধ্যান জপ ঠিক ঠিক করে তো তার পুণ্যে একটা মঠ চলে যায়।" কথা প্রসঙ্গে একদিন মহারাজ বলেন, "মোটা ভাত কাপড়ের বেশী হলে মাথা চলকে যায়, বেশী ভাল নয়।"

হিমালয়স্থ মায়াবতী আশ্রমে জনৈক সেবকের যাইবার কথা স্থির

হওয়ায় তিনি তাঁহাকে বলেন, "হিমালয়ের মত উচ্চ সুরে মনটাকে বেঁধে রাখবে।"

ভুবনেশ্বর মঠে অতি সমারোহে শ্রীশ্রীকালীপূজা সম্পন্ন হইয়াছিল। মহারাজের নির্দ্দেশ মত প্রতিমা কটকে তৈয়ার হয়। নাটুবাবু নামক নিপুণ শিল্পী উহা গড়িয়াছিলেন। মহারাজ প্রতিমা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "ঠিক যেন দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর মত গড়া হইয়াছে।" নাটুবাবুকে মহারাজ আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

এই ভুবনেশ্বরের মঠে বসিয়া গড়গড়ায় তামাক টানিতে টানিতে তিনি ভাব-সমাধিতে স্থির নিস্পন্দ হইয়া যান। তৎক্ষণাৎ জনৈক ভক্ত তাঁহার অজ্ঞাতসারে ফটো তুলিয়া লইয়াছিলেন; ফটো তুলিবার সময় তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা ছিল না। তিনি এখানে শিষ্য-সেবকদের লইয়া কত আনন্দ করিতেন। তাঁহারা প্রায়ই ভজন গান গাহিয়া মহারাজকে শুনাইয়া পরম আনন্দিত হইতেন। মহারাজ সর্ব্বদা ভাবে মাতোয়ারা হইয়া থাকিতেন।

সঙ্ঘের সাধুব্রহ্মচারীরা জনহিতকর কার্য্য ও তপস্যা করিতে গিয়া প্রায়ই স্বাস্থ্যভঙ্গ করিয়া মঠে ফিরিয়া আসে। তাহারা ভুবনেশ্বরের মত স্বাস্থ্যকর স্থানে আসিয়া সুস্থ হইয়া কিছুদিন সাধন ভজন করিতে পারে এবং গৃহস্থ ভক্তগণ আশ্রমের চারিপাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাংলা নির্ম্মাণ করিয়া সাধন ভজনে নিরত থাকে—ইহাই দেখিতে মহারাজের সাধ ছিল। তিনি আবার কখনও কখনও বলিতেন, "সাধুব্রহ্মচারীরা এখানে বসে খুব সাধন ভজন করবে আর আমি দেখে খুব আনন্দ করব।" ভুবনেশ্বর মঠ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা এই সাধ বা ইচ্ছা হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিল। তিন দেহত্যাগের কয়েকদিন পূর্ব্বেও ভুবনেশ্বর

মঠের উল্লেখ করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ বলিতেন, "মহারাজ ভুবনেশ্বর মঠে নিত্য বর্ত্তমান আছেন।" মহারাজ ভুবনেশ্বরে অধিকাংশ সময়ে বালকবৎ আবার কখন গম্ভীর অথচ হাস্যময়। স্বামী সারদানন্দ বলিতেন, "আমাদের মধ্যে একমাত্র মহারাজের ভিতরেই ঠাকুরের পরমহংস-অবস্থার হাবভাব, চালচলন দেখতে পাওয়া যায়। মহারাজকে পিছন দিক থেকে দেখলে ঠাকুর বলেই মনে হত।"

ভুবনেশ্বরের উন্মুক্ত দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরে বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি আত্মভাবে বিহ্বল হইয়া কোন কোন দিন নির্জ্জন অরণ্যের ভিতরেও চলিয়া যাইতেন। কখনও একা, আবার কখনও কাহাকেও তাঁহার অনুগমন করিতে বলিতেন। তিনি কাহাকেও বলিতেন, "এই সব খোলা মাঠ দেখলে মনটা আপনা আপনি উদার ও মহৎ হয়,—তাঁর চিন্তা আসে।"

ভুবনেশ্বরে পাণ্ডা ও তথাকার দরিদ্র অধিবাসীদিগকে মহারাজ মাঝে মাঝে পরিতোষ সহকারে খাওয়াইতেন; কাহাকে বস্ত্র, কাহাকে শীতের আলোয়ান, এমনকি কাহাকে কাহাকে অর্থ সাহায্যও করিতেন। প্রেম ও কৃপা তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ ছিল। অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যের প্রেমরত্নদানেও তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। ইহাতে জাতি, কুল, ধনী ও দীনের বিচার নাই, স্থানাস্থান বা পাত্রাপাত্রের হিসাব নাই—অকাতরে বিলাইয়াই যেন তাঁহার আনন্দ। সাধু এবং সাধক ভক্তদিগের হৃদয়ে দৃঢ় প্রেরণা সঞ্চারের জন্য ব্যাকুলভাবে তিনি প্রায়ই বলিতেন, "ঈশ্বর লাভই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। সত্যি সত্যি তাঁকে লাভ করা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়—তাঁর রূপ এই চক্ষে দেখা যায়।" কতবার সাধুব্রহ্মচারী ও সাধনেচ্ছু ভক্তদের সম্বোধন করিয়া

তিনি ব্যাকুলভাবে প্রেমকরুণ স্বরে বলিয়াছেন, "এমন মানুষ জন্ম—দুর্লভ জন্ম হেলায় হারাস্ নি! এত সুযোগ সুবিধা ঠাকুর করে দিয়েছেন—এখন লেগে যা। তাঁকে ব্যাকুল প্রাণে একান্তে নির্জ্জনে ডাক দেখি! প্রাণ খুলে ডাক। ডেকে ছ্যাখ—তিনি আসবেন—তাঁকে এই চোখেই দেখতে পাবি।" আবার কখন কখন তিনি সকাতরে বলিতেন, "ডাক—ডেকে ছ্যাখ, যদি কিছু না দেখতে পাস তবে আমার গালে চড় মারিস্।" একি ভীষণ আকুলতা! মহারাজের যেন কঠোর দায়! অবতারপুরুষেরা জীবের দায়ে যেমন আপনাদের বিকাইয়া দেন, তাঁহাদের অন্তরঙ্গ পার্ষদেরাও সেই দায় ভার সানন্দে স্কন্ধে বহন করেন। মহারাজের জীবনও ইহার এক

১৯২১ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাগত হইয়া মহারাজ ভুবনেশ্বরে অধিককাল বাস করিতে পারিলেন না। পূজ্যপাদ শিবানন্দ এযাবৎ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। তিনি বিশেষ কার্য্যানুরোধে তাঁহাকে বেলুড় মঠে যাইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অগত্যা ১৯২২ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগেই তিনি বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

বেলুড় মঠে

মহারাজ যখন অন্যান্য স্থান হইতে বেলুড় মঠে প্রত্যাগত হইতেন, তখন যেন নিত্য উৎসব লাগিয়া থাকিত। কত বিভিন্ন প্রদেশের নরনারী, কলিকাতা হইতে ভক্তমণ্ডলী, বিশিষ্ট ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ ও স্কুল কলেজের ছাত্রের দল প্রায়ই তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন। মহারাজ আগমন করিলে চতুর্দ্দিকে একটা আনন্দের সাড়া পড়িত। মহারাজও ইঁহাদের দেখিয়া কত আনন্দ করিতেন।

বেলুড় মঠের প্রত্যেক স্থানেই তাঁহার পুণ্যস্মৃতি নানাভাবে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে; বৃক্ষলতা, ফলফুল, বাগান এবং মঠের ঠাকুরঘর, গৃহদ্বার—সর্ব্বত্র তাঁহার পূতস্পর্শের স্মৃতি বহন করিতেছে। মহারাজ মঠে আসিয়া প্রত্যেক স্থানে গিয়া প্রত্যেক দ্রব্যের, প্রত্যেক ফলফুলতরকারির এবং বৃক্ষলতার সংবাদ লইতেন ও তত্ত্বাবধান করিতেন; গৃহাদির অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ত্রুটী দেখিলে তাহার দিকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেন এবং মঠের সাধু ব্রহ্মচারীদের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে জ্ঞাত হইতেন। তাঁহার আগমনে এবং অবস্থানে মঠ যেন আধ্যাত্মিক রসে জীবন্ত প্রাণময় হইয়া উঠিত—সর্ব্বত্রে যেন সজীবতার চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইত।

মহারাজকে দর্শন করিলে তাঁহাকে এক প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তির আধার এবং অতীন্দ্রিয় অনুভূতির রাজ্যে সতত বিচরণশীল বলিয়া বোধ হইত। কোন্ সময়ে কোন্ ভাবের স্ফুরণ হইবে তাহা বাহিরে দেখিয়া কেহ অনুমান করিতে পারিত না। অনুভূতির বিশালরাজ্য যেন তাঁহার করতলগত, অথচ তাহা যেন স্বাভাবিকভাবেই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। ইদানীং কোন উদ্যম বা চেষ্টা নাই, কোন উৎকট তপস্যা নাই, কোন বাহ্য অনুষ্ঠান বা উদ্দীপনার হেতু নাই অথচ শ্বাস প্রশ্বাসের মতই ব্রহ্মানন্দ তাঁহার সম্ভোগের বস্তু! কথা প্রসঙ্গে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "মন এখন লীলা হইতে নিত্য এবং নিত্য হইতে লীলায় আসে।" সম্মুখে গড়গড়ায় তামাক টানিতে গিয়া তিনি নির্ব্বাক নিস্পন্দ সমাধি-মগ্ন। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত তাঁহার দেহ মন যেন কোন অপার্থিব বস্তুতে গঠিত। প্রেম, পবিত্রতা, সরলতা ও সাধু প্রবৃত্তির তিনি ছিলেন মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। তাঁহার একদিকে সহজ বালস্বভাব, অপরদিকে অপূর্ব্ব গম্ভীরভাব। তিনি যখন নিজের ভাবে মত্ত থাকিয়া ভাবগম্ভীর অবস্থায় বসিয়া থাকিতেন, তখন তাঁহার নিকট কেহ অগ্রসর হইতে সাহস পাইত না এবং কেহ কোন প্রশ্ন করিতে আসিলেও নীরব হইয়া থাকিত; আবার কেহ কিছু বলিতে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া যাইত। যখন তিনি একাকী মঠের প্রাঙ্গণে বা কোন স্থানের উন্মুক্ত দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরে গম্ভীরভাবে পাদচারণা করিতেন তখন তাঁহাকে দেখিলে তেজোদীপ্ত নরসিংহের ন্যায় বোধ হইত।

বাস্তবিকই মহারাজের আকৃতিতে একটী অনুপম মাধুর্য্য ও প্রবল আকর্ষণী-শক্তি ছিল। বয়সের সঙ্গে ইহা হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মহারাজ যখন যেখানে যাইতেন, মানুষ তাঁহাকে দেখিলে স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হইত।

মহারাজের মুখমণ্ডল প্রায়ই ভাবজ্যোতিতে পরিপূর্ণ থাকিত, সর্ব্বদাই আনন্দময়—কখনও বালকের মত হাস্যকৌতুক ও ক্রীড়ারঙ্গে মত্ত আবার কখনও নৃত্যবাদ্যে উৎফুল্ল। ঘনীভূতভাবের প্রভাবে তিনি কখনও কখনও বাহ্যসংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিতেন। তন্ময় হইয়া কখনও আচার্য্যভাবে বলিতেন, "সাধন কর, সাধন করতে করতে কত কি দেখতে পাবে। কত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য, কত দেবদেবী, কখনও রজত সাগর—আবার কখনও জ্যোতি-দর্শন—স্থির জ্যোতি-দর্শন। সচ্চিদানন্দের ইতি নাই—তার চেয়ে—তার চেয়ে—তার চেয়ে আছে। লাগ—লেগে যাও—খুব রোক করে তাঁর নাম নিয়ে লেগে যাও।"

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে দর্শন করিলেই মহারাজ বালকভাবে তন্ময় হইয়া যাইতেন। তিনি বলিতেন, "মাকে চেনা বড় শক্ত। ঘোমটা দিয়ে যেন সাধারণ মেয়েদের মত থাকেন অথচ মা সাক্ষাৎ জগদম্বা। ঠাকুর না চিনিয়ে দিলে আমরাই কি মাকে চিনতে পারতুম।" শ্রীশ্রীমার স্নেহের অমৃতধারা পাপী পুণ্যবান, সাধু অসাধু, বলবান দুর্ব্বল, ধনী দরিদ্র, মানী অমানী, এমন কি সমাজত্যক্ত পতিত পতিতা সকলের উপর বর্ষিত হইত। কেহই তাঁহার অপার করুণা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে ঠাকুরের ত্যাগী অন্তরঙ্গ ভক্তদের তিনি সাক্ষাৎ মাতৃরূপিণী স্নেহময়ী জননী। কিন্তু তাঁহার সকল

সন্তানদের মধ্যে মানসপুত্রের একটু স্বাতন্ত্র্য তিনি রাখিতেন। কাশী-ধামে একবার তিনি তাঁহার ত্যাগী সন্তানদের বস্ত্র দান করিয়াছিলেন। সকলকে সুতানির্ম্মিত কাপড় দিলেন, কেবল মহারাজের জন্য একখানি রেশমী কাপড়ের ব্যবস্থা হইল। এই বিষয়ে তাঁহাকে কেহ প্রশ্ন করিয়াছিল, "মা, সবাই তো আপনার সন্তান, তবে রাখাল মহারাজকে কেন রেশমী কাপড় দিলেন ?" মা অমনি বলিয়া উঠিলেন, "রাখাল যে ছেলে।"

পুরী, মাদ্রাজ বা বাহিরের অন্য যে কোন স্থান হইতে বেলুড় মঠে মহারাজ ফিরিয়া আসিলে বা পূজাদি বিশেষ কোন উপলক্ষে শ্রীশ্রীমা যদি কলিকাতায় থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে মঠে আমন্ত্রণ করিয়া তিনি যথোচিত ভক্তিসহকারে তাঁহার অর্চ্চনা করিতেন। তখন চারিদিকে আনন্দোৎসব চলিত ও ঠাকুরের ভোগের জন্য বিবিধ আয়োজন হইত। মহারাজ ভাবে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। এতদুপলক্ষে কখনও তিনি কালীকীর্ত্তনের সঙ্গে দাঁড়াইয়া মধুর নৃত্য করিতেন, কখনও চামর হাতে আরতির সময় বীজন করিতে করিতে ভাবোন্মত্ত হইয়া পড়িতেন, আবার তিনি বালকের মত সকলের সহিত স্ফূর্ত্তি ও আমোদ করিয়া বেড়াইতেন। মার দর্শনে বা মার আগমনে মহারাজ সহজ ভাবে থাকিতেন না, তখন তিনি ভাবমুখে বালকের ন্যায় হইয়া যাইতেন।

মঠে দুর্গোৎসব বা শ্যামাপূজা প্রভৃতি যতকিছু আনুষ্ঠানিক পূজা সকলই মার নামে সংকল্প করা হইয়া থাকে। পূজার পূর্ব্বে প্রত্যেক বারে তিনি শ্রীশ্রীমার অনুমতি গ্রহণ করিতেন। ঠাকুরের জন্মতিথি উৎসবে মা যদি কখনও বেলুড় মঠে আসিতেন তবে তাঁহার আর আনন্দের

সীমা থাকিত না। একবার ঠাকুরের জন্মতিথি দিবসে মা বেলুড় মঠে আসিবেন শুনিয়া ফটক পত্র পুষ্পে সাজান হইয়াছিল এবং তোরণের উপর বাংলা অক্ষরে লেখা ছিল "স্বাগতম্"। ফটক হইতে মঠের প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীমার গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। প্রাঙ্গণ কিছু কর্দমযুক্ত ছিল বলিয়া মহারাজ সাধু ও ব্রহ্মচারীদিগকে উক্ত স্থানে রাঙ্গা সালু বিছাইয়া দিতে বলিলেন। মা তাহার উপর দিয়া চলিয়া আসিয়া মঠে প্রবেশ করিয়া ভিতর প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বারে পৌঁছিলে মহারাজ তথায় গিয়া সাষ্টাঙ্গভাবে প্রণত হইলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ভিতরে লইয়া আসিলেন। সেবকেরা সেইদিন মহারাজকে রেশমী কাপড় পরাইয়া দিয়াছিলেন। সেই সময় মহারাজের মুখ চোখ দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন বালক তাহার মাকে পাইয়া পরমানন্দে ভাসিতেছে। মা যখন ঠাকুর ঘরে যাইবার জন্য সিঁড়ির উপরে উঠিতেছিলেন, তখন তাহার চাতালে ঠাকুরের পূজক আত্মানন্দ (শুকুল মহারাজ) মাকে কর্পূর আরতি করিলেন। ঠাকুর ঘরের ভিতরে গিয়া মা ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া নিস্তব্ধভাবে কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিলেন। পরে শয়ন ঘরে ধ্যানস্তিমিতভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া মা ঠাকুর ঘরের সম্মুখস্থ ছাদের উপর দিয়া মঠগৃহের দ্বিতলে পশ্চিম দিকের ঘরে গিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন।

সেদিন বেলা সাড়ে এগারটার সময় মঠপ্রাঙ্গণে আন্দুলের কালী-কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। মা দোতলার উপর হইতে ঘরের খড়খড়ি তুলিয়া কীর্ত্তন গান শুনিতেছিলেন এবং উৎসবের দৃশ্য সব দেখিতে-ছিলেন। কিছুক্ষণ কীর্ত্তন চলিলে পূজ্যপাদ প্রেমানন্দ আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া মহারাজকে ধীরে ধীরে কীর্ত্তনের আসরে লইয়া

গেলেন। গান শুনিয়াই মহারাজ ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। যখন প্রেমানন্দ তাঁহাকে আসরে লইয়া যান তখন তিনি কোন ওজর আপত্তি করেন নাই, বালকের মত আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইয়াই গেলেন। তথায় আসিয়াই তিনি গানের সঙ্গে মধুর ভাবে অনুপম নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি গভীর ভাবে এত মগ্ন হইলেন যে, নাচিতে গিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন। জনৈক শিষ্য তৎক্ষণাৎ ভয়ে পশ্চাৎ হইতে বাহুর আবেষ্টনের মধ্যে মহারাজকে ধরিয়া রাখিলেন যাহাতে পড়িয়া গিয়া তাঁহার শরীরে আঘাত না লাগে। কিছু সময় অতীত হইলেও মহারাজের ভাবের কোন উপশম হইল না। ক্রমশঃ যেন বাহ্যসংজ্ঞা হারাইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ তালে তালে অপূর্ব্ব নৃত্যের ভঙ্গিমায় দুলিতে লাগিল। মহারাজের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া পূজ্যপাদ সারদানন্দ তাঁহাকে আর তথায় না রাখিয়া কীর্ত্তনের আসর হইতে বাহির করিয়া আনিবার ইঙ্গিত করিলেন।

ধীরে ধীরে গানের আসর হইতে মঠের নিম্নতলের দক্ষিণ পশ্চিমের ঘরে আনিয়া মহারাজকে একটি খাটের উপর বসাইয়া দেওয়া হইল। সেইরূপ ভাবাবস্থায় মহারাজ বহুক্ষণ বসিয়া আছেন শুনিয়া সারদানন্দ সেবকদিগকে তাঁহার সম্মুখে গড়গড়ায় তামাক দিতে বলিলেন। তামাক দেওয়া হইলে সেবকেরা বলিল, "মহারাজ, তামাক দেওয়া হয়েছে।" কিন্তু তিনি পূর্ব্বের মত জড়বৎ বসিয়া আছেন—একটুও নড়িলেন না। তাঁহার চক্ষু তখন অর্দ্ধ-নিমীলিত এবং বদনমণ্ডল দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত। দেখিতে দেখিতে আরও কিছু সময় কাটিয়া গেল কিন্তু মহারাজের ভাবের উপশম হইল না।

প্রেমানন্দ সেবকদের নিকট ইহা শুনিয়া এবং তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত ও ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বিশেষ মা আসিবেন বলিয়া সেদিন প্রাতঃকাল হইতে মহারাজ বিন্দুমাত্র জলগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার জন্য জলখাবার আনা হইল। উহা সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বলা হইল, কিন্তু তাঁহার কোন হুঁশ নাই। কে যেন কাহাকে বলিতেছে! তাঁহার এইরূপ দীর্ঘকাল ব্যাপী গভীর ভাবসমাধি দেখিয়া গুরুভ্রাতাগণ সকলেই চিন্তিত হইলেন। অবশেষে মাকে সমুদায় সংবাদ জানান হইল। মা এই কথা শুনিয়া পরমানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "ওজন্য কোন চিন্তা নাই।" কিছুপরে মা নিজে কিছু মিষ্টান্নাদি প্রসাদ করিয়া তাহা অমনি মহারাজের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। মহারাজের সম্মুখে সেই প্রসাদ রাখা হইল। গুরুভ্রাতারা উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে জানাইলেন, "মা তোমার জন্য প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন, মহারাজ!" কিন্তু মহারাজ পূর্ব্ববৎ নিশ্চল জড়ের ন্যায় বসিয়া আছেন। কে কি বলিতেছে, কে বা কাহারা তাঁহাকে ডাকিতেছে সে বিষয়ে তাঁহার কোনও সংজ্ঞা নাই। মহারাজের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া মঠের সকলেই অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া মাকে পুনরায় জানাইলেন।

মা স্থিরভাবে সব শুনিলেন। পরে তিনি ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া মঠের ভিতরকার সিঁড়ি দিয়া নীচে যে ঘরে মহারাজ বসিয়াছিলেন তথায় উপস্থিত হইলেন। পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে মা তাঁহার ডান হাতটী প্রসারিত করিয়া মহারাজের দক্ষিণ বাহুমূল স্পর্শ করতঃ স্নেহ ভরে ডাকিয়া বলিলেন, "ও রাখাল

প্রসাদ দিয়েছি,—খাও।” সুপ্তোত্থিতের মত মহারাজের যেন হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল। তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন—মা স্বয়ং তাঁহার হস্তস্পর্শ করিয়া অতি স্নেহকোমল কণ্ঠে ডাকিতেছেন। আনন্দে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল। তিনি উঠিয়া অমনি মার পাদ-বন্দনা করিলেন। মা চলিয়া গেলেন। সেই প্রসাদ ধারণ করিয়া তিনি সহজভাবে পরমানন্দে ভাসিতে লাগিলেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ২৬শে নভেম্বর মহারাজ যখন বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন তখন সাধুব্রহ্মচারীদের দেখিয়া প্রেমানন্দ স্বামিজীকে তিনি বলিলেন, “ছেলেদের ধ্যান তপস্যা সাধন ভজন কোথায়? আর এদের স্বাস্থ্যও তো ভাল দেখছি না!” পরে মহারাজ নিয়ম করিয়া দিলেন যে, মঠের সকল সাধু ও ব্রহ্মচারীরা রাত্রি চারিটার সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া সাড়ে চারিটার মধ্যে জপধ্যানে বসিবে। চারিটা বাজিবার দশ মিনিট পূর্ব্বে মঠে ঘণ্টাধ্বনি হইবে। জপধ্যান শেষ করিয়া ভোর সাড়ে ছয়টার সময় তাঁহার নিকট সকলে আসিবে। সেখানে সমবেতভাবে প্রতিদিন ভজন ও স্তোত্রাদি আবৃত্তি হইবে। তিনি প্রায়ই এইসব শুনিতে শুনিতে ভাবে একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন। তাঁহার সমগ্র মুখমণ্ডল সেই সময়ে দিব্যভাবকান্তিতে উদ্ভাসিত হইত। সাধন ও অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা নিগূঢ় উপদেশ-বাণী তৎকালে তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইত। সেই প্রাণস্পর্শী মহাশক্তি সমন্বিত কথা শুনিয়া সকলের অন্তরে সাধন ভজনের জন্য একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত। তাঁহার সেই তত্ত্বকথা শুনিয়া অনেকেই অনুভব করিতেন যে, তাঁহাদের দেহ ও মন যেন এক অভিনব শক্তির সঞ্চারে সতেজ ও বলীয়ান হইয়া উঠিতেছে,

মনের সব সংশয় যেন ছিন্ন হইতেছে এবং এক অপূর্ব্ব ভাবের প্রেরণায় তাঁহাদের হৃদয়ে একটা আনন্দের প্রবাহ বহিতেছে। কাহারও কোন ব্যক্তিগত প্রশ্ন বা সংশয় থাকিলে তাহার উত্তরও তাঁহারা সেই তত্ত্বোপদেশের মধ্যেই পাইতেন। যাঁহারা সেই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকেন।

তিনি সকলকে সাধন ভজন করিতেই সতত উৎসাহ দেন বলিয়া কাজকর্ম্ম করিবার লোক পাওয়া যায় না, এই ভাবের কথা একদিন তাঁহার কর্ণগোচর হয়। তিনি তদুত্তরে বলেন যে, "কাজ সকলকেই কিছু করতে হবে বৈকি। আমি কিন্তু সাধন ভজন করতে বলবই। কাজ করতে কি আর বলতে হয়? নিজের চাড়েই কাজ করে। সাধন ভজনে কি সহজে মন যায়? যারা সব ছেড়ে এসেছে তাদের কাজটাই ত সব নয়।"

একদিন প্রাতঃকালে মহারাজের নিকট হইতে সাধুব্রহ্মচারীদের নির্দ্দিষ্ট কাজে আসিতে দেরি হওয়ায় প্রেমানন্দ উপরে গিয়া দেখেন সকলেই স্থির ও শান্তভাবে মহারাজের ঘরে বসিয়া আছেন। মহারাজ তাঁহাকে উঁকি মারিতে দেখিয়া "বাবুরামদা এসেছ কেন" এই প্রশ্ন করিলে তিনি যুক্তকরে বলিলেন, "মহারাজ, ঠাকুর সেবা আছে যে।" এই কথা শুনিবামাত্র মহারাজ ত্রস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "যা যা তোরা যা, ঠাকুরের কাজ রয়েছে।"

আর একদিন প্রেমানন্দ স্বামী একটু উত্তেজিত ভাবে তাঁহার ঘরে আসিয়া দুই ভাইয়ের (দুইজন মঠের সাধু) পরস্পর ঝগড়া বিষয়ে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া মহারাজকে বলিলেন। মহারাজ স্থিরভাবে

সব শুনিয়া বলিলেন, "বাবুরাম দা, এরা ঠাকুরের আশ্রয় নিয়েছে, তোমাদের কাছে রয়েছে, এদের সুবুদ্ধি দাও।" প্রেমানন্দ অবিলম্বে আগ্রহস্বরে বলিলেন, "তোমাকে, রাজা, তাই দিতে হবে।" তিনি উচ্চৈঃস্বরে মঠের সকলকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওরে, কে কোথায় আছিস, এখানে আয়, মহারাজের আশীর্ব্বাদ নে।" একে একে সকলে আসিয়া মহারাজের পাদবন্দনা করিতে লাগিলেন। প্রত্যেকের মাথায় হাত দিয়া তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকলের মন তৎক্ষণাৎ শান্ত হইল।

মহারাজের দীক্ষাদান বিষয়ে অতি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য দেখা যাইত। দীক্ষা দিবার সময়ে তাঁহার অপূর্ব্বভাবের আবেশ হইত। কাহাকেও দীক্ষা দিতে আসনে বসিয়া তিনি ধ্যানস্থ হইতেন এবং উঠিয়া আসিয়া তাহাকে বলিতেন যে, "তোমার গুরু অন্যত্রে আছেন—সেখানে দীক্ষা হবে।" আবার তিনি কাহাকেও তাঁহার অভীষ্ট দেবতা বলিয়া দিতেন—"ইনিই তোমার ইষ্ট।"

মহারাজ প্রথমবার মান্দ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর দুইজন ভক্তকে দীক্ষা ও অভিষিক্ত করিবেন বলিয়া আয়োজন করিতে বলিলেন। সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত হইয়াছে সংবাদ পাইয়া তিনি মূল কর্ম্ম করিতে ধ্যান ঘরে আসিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। কোনও পূর্ণাভিষিক্ত শিষ্যকে তিনি মন্ত্রপাঠ করিতে বলিলেন। মন্ত্রোচ্চারণ করিবামাত্রই তিনি "আহা! আহা! মা, মা দয়াময়ী ব্রহ্মময়ী" বলিতে বলিতে যেন চমকাইয়া উঠিতে লাগিলেন। মন্ত্র উচ্চারণ করিতে গিয়া তাঁহার জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল। অর্দ্ধেক হয়ত উচ্চারিত হইল আবার গভীর সুপ্তি

ঘোরের ন্যায় মগ্ন হইয়া পড়িলেন। এরূপ অবস্থা দেখিয়া মন্ত্রপাঠক শিষ্যটী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। অভিষেক ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে এবং মন্ত্রপাঠ সম্পূর্ণ হইতে অন্ততঃ আরও পনর মিনিট লাগিবে, অথচ তাঁহার ঐরূপ অবস্থায় কার্য্যটী কি করিয়া সম্পূর্ণ হইবে ইহাই শিষ্যটী ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া মাতালের ন্যায় আড়ষ্টভাবে শিষ্যকে বলিলেন, "ফের আবার বল্।" পুনর্ব্বার তিনি মন্ত্রোচ্চারণ করিলে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। এইভাবে প্রত্যেক মন্ত্রই অত্যন্ত ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। যাহা-দিগকে অভিষিক্ত করিতেছিলেন তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শিষ্য দেখিলেন যে, তাহাদের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়াছে এবং অবিরল ধারে তাহারা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। এইভাবে অভিষেক ক্রিয়ানুষ্ঠান শেষ হইল। কার্য্যশেষে তিনি আসন ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে মহারাজের নিকট দীক্ষা লওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার ছিল। এই কথা উল্লেখ করিয়া মা একদিন বলিয়াছিলেন, "রাখাল কি কচ্ছে? সে কেন দীক্ষা দেয় না?" কলিকাতায় আসিয়া মহারাজ 'রামানুজের' প্রথম অভিনয় দেখিতে যান। রামানুজ আচণ্ডালে নাম বিলাইতেছেন এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তিনি অবিরত ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন। এই 'রামানুজ' নাটক দেখিবার পর হইতেই তিনি কৃপার ভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন। দলে দলে ভক্তগণ দীক্ষা লইতে লাগিল। একদিন মঠে বহু ভক্ত দীক্ষা লইতেছিল। দীক্ষা কর্ম্মাদি শেষ হইলে জনৈক শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "আমার মনে আর এখন কিছু নেই, সমস্ত ধুয়ে গেছে। এখন মনে হয়, যে

আসবে তাকেই তাঁর নাম দিয়ে যাব। এতে মঙ্গল হবেই।" শিষ্য বলিলেন, "সে আপনার কৃপা।" মহারাজ আনন্দে হাসিতে লাগিলেন।

মেয়ে ভক্তদের সম্বন্ধে মহারাজ বলিতেন—"মেয়েদের অতি সহজেই দর্শনাদি হয়। একটু সাধন ভজন করলেই তাদের ভাবভক্তি খুলে যায়। তাদের ভাবভক্তির জোর বেশী।" অন্য একদিন তিনি বলেন, "কোন কোন মেয়েরা তাদের দর্শনাদির কথা বলে, আমি শুনে অবাক হয়ে যাই। ঠিক ঠিক সাধন ভজন করলে তবে এ রূপ দর্শনাদি হয়। আসলে হচ্ছে ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতার জোরে সব মনটা তাঁতে যায়, বাকি যত কিছু পুঁছে যায়, এমন কি নিজের অস্তিত্বও ভুল হয়ে যায়। এই অবস্থায় দর্শনাদি সহজ হয়। সাধারণ লোকেরা ভাবভক্তি ব্যাকুলতার অভাবে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারে না। ঠাকুর যেমন বল্‌তেন, 'লাল তপ্ত লোহায় এক ফোঁটা জল, পড়তে না পড়তে উবে যায়'।"

ভক্ত ও শিষ্যদের প্রতি তাঁহার অসাধারণ ভালবাসা ছিল। তিনি তাহাদের শুধু পারলৌকিক মঙ্গল সাধন করিতেন না, তাহাদের ইহলৌকিক কায়িক বাচিক ও মানসিক উন্নতিরও সম্যক বিধান করিতেন। তিনি তাহাদের সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা খুঁটিনাটি সব জানিয়া লইয়া পরামর্শ দিতেন। গৃহিভক্তদের মধ্যে কাহারও আর্থিক ক্লেশ ঘুচাইবার জন্য কাহাকেও বলিয়া চাকরি বা কাজ জুটাইয়া দিতেন, এমনকি নিজেও কখন কখন অর্থ সাহায্য করিতেন। প্রত্যেকেই মনে করিত, "মহারাজ আমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন।" ইহাদের মধ্যে যাহারা দূরে থাকিত তাহাদের প্রত্যেকের তত্ত্ব লইতেন। একদিন তিনি তাঁহার সেবকদের কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন—"তোরা সব সময় আমার কাছে থাকিস্ আর তুই এক ছিলিম তামাক সাজিস বলে যারা দূরে

আছে তাদের চেয়ে তোদের বেশী ভালবাসি মনে করিস ?" অন্য একদিন তিনি বলিলেন, "আমি ভালবাসি যদি জানতেই পারলে তাহলে আর কি ভালবাসি !"

শিষ্য সেবকদের একদিন তিনি বলেন, "দেখ্ আমি যখন রাগ করব, তোরা যেন রাগ করিস্ নি। তোরা যখন রাগ করবি আমি তখন খুব ঠাণ্ডা হয়ে থাকব, দুইজনে একসঙ্গে রাগ করলে মুশকিল হয়ে যায়।"

তিনি বলতেন, "কে কি রকম, সব বুঝতে পারি, কাহাকেও কিছু বলি না পাছে মনে কষ্ট পায়। উপায় হচ্ছে love and sympathy for all (সকলের জন্য প্রেম ও সহানুভূতি), আর ছোট ছোট দোষ overlook (উপেক্ষা) করা। মন্দকে যদি ভাল করতে না পারা গেল তাহলে আর কি হল ?

"খুব সহ্যগুণ রাখবে। সহ্য করলে ক্রোধ পালিয়ে যায়। সহ্য করার চেয়ে সংসারে আর কিছু নেই। ঠাকুর বলতেন, 'যে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।' সমস্ত প্রাণ দিয়ে সহ্য করবে। বিনীত ভাব জীবন গঠনের পরম সহায়। 'নীচু জায়গায় জল জমে, উঁচু থেকে গড়িয়ে যায়।' যে বিনয়ী তার মিষ্ট ব্যবহার প্রভৃতি সদ্গুণ আপনি ফুটে ওঠে।

"কাজের সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ মনন করতে হয়। প্রথমে এটা না পারলেও অভ্যাস করলেই যায়। চেষ্টা ছাড়তে নেই। 'নূতন বাছুর দাঁড়াতে গিয়ে কতবার পড়ে যায় তবু ছাড়ে না। শেষে দাঁড়াতে শেখে।' বেশী নিষ্ঠা বা তোড়জোড় করে সাধনভজন করতে গেলে ঐসব দিকেই মন জড়িয়ে পড়ে। আসলে প্রাণের

টান ও ব্যাকুলতা থাকলেই ঠিক ঠিক কাজ হয়। 'গরুর খাবারে পচাপাচকো যাই থাক না কেন খোলের ছড়া থাকলে সব হাঁস হাঁম করে খেয়ে ফেলে।' আরাধনায় আন্তরিকতা থাকলেই তাঁর কাছে পৌঁছে আর কিছুর অপেক্ষা থাকে না। তিনি ভাবগ্রাহী।"

একবার জনৈক সেবকের বিরুদ্ধে অন্য দুই তিন জন সেবক তাঁহার নিকট নানাবিধ অভিযোগ জানাইলে তিনি স্থিরভাবে সমুদায় শুনিয়া বলেন, "দেখ আমার চেয়ে অনেক বড় বড় সাধু আছেন, তোমাদের ইচ্ছা হয় তাঁদের কাছে যেতে পার, আমায় সকলকে নিয়ে থাকতে হবে।"

পূজ্যপাদ প্রেমানন্দ ও মঠের সাধুব্রহ্মচারীদের লইয়া মহারাজ আটপুরে বেড়াইতে যান। এক সপ্তাহ তথায় আনন্দে কাটাইয়া কলিকাতায় তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন।

মহারাজ একবার মাহেশের রথ দেখিতে গিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে সুপ্রসিদ্ধ পোষাক বিক্রেতা ৺ক্ষেত্রমোহন দের পুত্র কৃষ্ণবাবু একখানি ষ্টিমারের ব্যবস্থা করেন। বাগবাজার গোলাবাড়ী জেটী হইতে ষ্টিমারখানিতে মহারাজ সদলবলে আরোহণ করিলেন এবং বেলুড় মঠের সম্মুখে জয়ধ্বনিসহ উহা দাঁড়করাইলে মঠ হইতে কয়েকজন সাধুব্রহ্মচারী নৌকাযোগে তাহাতে উঠিলেন। সর্ব্বসমেত প্রায় ৬০ জন সাধুব্রহ্মচারী ও ভক্ত মহারাজের সহিত মাহেশে রথ দেখিতে যান। ষ্টিমারে ভজন গান চলিতে লাগিল। মাহেশে পৌঁছিয়া দর্শনাদি ও রথটানা এবং ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ ধারণান্তে ষ্টিমারযোগে মহারাজ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

কঠোর তপশ্চর্যায় পূজ্যপাদ তুরীয়ানন্দের শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। একদিন পুরীধামে সমুদ্রে স্নান করিয়া ফিরিবার পর

কানের যন্ত্রণায় অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। পরে ইহা কঠিন আকার ধারণ করে। মহারাজ তাঁহার রীতিমত চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য বড় উদ্বিগ্ন হইলেন। ভাগ্যক্রমে তখন খ্যাতনামা ডাক্তার এস বি মিত্র পুরীধামে আসিয়াছিলেন। তাঁহার একান্ত যত্নে ও কয়েকবার অস্ত্রোপচারের পর পীড়ার বেগ প্রশমিত হইল। ডাক্তার মিত্রের সঙ্গেই মহারাজ তুরীয়ানন্দকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

এবারে মহারাজ তুরীয়ানন্দ স্বামীকে লইয়া উদ্বোধন মঠে উঠিলেন। মা তখন জয়রামবাটীতে। প্রেমানন্দ স্বামিজী পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়া বলরাম-মন্দিরে আসিয়া কালাজ্বরে মুমূর্ষু শয্যায় শায়িত। ভক্তেরা দলে দলে মহারাজকে দর্শন করিতে আসিত। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ভগবদ্‌প্রসঙ্গ তুলিয়া কত উচ্চ অনুভূতির কথা বলিয়া যাইতেন। সারদানন্দ স্বামীজি কখনও কখনও একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া মহারাজের এই অতুলনীয় প্রসঙ্গ ও আলোচনা শুনিতেন। কোন কোন দিন তিনি আত্মহারা হইয়া ঠাকুরের জীবনের ঘটনা ও বিভিন্ন অনুভূতির কথা বলিতেন। হঠাৎ সে সময়ে যদি তাঁহার সারদানন্দের দিকে দৃষ্টি পড়িত অমনি বালকের মত হাসিয়া তিনি বলিতেন, "না আর বলা হবে না। শরত মহারাজ বইতে ছাপিয়ে দিবে।"

পূজ্যপাদ প্রেমানন্দকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দেওঘরে পাঠাইতে ডাক্তারেরা পরামর্শ দিলেন। তিনি তথায় চলিয়া যাইবার কয়েকদিন পরে মহারাজ বলরাম-মন্দিরে গিয়া রহিলেন। দেওঘরে প্রেমানন্দের অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকেই চলিতে লাগিল। কোনও উপকার বা উন্নতি না দেখিয়া তাঁহাকে পুনরায় কলিকাতায় বলরাম-মন্দিরে

আনা হইল। প্রেমানন্দের দেহত্যাগের পূর্ব্বরাত্রে মহারাজ তুইটী অশরীরী মূর্ত্তিকে পশ্চিম দিকের সিঁড়ির নিকট দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিলেন। পরদিন প্রেমানন্দের আর জীবনের আশা রহিল না। তাঁহার মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া মহারাজ অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবুরাম দা, বাবুরাম দা—ঠাকুরকে মনে আছে তো?" তিনি মহারাজের দিকে তাকাইয়া শুধু ঈষৎ হাসিলেন। ঠাকুর যে তাঁহার শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে প্রতি রক্তবিন্দুর সহিত মিশিয়া আছেন। রামকৃষ্ণ নাম শুনিতে শুনিতেই তিনি মহাসমাধিতে বিলীন হইলেন। ব্রহ্মানন্দ বালকের মত ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

ভুবনেশ্বর মঠে অবস্থানকালে কাশীধামে স্বামী অদ্ভুতানন্দ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এপ্রেল মাসে দেহত্যাগ করায় মহারাজ বড়ই মুহ্যমান হইয়াছিলেন এবং মে মাসে কলিকাতায় তাঁহার অনুগত ভক্ত রামকৃষ্ণ বসুর অকালমৃত্যুর সংবাদে প্রায় সারাদিন তিনি মৌন ও স্তব্ধভাবে কাটাইয়াছিলেন।

মহারাজ মাঝে মাঝে উপদেশছলে মঠের সাধুদিগকে বলিতেন, "যে যতই ছোট হোক কাউকে অবজ্ঞা করতে নেই।" এই বলিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কথিত একটী দৃষ্টান্ত দিতেন। কোনও গভীর অরণ্যে এক দাবানল জ্বলে উঠেছিল। সেই জঙ্গলের ধারে একটা বড় গাছের শাখায় অনেকগুলি পিঁপড়ে বাসা করেছিল, তারা দেখলে তাদের বাঁচবার আর উপায় নেই। তখন তলায় চারদিকে আগুনে ঘিরেছে। এমন সময়ে একটী হাতী দাবানল থেকে বেরিয়ে সেই গাছটীর নিকটে দিয়ে যাচ্ছে দেখে তাকে পিঁপড়েরা বল্লে,—ভাই

তুমি তো নিরাপদে দাবানল থেকে বেরিয়ে নিজের জীবন বাঁচিয়েছ। আমরাও সবংশে বাঁচি যদি তুমি শুঁড় দিয়ে এই ডালটা ভেঙ্গে দাবানলের বাইরে ফেলে দাও। হাতীটা এসে দাঁড়াল এবং তাই করলে। কিছুকাল কেটে গেল। পরে পিঁপড়েরা একদিন জঙ্গলের ভিতর থেকে একটা কাতরধ্বনি শুনতে পেলে। স্বরটা যেন তাঁদের চেনা চেনা ঠেকলো। সারবন্দী হয়ে এগিয়ে তারা দেখলে সেই হাতীটা যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করছে। কিছু বুঝতে না পেরে তারা তার শুঁড়ের ভিতর দিয়ে গিয়ে দেখে যে হাতীর মাথায় একটা কীট আছে যার দংশনে হাতী অস্থির হয়েছে। এই দেখে তারা সকলে মিলে কীটকে টুকরা টুকরা করে কেটে বের কল্লে। হাতীও যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পেলে। কার দ্বারা কি উপকার হয়—তা কে বলতে পারে ?

শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় তিনিও অত্যন্ত সহজ সরলভাবে ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইতেন। কখনও ঠাকুরের কথা এবং কখন বা নিজ অনুভূতির বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলিতেন। নীচে দুই চারিটী দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।

"ঠাকুর বলতেন, 'প্রাণরোধে মনের রোধ হয়, আর মন রোধ হলে প্রাণের রোধ হয়—একটা হঠযোগ আর একটা রাজযোগ।'

"জোর করে সংসার ত্যাগ হয় না। ভোগের বাসনা থাকতে ত্যাগ করলে কষ্ট পেতে হয়। ঠাকুর বলতেন, 'ঘায়ের কাঁচা ছাল তুললে রক্ত পড়ে, আর ছাল শুকিয়ে আপনি খসে পড়লে কো'ন কষ্ট থাকে না।'

"তাঁকে সব দিয়েছি,—তিনি যেমন রাখুন, যেখানে ইচ্ছে কাটুন। আমি তোমার—একবার ঠিক ঠিক বললেই সব হয়ে যাবে। তোমার যা ইচ্ছে কর।

"হীরে কিন্‌তে এসে হীরে পেলাম না বলে কি জীরে কিনে নিয়ে যেতে হবে? মোহরকে মোহর বলি তাই এত দাম, নইলে এক কড়া কাণা কড়ির দামও নাই।

"জগতের দিক দিয়ে দেখতে গেলে সব দিকে সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না, ভগবানের দিক দিয়ে দেখলে তবে সব দিকে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

"ভোগ ভোগ লোকে বলে, সবাই ভোগ করতে জানে কি যে ভোগ করবে? দেবতা না হলে ভোগ করতে পারে না। দেবতা হবার আগে যে ভোগ সে সব পশুর ভোগ। আগে দেবতা হও তারপর ভোগ কর্‌বে।

"শুদ্ধভাব আশ্রয় করলে মন্দ কিছু স্পর্শও করতে পারে না। মন্দটা শুদ্ধভাবের কাছে আসবার আগেই শুদ্ধ হয়ে যায়।"

মহারাজের সংকলিত শ্রীশ্রীঠাকুরের কতকগুলি উপদেশ প্রথমতঃ উদ্বোধনে প্রকাশিত হয়। পরে সাধারণের হিতার্থে আরও উপদেশ সংযোজিত হইয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে উহা মুদ্রিত হয়। বইখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও তত্ত্বে অতুলনীয়। সমগ্র উপনিষদের সার যেমনি গীতা, শ্রীরামকৃষ্ণের সার উপদেশগুলি তেমনি ঐ ক্ষুদ্রপুস্তকে নিবদ্ধ হইয়াছে। এই উপদেশ সংকলন করিয়া লিখিবার সময় যদি কোন ভুল থাকিত তবে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মানস-সন্তানের নিকট আবির্ভূত হইয়া বলিয়া দিতেন, এই ভুল হইয়াছে বা ইহা তাঁহার উপদেশ নয়। যাঁহারা এই সময়ে তাঁহার নিকট অবস্থান করিয়া সেবা করিতেন তাঁহারা দেখিয়াছেন গভীর রাত্রে, তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া কোনদিন হস্তলিখিত সংগ্রহ-পুস্তকটী আনাইয়া শুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। কাহাকেও কাহাকেও তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন

যে, "ঠাকুর এসে বলে গেলেন, 'একথা তো আমি বলিনি—আমি এই বলেছি'।" ইহাকেই বলে Revelation বা ভগবদ্‌বাণীর আত্মপ্রকাশ। যে মহাপুরুষেরা তাহা লিপিবদ্ধ করেন তাঁহারা শুধু দ্রষ্টা স্বরূপ—সংকলন করেন মাত্র।

এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় পূজ্যপাদ সারদানন্দ একস্থানে লিখিয়াছেন যে, "It is indeed the labour of grateful love of the beloved disciple, than whom no one used to live so constantly with the Master, to set him at his rights before the publ... seeing how his invaluable words are be... roughly handled, deformed and distorted ... d... at the hands of many." অর্থাৎ "যাঁহা... উপদেশ অনেকের হাতে অযত্নে যথেচ্ছাকৃত বিকৃত ও কদর্থ... দেখিয়া তাহা সাধারণের নিকট যথাযথ স্থাপন করিতে... অপর কেহ গুরুদেবের সহিত নিয়ত সঙ্গ করেন... কৃতার্থম্মন্য ও স্নেহধন্য শিষ্যের ইহা প্রকৃত প্রয়াস।"

মহারাজ নারীজাতিকে সাক্ষাৎ জগদম্বাস্বরূপ জ্ঞান কা... তাঁহারা মঠে আসিলে তিনি যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদের সমুদায় ... অভিযোগ ও প্রার্থনা শুনিতেন এবং তাঁহাদিগকে যথাযো... কল্যাণকর উপদেশ দিতেন। তাঁহারা তাঁহার নিকট হৃদয়ের সমস্ত কথা অকপটে খুলিয়া বলিতেন। তাঁহাকে কেহ পিতামাতার ন্যায়, কেহ মহাপুরুষজ্ঞানে এবং কেহ প্রিয়তম শুভানুধ্যায়ী মনে করিয়া তাঁহারা তাঁহার শ্রীচরণে তাঁহাদের সরল ভক্তি-অর্ঘ্য

নিবেদন করিতেন। মহারাজের জন্য তাঁহারা নানাপ্রকার সুস্বাদু খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া লইয়া আসিতেন এবং তিনি তাহা গ্রহণ করিলে পরম তৃপ্তি বোধ করিতেন। এমন কি পতিতা নারীরাও তাঁহার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইত না। অকাতরে তিনি সকলকেই কৃপা বিতরণ করিতেন এবং তাঁহার পুণ্যস্পর্শে অনেকের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া উচ্চাভিমুখী হইয়াছিল।

বেলুড় মঠে গঙ্গাতীরে তিনি গম্ভীর ভাবতন্ময় মূর্ত্তিতে অনেক সময়ে থাকিতেন। কখন রঙ্গহাস্যে, কখন বৃক্ষলতায়, কখন রন্ধনের খুঁটিনাটি বিষয়ে আবার কখন ভক্ত ও সাধুব্রহ্মচারীদের আলাপ-আলোচনায় জীবকল্যাণের জন্য মনকে সাধারণ ভূমিতে ...তে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু উচ্চভূমিতে অবস্থিত অন্তর্মুখী ...সা বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইত। যাহারা বিশেষ লক্ষ্য ... তাহারা বুঝিত মহারাজ অন্যমনস্ক, শুধু যন্ত্রবৎ হাঁ ...ন, ...ছেন ও কথা বলিতেছেন মাত্র। কখনও বালকবৎ চপল ...প্রিয়, কখন প্রবীণের মত ধীর গম্ভীর আবার কখন গুরু ...র্য্যের ন্যায় তিনি শিক্ষায় নিরত। তিনি নানাভাবে ...ন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করিতেন। মঠের চায়ের টেবিলের পূর্ব্ব-...রের বেঞ্চে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে একদিন তিনি ভক্তদের ...হিত আলাপ করিতেছেন এমন সময় দুইজন মান্দ্রাজী ভক্ত তাঁহাকে ফুল প্রদান করিলে তিনি সহসা ভাবসমাধিতে লীন হইলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় মুদিত, শরীর নিস্পন্দ ও স্থির—বদনমণ্ডল অপূর্ব্ব মাধুর্য্যপূর্ণ হাসিতে সমুদ্ভাসিত। সেই অপূর্ব্ব দৃশ্যে সকলে বিস্ময়ে অপলক নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

স্ব স্বরূপে স্থিতি

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রাখালের দক্ষিণেশ্বরে আসিবার প্রাধ শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবচক্ষে দেখিলেন যে, গঙ্গাবক্ষে সহসা একটী শতদল কমল ফুটিয়া উঠিল, তদুপরি রাখালরাজ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার হা ধরিয়া ঠিক তাঁহারই অনুরূপ আকৃতিবিশিষ্ট একটী কিশোর নূপুর পায়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছে। এই দর্শনের বিলম্বে রাখাল দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপনীত হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিকট আরও বলিয়া যে, "রাখাল তার নিজের স্বরূপ জানতে পারলে আর তার শরীর থাকবে না।" পাছে তাঁহার এই লীলাসহচর ব্রজের বালক তাহার ব্রজের স্বরূপ সত্তা উপলব্ধি করিলে লীলা সাঙ্গ করে, তজ্জন্য তিনি নিজেও এই অপূর্ব্ব দর্শনের কথা তাঁহার এই মানসপুত্রটীর নিকট কখনও প্রকাশ করেন নাই এবং ঘুণাক্ষরেও রাখালের ইহা যেন কর্ণগোচর না হয় তজ্জন্য তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ ভক্তদের বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। রাখাল যখন প্রথম শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া যান, তখন ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতার কাছে কাতর আবেদন ও প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যেন ব্রজের রাখাল ব্রজধাম হইতে তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসে। শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে এই আশঙ্কার বাণী শুনিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতারাও সর্ব্বদা ইহা সঙ্গোপনে রাখিতেন। এমন কি



স্বামী ব্রহ্মানন্দ

কোন দিন কথাপ্রসঙ্গে, ভাবভঙ্গীতে বা আকার ইঙ্গিতেও ঠাকুরের এই অপূর্ব্বদর্শনের কথা মহারাজের নিকট তাঁহারা প্রকাশ করেন নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের আশঙ্কার বাণীই তাঁহাদের এই সতর্কতার মূল কারণ।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' রচনা কালে স্বামী সারদানন্দ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট মহারাজের প্রথম আগমনের কথা বর্ণনা করিতে করিতে ভাবের আবেগবশতঃ অন্যমনস্কভাবে এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং মুদ্রিত হইবার জন্য উক্ত পাণ্ডুলিপি ছাপাখানায় প্রেরিত হইয়াছিল। দৈবক্রমে ঠিক এই সময়ে প্রেমানন্দ স্বামী শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে (বর্ত্তমান উদ্বোধন মঠে) তাঁহার গুরুভ্রাতা সারদানন্দের নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে প্রেমানন্দকে লীলাপ্রসঙ্গের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া শুনাইতেন এবং তাঁহার পরামর্শ মত কখনও কিছু পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিতেন। ছাপাখানায় পাণ্ডুলিপি চলিয়া গেলেও উহার নকল বা প্রুফ তাঁহার নিকট থাকিত। সেদিন যখন সারদানন্দ রাখাল সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের কমলদলে শ্রীকৃষ্ণ ও নৃত্যরত কিশোর বালক দর্শনের বর্ণনা পড়িয়া শুনাইতেছেন তখন প্রেমানন্দ চমকিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শরত, একি করেছ? ঠাকুরের কথা কি মনে নেই? মহারাজ এখনও যে দেহে বর্ত্তমান! ঠাকুর বলতেন, 'রাখাল যখন তার নিজের স্বরূপ জানতে পারবে—তখন তার আর দেহ থাকবে না!' সেকথা কি তোমার মনে নেই?" সারদানন্দ নিজেও শ্রীশ্রীঠাকুরের এই সতর্কবাণী শুনিয়াছিলেন—তাহা স্মরণ করিয়া তিনিও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ

সারদানন্দ প্রেস হইতে মুদ্রিত প্রুফ ও পাণ্ডুলিপি আনাইয়া উক্ত অংশ অনলে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন এবং তৎসঙ্গে উক্ত পাণ্ডুলিপির সজ্জিত অক্ষরগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। শুধু আদেশ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, লোক প্রেরণ করিয়া উহা সত্বর কার্য্যে পরিণত করাইতেও যত্নবান হইলেন। বাস্তবিকই মহারাজ যাহাতে তাঁহার স্ব স্বরূপ জানিতে না পারেন তদ্বিষয়ে তাঁহার অন্তরঙ্গ গুরুভ্রাতাদের প্রখর দৃষ্টি ছিল; কারণ মহারাজ তাঁহাদের প্রিয়তম 'রাজা'—ঠাকুরের জীবন্ত প্রতিনিধি, তাঁহার মানসসন্তান এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব সম্বন্ধে ঠাকুরের সতর্কবাণী।

মহারাজ মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিয়া বলরাম-মন্দিরে থাকিতেন। এই গৃহের সমগ্র পরিবার শ্রীরামকৃষ্ণের ও তাঁহার ত্যাগী সন্তানদের পরম ভক্ত। মঠের সাধুদের প্রতি তাঁহাদের ঐকান্তিক ভক্তি ও ভালবাসা বঙ্গদেশে বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইঁহাদের গৃহের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই মহারাজের প্রতি অশেষ ভক্তিমান এবং তিনিও ইঁহাদের লইয়া সর্ব্বদা আনন্দ করিতেন। এই বলরাম মন্দির ঠাকুর, স্বামিজী, মহারাজ প্রভৃতি সকল সঙ্গোপাঙ্গ পার্ষদদের পুণ্যস্মৃতিতে সমুজ্জ্বল। রামকৃষ্ণ-ভক্তদিগের নিকট ইহা পুণ্যতীর্থ।

বলরাম মন্দিরের বহির্বাটীর উপরে সিঁড়ির পার্শ্বে দ্বিতলে দক্ষিণদিকে পশ্চিম পার্শ্বে যে ঘরটী রহিয়াছে তথায় মহারাজ শয়ন ও উঠা বসা করিতেন। তাঁহার শুইবার খাটটীর সম্মুখে একটী ছোট খাট ছিল। ঐ ছোট খাটে বসিয়া তিনি ভক্তদের সহিত কখন কখন আলাপ আলোচনা করিতেন। একদিন গভীর

রাত্রিতে মহারাজ দেখিলেন যেন শ্রীরামকৃষ্ণ সহসা উক্ত ছোট খাটটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং কিছুক্ষণ পরে নির্ব্বাকভাবেই অন্তর্দ্ধান হইলেন। এইরূপ অকস্মাৎ ঠাকুরের অপ্রত্যাশিত নির্ব্বাকভাবে দর্শন দান করায় তিনি বিস্মিত হইয়া ইহার কারণ সম্বন্ধে মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, "হঠাৎ ঠাকুরের এইরূপ নির্ব্বাক আবির্ভাবের কারণ কি? আকার ইঙ্গিতেও তিনি ত কোন ভাব প্রকাশ করিলেন না। নিবিড় নিস্তব্ধ গভীর রাত্রিতে ঠাকুরের এই আকস্মিক আবির্ভাব ও তিরোধান কি কোন ভাবী ঘটনার ইঙ্গিত?" মহারাজ খাটের উপর বসিয়া একান্তভাবে চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন। এমন সময়ে তাঁহার কোন সেবক ঘরে প্রবেশ করিয়া মহারাজকে তদবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিলেন। তাঁহার অন্তরের অভ্যন্তরে তুমুল আলোড়ন চলিলেও বাহিরে শান্ত সমাহিত ভাব। কিছুক্ষণ মৌনভাবে উদাস নেত্রে বসিয়া থাকিবার পর তিনি উক্ত সেবকটীকে দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিতভাবে তাহাকে বলিলেন, "হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল, তাকিয়ে দেখি ছোট খাটটীর সামনে ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন। কোন কথা বল্লেন না, কিছুই বুঝতে পারছিনে কেন তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে অন্তর্দ্ধান হলেন!" কিছুক্ষণ পরে প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে তিনি বলিলেন, "এখন আমার মনে কোন বাসনা নেই। এমনকি তাঁর নাম করবারও আর বাসনা নেই—শুধু শরণাগত শরণাগত।" মহারাজের আর কোন বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

এই সময়ে একদিন প্রাতঃকালে রামলাল দাদা (শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গীয় রামলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়) বলরাম-মন্দিরে

মহারাজকে দর্শন করিতে উপনীত হইলেন। সরলচিত্ত রামলালদাদাকে দেখিলেই ঠাকুরের কথা স্মরণ করিয়া তিনি আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িতেন এবং তাঁহার সঙ্গে রঙ্গ রসিকতার তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সরস কথাগুলি উভয়েরই স্মৃতিপটে উদিত হইত এবং দুইজনেই ঠাকুরের হাবভাব গানগুলিকে মূলভিত্তি করিয়া রসালাপে মগ্ন হইয়া পড়িতেন। সে দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জীবনে কখনও উহা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। তাঁহাদের আলাপ আলোচনায় হাসির তুমুল লহর বহিয়া যাইত এবং আমোদ ও আনন্দের ফোয়ারা ছুটিত। সেইদিন মহারাজ রামলালদাদাকে বলিলেন, "দাদা! আজ সন্ধ্যার পর ঢপওয়ালী সেজো, ঠাকুরের সময়কার গান সকলকে শুনাতে হবে?" রামলালদাদা লজ্জিতভাবে বলিলেন, "মহারাজ এ তো মঠ নয়, গৃহস্থের বাড়ী—সবাই কি মনে কর্‌বে? বিশেষ বাড়ীতে মেয়েরা আছেন।" মহারাজ তদুত্তরে বলিলেন, "তা হোক—কি আর মনে করবে।" মহারাজের কথায় রামলালদাদা আপত্তি জানাইয়া বলিলেন, "না, না, মহারাজ, বাড়ীর লোকে আমাকে কি মনে করবে বলুন দেখি?" কিন্তু তাঁহার কোনও আপত্তি টিকিল না। অগত্যা রামলালদাদা বলিলেন, "মহারাজের যো হুকুম।" মহারাজের কথায় এমনি তেজ ও ভঙ্গী ছিল যে গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন রামলালদাদা ঠিক তাঁহার হস্তে যেন যন্ত্রবৎ চালিত হইতেন, তাঁহার নিজের নিজত্ব থাকিত না। শুধু রামলালদাদা নহেন, অনেকেই ঠিক পুতুল নাচের পুতুলের মত হইয়া যাইত। সন্ধ্যাকালে সেবক-শিষ্যদের ডাকিয়া মহারাজ বলিলেন, "যাও, রামলালদাদাকে সঙ্গে নিয়ে সাজিয়ে দাও।" সেবকেরাও

সরল রামলালদাদাকে লইয়া আনন্দ করিতেন এবং তিনিও সেবকদের সঙ্গে মিশিয়া বালকের মত রঙ্গ তামাসা করিয়া অঙ্গভঙ্গী সহকারে গান ও নৃত্য করিতেন। ঠাকুর যে সকল প্রাচীন গীত গাহিতেন, রামলালদাদাও সেই গানগুলি অনুরূপ ভাব ভঙ্গীসহ গাহিতে ভালবাসিতেন। তাঁহারা বলরাম মন্দিরের অন্তঃপুর হইতে সাড়ী ও অলঙ্কারাদি চাহিয়া তাঁহাকে সাজাইলেন, কিন্তু অলঙ্কারগুলি পরাইতে তাঁহাদের বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইল। মেয়েদের গহনা কিছুতেই সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কঠিন অঙ্গে পরাইতে পারা গেল না। অবশেষে অন্তঃপুরবাসিনীরা তাহা শুনিয়া তাঁহাদের প্রাচীন খিল দেওয়া গহনাগুলি তথায় পাঠাইয়া দিলেন। সেগুলি দিয়া সহজে রামলালদাদার সর্ব্বাঙ্গ সাজান হইল। রামলালদাদা স্ত্রী বেশে অলঙ্কার পরিয়া ভূষিত হইলে সেবকেরা যথাসময়ে মহারাজকে তাহা জানাইলে মহারাজ মৃদুহাস্যে বলরাম মন্দিরের বৃহৎ হলঘরে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন, চারিদিকে সমাগত ভক্ত ও শিষ্য-সেবকেরা দর্শকরূপে বসিলেন। রামলালদাদা হলঘরে প্রবেশ করিলে সকলেই উৎফুল্ল হইয়া সে দৃশ্য দেখিলেন। রামলালদাদা মহারাজের সম্মুখে ঢপ কীর্ত্তনের সুরে হাত নাড়িয়া নাচিতে নাচিতে গাহিলেন—

"একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর দিনেক দুয়ের মত
(ও তোর) মন মানে তো থাক্‌বি সেথা নইলে আস্‌বি দ্রুত।
আগে ছিল এক হেঁটো জল
এখন যমুনা অতল
সাঁতার দিতে হবে।
নৈলে যমুনার তীরে বসে ব্রজ নিরখিবে।

যদি বল ব্রজে যেতে চরণেতে ধূলা লাগিবে।
(বল্‌লেও বল্‌তে পার আগে রাখাল ছিলে এখন রাজা হয়েছ)
না হয় ব্রজগোপীর নয়ননীরে চরণ পাখালিবে॥

"আগে রাখাল ছিলে এখন রাজা হয়েছ" এই আখর দিয়া যখন মহারাজের প্রতি ভঙ্গী করিয়া রামলালদাদা ভাবভরে গাহিলেন, তখন মহারাজের সহাস্যমুখ সহসা গম্ভীর হইল। তিনি যেন কোন্ অতীন্দ্রিয় ভাব-রাজ্যে চলিয়া গেলেন। তাঁহার ভাবদর্শনে দর্শকেরাও নির্ব্বাক নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিলেন। চারিদিকে সহসা কেমন যেন এক অপূর্ব্ব ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি হইল।

মেয়েরা অন্তঃপুর হইতে পার্শ্ববর্ত্তী ঘর দিয়া বারান্দায় গোপনে অন্তরালে দাঁড়াইয়া রামলালদাদার স্ত্রীবেশে নৃত্যগীত দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও সেই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক আবহাওয়ায় নিস্পন্দ নির্ব্বাক হইয়া দাড়াইয়া রহিলেন। হাস্যকৌতুক আমোদ প্রমোদের লেশমাত্র নাই, শুধু একটা নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্যে হলঘরটী পরিপূর্ণ। কেবল গায়ক রামলালদাদা আত্মহারা হইয়া বিহ্বলভাবে নাচিয়া নাচিয়া আখর দিয়া গাহিতেছেন—"আগে রাখাল ছিলে এখন রাজা হয়েছ!" আবার তিনি হাত নাড়িয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া গাহিলেন,

"এখন ব্রজে চল ব্রজেশ্বর দিনেক দুয়ের মত।"

মহারাজ মৌন, নিস্পন্দ ও গম্ভীর। সহসা তাঁহার একি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! ব্রজধামের রাখাল কি তাঁহার স্বরূপসত্তার আভাস পাইয়া অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন? ব্রজের রাখাল কি এখন "রাজা" হইয়া ব্রজধাম ভুলিয়াছেন? 'এখন ব্রজে চল ব্রজেশ্বর' কি সেই ব্রজধামে আহ্বান? ঠাকুর কি এই জন্যই নীরবে দর্শন

দিয়া অদৃশ্য হইয়াছিলেন? আজ কোন অদৃশ্য মহাশক্তির বলে রামলালদাদার কণ্ঠে সেই দিব্য আহ্বানের স্বর উত্থিত হইয়াছে? রাখালের কি ব্রজধামে ব্রজের খেলা মনে পড়িতেছে? ইহাই কি হাস্যমুখরিত রঙ্গ তামাসার পরিবর্তে এই গম্ভীর মৌনভাবের কারণ? ব্রজপুর—কতদূর? অনন্তের কোন অজানিত প্রদেশে? কোন্ অপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে? ব্রজের খেলা—নিত্যলীলা, লীলা-কমলে কৃষ্ণরূপে কি তাহার বিকাশ? কৃষ্ণসত্তায় কৃষ্ণ সহচরেরা কি সেই লীলারস সম্ভোগ করিয়া—আনন্দে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিয়া বেড়ায়? নিত্যলীলার স্বরূপ সত্তা জাগাইতে ইহা কি সেই ব্রজের অস্ফুট আহ্বান?

কয়েক দিন পরে জনৈক গৃহস্থ ভক্তের অনুরোধে মহারাজ ঠাকুর স্থাপনা ও উৎসবোপলক্ষে ভক্ত ও শিষ্য সেবকাদি লইয়া তাঁহার গৃহে তিন দিন বাস করিয়াছিলেন। তিন দিন পরে বলরাম-মন্দিরে আসিয়া আটপুরে স্কুলের ভিত্তি স্থাপনা ও তথায় শিবরাত্রি উদযাপন করিয়া বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। বেলুড় মঠে আনন্দে দিনগুলি কাটিতে লাগিল। মহাসমারোহে শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা ও সাধারণ মহোৎসব হইয়া গেল। অতঃপর তাঁহার কলিকাতায় বলরাম-মন্দিরে যাইবার প্রস্তাব উঠিল। যেদিন কলিকাতায় গমন করিবেন সেই দিন প্রাতঃকালে তিনি মঠের সাধু ব্রহ্মচারীদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "স্বামিজীর সংকল্প ছিল এখানে ঠাকুরের শ্রীমন্দির নির্মিত হয়। মহাপুরুষের সেই সংকল্প কার্যে পরিণত হওয়া প্রয়োজন।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার জনৈক শিষ্যকে স্বামিজীর সংকল্পানুযায়ী মন্দিরের যে নক্সাটী (plan) প্রস্তুত হইয়া মঠে রক্ষিত আছে তাহা আনিতে

বলিলেন। প্ল্যানটী আনা হইলে মহারাজ তাহা মঠের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সম্মুখে কিছুক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মহারাজের তৎকালীন ভাব দেখিয়া বোধ হইল যেন এই একটী মহৎ কার্য্য অসমাপ্ত রহিয়াছে। তাঁহার কথায় ও ভাব ভঙ্গীতে উপস্থিত সকলের হৃদয়ে একটা দৃঢ় ধারণা জন্মিল যে স্বামিজীর সংকল্পিত মন্দির নির্ম্মাণ যেন রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের বিশেষ দায়স্বরূপ, ইহার নির্ম্মাণ বিষয়ে সঙ্ঘের বিশেষ লক্ষ্য থাকা কর্ত্তব্য।

মহারাজ মঠ হইতে বিদায়ের দিনে তাই সর্ব্বপ্রথমে মঠস্থ সকলের নিকট মন্দির নির্ম্মাণের প্রসঙ্গ তুলিলেন। ইহা যেন অলক্ষ্যে তাঁহার কার্য্য সমাপ্তির ইঙ্গিত। সেইদিন প্রাতঃকালেই তিনি বেলুড়মঠ হইতে বলরাম মন্দিরে গমন করিলেন।

নিয়তি চক্রের বিধান অপূর্ব্ব—লীলাময়ের লীলা অবোধ্য। ভক্তদের লইয়া মহারাজ বলরাম-মন্দিরে আনন্দ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুই দিন পরে অর্থাৎ ১০ই চৈত্র ২৪শে মার্চ্চ প্রাতঃকালে অকস্মাৎ তিনি উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইলেন। শিষ্য সেবকেরা অমনি ব্যস্ত হইয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন। সংবাদ পাইবামাত্র ডাক্তার কাঞ্জিলাল, বিপিন বিহারী ঘোষ ও দুর্গাপদ ঘোষ অবিলম্বে চলিয়া আসিলেন। লক্ষণাদি দেখিয়া তিনজনেই বিসূচিকা বলিয়া নির্ণয় করিলেন এবং তাঁহাদের পরামর্শমত হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইল। ডাঃ কাঞ্জিলালের ঔষধে বিশেষ কোন ফল না হওয়ায় সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালীকে আনা হইল। তাঁহার চিকিৎসাধীনে ক্রমশঃ রোগের উপশম হওয়ায় সকলেই আনন্দিত হইলেন এবং সকলেরই হৃদয় আশার সঞ্চারে ভরিয়া

উঠিল! এইভাবে আট দিন অতিবাহিত হইলে ডাক্তারগণের উপদেশানুযায়ী অন্নপথ্যের ব্যবস্থা হইল। অন্নপথ্য গ্রহণ করিবার পরদিন মহারাজ ছোটঘর হইতে বড় হলঘরে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতদিন সিঁড়ি দিয়া দোতালায় উঠিবার দক্ষিণ দিকের ছোট ঘরে মহারাজ বাস করিতেছিলেন। অসহ্য রোগযন্ত্রণার মধ্যে তিনি কখন আধ্যাত্মিক তত্ত্বের চরম উপলব্ধির কথা বলিয়া আবার কখনও সদানন্দ বালকের মত হাস্য কৌতুক করিয়া সর্ব্বদাই —আনন্দসাগরে মগ্ন থাকিতেন। রোগযন্ত্রণা যেন তাঁহার অন্তস্তল স্পর্শ করিতে পারিত না।

বড় হল ঘরে তাঁহাকে বহিয়া লইয়া যাইবার কালে তিনি হাসিতে হাসিতে শিষ্যসেবকদের বলিলেন, "ওরে! মরা হাতী লাখ টাকা।" তাঁহার সেই রহস্যপূর্ণ উক্তি শুনিয়া উপস্থিত সকলেই আনন্দে উচ্চরোলে হাসিয়া উঠিলেন। এইভাবে অন্নপথ্য করিবার পর দুইদিন কাটিয়া গেল। সাধুভক্ত সকলেরই মন হইতে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দূরীভূত হইয়া গেল এবং সকলেরই হৃদয় তাঁহার আরোগ্য আশায় উৎফুল্ল হইল। কিন্তু যেমন ক্ষণপ্রভার চকিত দীপ্তি নিমেষের জন্য চক্ষু ঝলসিত করিয়া পুনরায় ঘন তমসায় বিলীন হয়, তেমনি সাধু ভক্ত সকলেরই আশা ভরসা ও আনন্দ অচিরে গভীর উৎকণ্ঠায় পরিণত হইল। অকস্মাৎ বহুমূত্রের উপসর্গ দেখা দিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অতি সামান্য আকারে বহুমূত্রের সূচনা দেখা গিয়াছিল বটে কিন্তু পরে উহার চিহ্নমাত্রও ছিল না। রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ভীষণ আকার ধারণ করিল। দিন দিন শরীর ক্ষয় হইতে লাগিল এবং তৎসঙ্গে অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণা ও বিবিধ উপদ্রব আসিয়া

উপস্থিত হইল। একে বিসূচিকা রোগের আক্রমণে শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল—তাহার উপর নিদারুণ রোগযন্ত্রণা দেখিয়া ডাক্তারেরা প্রমাদ গণিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীযুত বিজয় সিংহ এবং ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় আসিয়া দেখিয়া গেলেন। মহারাজ বালকের ন্যায় ডাক্তার সরকারকে বলিয়াছিলেন—"আমায় ভাল করে দিন—আমি ভাল হব।" আবার কখন তিনি বলিতেন, "আমাকে ভুবনেশ্বরে নিয়ে চল—সেখানকার কুয়োর জল খেলে ভাল হয়ে যাব।" সকলেই অবশেষে তাঁহার আরোগ্য সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িলেন। সাধুভক্ত ও শিষ্যদের হৃদয়েও দারুণ নৈরাশ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। অশ্রুপূর্ণ নয়নে ও বিষণ্ণ চিত্তে তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল। নিরাশার কালিমায় তাঁহাদের মুখমণ্ডল মলিন হইয়া গেল। গুরুভ্রাতা সারদানন্দ হতাশ হৃদয়ে বুক বাঁধিয়া বর্ত্তমান চিকিৎসার পরিবর্ত্তন করাইয়া কবিরাজী চিকিৎসার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। মহারাজ তাহা শুনিয়া রসপূর্ণ বাক্যে বলিলেন, "হাকিমীটা আর বাকী থাকে কেন?" যাহা হউক সারদানন্দের প্রস্তাব উপস্থিত সকলেই অনুমোদন করিলেন। কলিকাতার সুবিখ্যাত কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় চিকিৎসা করিবার জন্য আসিলেন। তিনি পুনরায় আসিয়া মহারাজের হাত দেখিবার জন্য তাঁহাকে ডাকিলেন। মহারাজ তখন নিমীলিত নয়নে ছিলেন। কবিরাজ মহাশয়ের ডাক শুনিয়া তিনি তাঁহার দিকে তাকাইলেন এবং শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয়ের বিভূতিলিপ্ত ললাট দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কবিরাজ মশায়, কপালে যাঁর চিহ্ন ধারণ করেছেন, সেই শিবই সত্য—আর সব মিথ্যা।" ইহা বলিয়া

মহারাজ একেবারে নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহার সেই তেজোপূর্ণ মধুর গম্ভীর বাণী শুনিয়া কবিরাজ মহাশয়ের অন্তর স্পর্শ করিল তিনি আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তিনি নীরবে স্থির চিত্তে বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে কবিরাজ মহাশয় নাড়ী পরীক্ষা করিয়া উঠিয়া আসিলেন এবং ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। দারুণ উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, অশান্তি ও আতঙ্কের মধ্যে ভক্ত ও শিষ্যসেবকদের কাল কাটিয়া যাইতেছিল। এইদিন গাত্রদাহ ও জল তৃষ্ণা প্রাতঃকাল হইতে খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

২৫শে চৈত্র শনিবার বেলা দ্বিপ্রহরে বলরাম বাবুর বাড়ীর মেয়েদের কাঁদিতে দেখিয়া মহারাজ অভয় দিয়া বলিলেন, "তোমাদের ভয় কি? আমি আশীর্ব্বাদ করছি।" সন্ধ্যার পর ডাক্তার দুর্গাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ—আপনার কি কষ্ট হচ্ছে?" মহারাজ উত্তরে বলিলেন, "সহনং সর্ব্বদুঃখানামপ্রতীকারপূর্ব্বকম্—আমার অবস্থা এখন এইরূপ, তোমরা এইটী ধারণা কর।" অকস্মাৎ তাঁহার সমগ্র মুখমণ্ডল যেন এক দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার অসহ্য রোগযন্ত্রণা কোথায় যেন বিলীন হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সহসা বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া তিনি নিস্তব্ধভাবে ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়িলেন। পরে রাত্রি প্রায় আন্দাজ নয়টার সময়ে তিনি দক্ষিণপার্শ্বস্থিত জনৈক সেবকের গায়ে হাত দিয়া ত্রস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রে?" রুদ্ধকণ্ঠে সেবক বলিলেন, "আমি"। উত্তর শুনিয়া আদরে ও স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে তিনি সেবককে ডাকিয়া বলিলেন "গণেশ, আমার সিদ্ধিদাতা গণেশ। গণেশের পূজা করবি। ভয় কি বাবা? আমার সেবা কর্‌ছিস—আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি

ভগবানে ডুবে যা। তোর ব্রহ্মজ্ঞান হবে, আমি বল্‌ছি—তোর ব্রহ্মজ্ঞান হবে।" এই ক থা বলিতে বলিতে সেই প্রেমপূর্ণ মহা-পুরুষের কণ্ঠস্বর যেন ক্রমশঃই রুদ্ধ হইয়া আসিল। "বাবা—আর পাচ্ছি না" বলিয়াও তিনি সাধু ভক্ত ও শিষ্যদিগকে নিকটে ডাকিয়া অতি স্নেহ-কোমলকণ্ঠে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকলের শুষ্ক ও মলিনমুখ দখিয়া মহারাজ তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া বলিলেন, "ভয় কি বাবা তোমাদের?" স্নেহবিগলিত কণ্ঠে আবার তাঁহাদের কথনও কাহ াকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "আমার বাবারা।" পুনরায় কাহাকেও ডাকিয়া তিনি সুধাকণ্ঠে বলিলেন, "তুই যাবি কোথায়? আমি তো ধরে রাখবো।" এইরূপে শিষ্য সন্তানদের মহারাজ সস্নেহে বলিলেন, "তোরা ভগবানকে ভুলিস নি তোদের কল্যাণ হবে।" আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে তিনি নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহার অর্দ্ধনিমীলিত নয়নদ্বয় যেন কোন্ অন্তরতম দিব্যলোকে নিপতিত হইল। কিয়ৎকাল এইভাবে অতিবাহিত হইলে আবার তিনি অতি কোমল ও মধুরস্বরে ধীরে ধীরে বলিয়া উঠিলেন—"ব্রহ্মসমুদ্রে—বিশ্বাসের বটপত্রে—ভেসে ভেসে যাচ্ছি। বিবেক—আমার বিবেক! বিবেকানন্দ! বাবুরামদা, বাবুরামদা! যোগেন—যোগেন!" একে একে রামকৃষ্ণলোকে গত গুরু-ভ্রাতাগণের দিব্যদর্শন সহ তাঁহার মন কোন এক অপরূপ অজ্ঞাতরাজ্যে চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ তাঁহার মন যেন কোন [illegible]দণ্ড স্পর্শে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আ[illegible] [illegible] লাগি[illegible]। যে রাজ্যে তিনি প্রতিনিয়ত আত্মস্থ হইয়া সদানন্দে [illegible] মিথ্যা।" [illegible] করিতেন—

সে গুপ্ত আবরণ যেন খুলিয়া পড়িল। আত্মানুভূতি যেন নানা ভাবের ইঙ্গিতে ও বাণীর আকারে আত্ম কাশ করিতে প্রয়াস পাইল। তিনি আত্মহারা হইয়া অন্তরে নিভৃত কোণে যাহা দর্শন করিতেছিলেন বিমুগ্ধচিত্তে—আপ· ভাষায় ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, "আহা-হা! ব্রহ্ম সমুদ্র! ওঁ পরব্রহ্মণে নমঃ; পরমাত্মনে নমঃ।" সেই আত্মার মহিমায় পরিব্যাং হইয়া গূঢ় অনুভূতির কথা তিনি অনর্গলভাবে বলিয়া যাইতেছেন। ইহা দেখিয়া জনৈক সেবক ভাবিলেন যে, বুঝি এতগুলি কথা অ মভাবে বলাতে মহারাজের গলা শুষ্ক হইয়াছে—সুতরাং একটু লেমনেড খাওয়াইলে ভাল হইবে। ইহা মনে করিয়া তিনি ে ড পান করাইতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, "একটু লেমনেড খান।' মহারাজ ধীরে ধীরে তাঁহাকে বলিলেন, "মন যে ব্রহ্মলোক থেকে নামতে চায় না। ব্রহ্মে লেমনেড ঢেলে দে।" উপস্থিত ভক্ত ও সাধুবৃন্দ মহারাজের এই অলৌকিক বাণী উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিলেন, পূজ্যপাদ শিবানন্দ ও অভেদানন্দ শোকার্ত্ত মৌনভাবে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে সারদানন্দকে তথায় আসিবার জন্য সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল—তিনিও শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী হইতে এই সময়ে আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি প্রাতঃকাল হইতে সর্ব্বক্ষণ বলরাম মন্দিরে থাকিতেন শুধু শয়ন করিতে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে যাইতেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহারাজ বলিলেন, "ভাই শরত, আমার যে ব্রহ্মবেদান্ত গুলিয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর সত্য, তাঁর লীলাও সত্য" মহারাজের কথা শুনিয়া সারদানন্দ বলিলেন, "তোমার [illegible] কি মহারাজ? ঠাকুর ত তোমায় সব করে দিয়ে [illegible] পার [illegible]

অনন্তর মহারাজ কিছুক্ষণ স্থিরভাব ধারণ করিলেন। তাঁহার আনন্দোদ্ভাসিত উজ্জ্বল বদনমণ্ডল এবং অপলক নয়নযুগল দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি যেন সুগভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া বিভোরভাবে ব্রহ্মানন্দরস আস্বাদন করিতেছেন। তাঁহার সেই শান্ত সমাহিত নিস্পন্দ আনন্দ জ্যোতিপ্রভায় এবং সেই ধ্যানমগ্ন অলৌকিক ঘনীভূত ভাব প্রবাহে, চতুর্দ্দিকে সমুপস্থিত সকলের প্রাণ মন যেন স্থির, গম্ভীর ও শান্তভাব ধারণ করিল, সকলেই নির্ব্বাক্‌ভাবে স্থির দৃষ্টিতে অবস্থিত, প্রকৃতির কোলাহলও যেন প্রশান্ত ও মৌন। মুখর চপল পৃথিবী যেন মূক ও গম্ভীর। মহারাজের ধ্যান যেন গভীর হইতে গভীরতর হইল। সেই অপূর্ব্ব ধ্যানাবস্থা এমন একটি ভাব তরঙ্গের সৃষ্টি করিল যে, তাহার প্রবাহে উপস্থিত সকলেরই মন যেন অতীন্দ্রিয় ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সকলেই যেন সমুদায় জাগতিক জ্ঞান হারাইয়া এক অপূর্ব্ব দিব্য আনন্দময় ভাবলোকে বিচরণ করিতে লাগিল। কাহারও আর বাহ্য চেতনার সাড়া নাই। সেই শান্ত স্নিগ্ধ গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে সহসা মহারাজের সুমধুর কণ্ঠে অলৌকিক দিব্যবাণী ফুটিয়া উঠিল,—"এই যে—পূর্ণচন্দ্র! রামকৃষ্ণ!—রামকৃষ্ণের কৃষ্ণটী চাই। আমি ব্রজের রাখাল,—দে দে আমায় ঘুঙুর পরিয়ে দে,—আমি কৃষ্ণের হাত ধরে নাচ্‌ব। ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্। কৃষ্ণ এসেছ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ। তোরা দেখতে পাচ্ছিস নি? তোদের চোখ নেই? আহা-হা, কি সুন্দর! আমার কৃষ্ণ—কমলে কৃষ্ণ, ব্রজের কৃষ্ণ, এ কষ্টের কৃষ্ণ নয়। এবারে খেলা শেষ হল। দেখ দেখ—একটী কচি ছেলে আমার গায়ে হাত বুলুচ্ছে আর বলছে আয়, চলে আয়!"

মহারাজ নীরব হইলেন। ইহা কি স্ব স্বরূপের স্মৃতি না স্ব স্বরূপে স্থিতি? কে বলিবে? শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবচক্ষে রাখালের এই স্বরূপ সত্তাই দর্শন করিয়াছিলেন। কমলে কৃষ্ণ, কৃষ্ণের হাত ধরিয়া নূপুরপায়ে নৃত্যরত রাখাল! ব্রজলীলাও নিত্য, ব্রজের রাখালও নিত্য।

তৎপরদিন রবিবারও কাটিয়া গেল। সোমবার ১০ই এপ্রিল, ২৭শে চৈত্র মদন ত্রয়োদশীর দিন চতুর্দ্দশী তিথির প্রারম্ভে রাত্রি আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে শ্রীরামকৃষ্ণের "রাখালরাজ" নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন। পরদিন সেই শিবময় দেহ বেলুড় মঠে আনিয়া স্রক চন্দনসহ প্রজ্বলিত পবিত্র হোমাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইল।

ওঁ শান্তিঃ—শান্তিঃ—শান্তিঃ!

